বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

বিদ্যাসাগর সার্ধশতবার্ষিক জাতীয় কমিটীর

কার্যকরী সভাপতি

ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

একদা জীবনের অতি-প্রত্যূষে পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ' হাতে নিয়ে প্রথম পাঠার্থীরূপে দুরুদুরু হৃদয়ে বিদ্যামন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছিলাম। ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'আখ্যানমঞ্জরী' অবলম্বনে অক্ষরবন্দী কল্পনার জগতে মানস-পরিক্রমার অধিকার লাভ করি। তার পর বহু দিন চলে গেছে, জীবনের সঞ্চয় বেড়ে উঠেছে, চিন্তার প্রাঙ্গণ ক্রমেই লতাজটিল অরণ্যানীর মতো দুষ্প্রবেশ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার মতো অনেকেই স্বীকার করবেন যে, বিদ্যাসাগরের কৃপাতেই এক-যুগের বাঙালীসমাজ মননের জগতে প্রথম-প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের অলোকসামান্য চারিত্রমূর্তির অভূতপূর্ব পরিচয় তাঁর রচনার মধ্যেই যথার্থ নিহিত আছে। কিন্তু তাঁর গ্রন্থাদির দুষ্প্রাপ্যতার জন্য অনেকেই তাঁর এই দিকটি সম্বন্ধে ততটা অবহিত নন। অনেক দিন তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই মুদ্রিত ছিল না। ১৩৪৪ থেকে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের মধ্যে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী'র যে তিনখণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল তাও আর পাওয়া যায় না। ফলে বাঙালী পাঠকসমাজ এতদিন শুধু বিদ্যাসাগরের নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

কিছুকাল পূর্বে মণ্ডল বুক হাউসের শ্রীসুনীলকুমার মণ্ডলের প্রবর্তনায় এবং শ্রীদেবকুমার বসুর সম্পাদনায় চার খণ্ডে সম্পূর্ণ বিদ্যাসাগরের যাবতীয় রচনার যে সম্পূর্ণতর সংস্করণ প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয় (ইতিমধ্যে সে চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে), তার ভূমিকা লেখার ভার পড়ে আমার ওপর। সেই প্রসঙ্গে নতুন করে বিদ্যাসাগরের সমস্ত গ্রন্থ অনুশীলন করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, আমরা তাঁকে যে পরিমাণ ভক্তি নিবেদন করেছি, সেই পরিমাণে তাঁর গ্রন্থপাঠে উৎসাহিত হই নি। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর দান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভাসা-ভাসা হয়ে পড়েছে। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের মানসিক বৈশিষ্ট্যের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে তাঁর রচনার মধ্যেই তার অনুসন্ধান করতে হবে, এবং

এ-কথা বুঝে নিতে হবে যে, তাঁর রচিত গ্রন্থই তাঁর জীবনের সর্বোত্তম বাণী। তাই আমি যথাসম্ভব নিঃস্পৃহভাবে এই গ্রন্থে তাঁর যাবতীয় রচনার পরিচয় দিয়ে এবং সমসাময়িক নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবধারণের চেষ্টা করেছি। কতটা সফল হয়েছি, পাঠক-পাঠিকারা তার বিচার করবেন।

বিদ্যাসাগরের সার্ধশতবার্ষিক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমার এই সামান্য গ্রন্থটি দিয়েই তাঁকে প্রণাম নিবেদন করি।

এ-আলোচনায় কোন কোন তথ্য, প্রসঙ্গ ও উদ্ধৃতি একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে পাঠক-পাঠিকার বোধসৌকর্যের জন্য—সুতরাং কোন কোন বিষয়ের পুনরুক্তি দেখলে বিশেষজ্ঞগণ মার্জনা করবেন। মণ্ডল বুক হাউস প্রকাশিত বিদ্যাসাগর রচনাবলীর পাঠ এ আলোচনায় প্রামাণিক বলে গৃহীত হয়েছে এবং তারই পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। পুরাতন উদ্ধৃতির পুরাতন বানান যথাসম্ভব অবিকৃত রাখবার চেষ্টা করেছি।

এই গ্রন্থ রচনায় শ্রীদেবকুমার বসু ও শ্রীসুনীল মণ্ডলের সাহায্য ও সহযোগিতা ভুলতে পারব না। নির্ঘণ্ট বিন্যাসের মতো নীরস ও দুষ্কর ব্যাপারটি শ্রীযুক্ত বসু অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করে দিয়ে আমাকে বিস্মিত করেছেন, প্রকাশক শ্রীযুক্ত মণ্ডল গ্রন্থটি শোভনাকারে প্রকাশের জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। শিল্পী শ্রীগণেশ বসু অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করে দিয়েছেন। এঁরা সকলেই আমার সুহৃৎ, সুতরাং শুষ্ক ধন্যবাদ দিয়ে এঁদের বিব্রত করতে চাই না। আমার স্নেহভাজন ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান্ পাঁচুগোপাল দত্ত এবং অধ্যাপক শ্রীমান্ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় এই গ্রন্থের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত বলে তাঁদের আশীর্বাদ জানাই।

আমার স্ত্রী শ্রীমতী বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও বিন্যাস-পদ্ধতি সম্পর্কে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। ১৫ই আগস্ট, ১৯৭০

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা বিভাগ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
১৩৭৭॥১৯৭০

সূচী

বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগর

Bangla Sahitye Bidyasagar

(Vidyasagar in Bengali Literature)

By

Dr. Asit K. Banerjee
Department of Bengali,
University of Calcutta

1970

Price Rs 12·00.

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

প্রথম অধ্যায়

প্রাগ্‌বিদ্যাসাগরীয় বাংলা গদ্য

১.

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ এমন কয়েকটি বিদ্যুৎ-গর্ভ ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছিল যাঁদের আশীর্বাদের পুণ্যফল এখনও আমরা ভোগ করছি। প্রাগাধুনিক যুগের গৌড়বঙ্গে বিচিত্র প্রতিভাধর ব্যক্তির যে আবির্ভাব হয় নি, তা নয়। কিন্তু একই শতাব্দীতে সমগ্র দেশের মানস-আকাশ এ-ভাবে আর কোন দিন ফলবান সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে নি। মধ্যযুগের বহ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে পুরাতন বাঙালী-সংস্কৃতির ফিনিক্স পাখী আত্মবিসর্জন দেবার সঙ্গে সঙ্গে জাতবেদার দীপ্তি ও দাহ নিয়ে যে সমস্ত বিশ্বাকাশসঞ্চারী মহাগরুড়ের জন্ম হল, তাঁদের মধ্যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের নাম আজ বাঙালী-জীবনের পাতিত্যমোচনের বীজমন্ত্ররূপে পরিগণিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে আবার বিদ্যাসাগর নিঃসঙ্গ দেবদ্রুমের মতো বিশাল প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হয়, নিরাভরণ গিরিশৃঙ্গের মতো নিঃসঙ্গতাই তাঁর শোভা। বস্তুতঃ অন্যকালে হলে তাঁকে আমরা বিধাতার দুর্জ্ঞেয় পরিহাস বলেই মনে করতাম। যে-বাংলাদেশের সমতলভূমিবাসী এরণ্ডসভা থেকে পাহাড় বহু দূরে পলাতক, সমুদ্রও অদৃশ্যপ্রায়, সেখানে কি করে নগাধিরাজের উচ্চতা এবং সমুদ্রের বিশালতা একটি ব্যক্তিচরিত্রকে আশ্রয় করতে পারে, এ এক সমস্যার বিষয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৮৯১) এমন একটি বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, যা আজকের দিনে প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই বিস্ময়কে ব্যক্ত করে বলেছেন, "মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি

নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।” বিধাতার সেই আশ্চর্য ব্যতিক্রম এই খর্বদেহ ও ক্ষীণতনু ব্যক্তিটি একই সঙ্গে এত প্রেম, এত করুণা, এত জ্ঞান, এত বীর্য—এত মহৎ মনুষ্যত্বের অকৃপণ আশীর্বাদ কোথা থেকে পেলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তাই আজ তিনি পুণ্যশ্লোক, অদীনপুণ্য ; তাই আজ তাঁর জীবনকথা বাংলার ঘরে ঘরে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। “দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃত জাতির শবদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে কে?” আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর প্রশ্ন করেছিলেন। জীবন সঞ্চার করবে বিদ্যাসাগরের চরিত্রাদর্শ, সংস্কারমুক্ত নির্মোহ দৃষ্টি, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ যুক্তি ও মানবপ্রেম। তাঁর বিশাল, বিচিত্র, কর্মব্যাকুল জীবনকথা আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। তাঁর গ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা এবং বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর রচনার যে সম্পর্ক, সেই প্রসঙ্গেই এখানে দু-চার কথার অবতারণা করা যাচ্ছে।

২.

একদা বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হত। কেউ কেউ সে গৌরব রামমোহনকে দিতে চাইতেন ; যিনি এ বিষয়ের অনুসন্ধানে আর একটু অগ্রসর হয়েছেন, তিনি আরও কিছু পিছিয়ে গিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সী এবং তাঁদের সঞ্চালক উইলিয়ম কেরীকেই সে গৌরবের অংশভাগী করতে চাইতেন। কিন্তু একটু সতর্ক হয়ে ভেবে দেখলেই এ বিষয়ে অনেক ভুল ধারণার নিরসন হবে। একথা অবশ্যই সত্য যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সী, রামমোহন বা বিদ্যাসাগর—কেউ-ই বাংলা গদ্য সৃষ্টি করেন নি। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য কয়েকখানি গদ্যনিবন্ধ ও কাহিনী-সংক্রান্ত পুস্তিকা রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল—একথা সত্য বটে, এবং এর

আগে বাংলা গদ্যে লেখা কোন কাহিনী-বিষয়ক পুস্তিকা রচিত হয় নি, প্রবন্ধগ্রন্থও রচিত হয় নি—একথাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পর্বত-গহ্বরবন্দী জলকুণ্ডেরও উৎস আছে; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পূর্বেও বাংলা গদ্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলা গদ্যে লেখা চিঠিপত্র পাওয়া যাচ্ছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেও চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, মনুষ্য-ক্রয়বিক্রয়পত্র, চুক্তিপত্র, বিবাদ-মীমাংসা এবং সহজিয়া বৈষ্ণবদের পুঁথিপত্রে বাংলা গদ্যের যে ব্যবহার দেখা যায় তা যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি সরল। তার অন্বয়ও পুরো সাধুভাষার রীতি অনুসরণ করেছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, প্রাগাধুনিক যুগে চিঠিপত্রের মতো নিতান্ত 'কেজো' ব্যাপারে বাংলা গদ্যের ব্যবহার থাকলেও সাহিত্যকর্মে গদ্যের প্রয়োগ বড় একটা হত না। শুধু কাব্য সমাপ্তিতে পুষ্পিকায় পুঁথি রচনা বা নকলের সংবাদাদি গদ্যেই লেখা হত। যথা—"লিখিতং শ্রী পিতমলাল সুকুল। সাকিম সামপুর পরগণে জাহানাবাদ। পঠনার্থে শ্রীরঘুনাথ ভকত সাং বদনগঞ্জ পরগণে জাহানাবাদ। সন ১২৪০ বার শত চল্লিশ সাল তারিখ ২৮ আঠাস্যা কার্তিক রোজ মঙ্গলবার বেলা তিন প্রহরের সমএ সমাপ্ত হইল।"[১]

মধ্যযুগে গদ্যাত্মক ব্যাপারেও পয়ার-ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হত। আজ-কাল হলে মঙ্গলকাব্য গদ্যেই লেখা হত। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের অনেকটা গদ্যে লিখলে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। কিন্তু সে যুগের লেখকেরা ব্যবহারিক কর্মে গদ্যের ব্যবহার জানলেও সাহিত্যকর্মে কেন গদ্যের ব্যবহার করেন নি, তার কারণ অনুমান করা যেতে পারে।

সে যুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ ছিল গীতাত্মক ও আবৃত্তিমূলক।

---

১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের একখানি পুঁথির পুষ্পিকা। পুঁথি সংখ্যা—১৫

সব কাব্যই হয় গান করা হত, আর না হয় সুর করে পাঁচালীর ঢঙে আবৃত্তি করা হত। উপরন্তু দেবলীলা বা দেবপ্রভাবিত মর্ত্যলীলাই ছিল কাব্যরচনার প্রধান *motif* ; সে ক্ষেত্রে ছন্দোবদ্ধ বাক্‌নির্মিতিই ছিল প্রশস্ত। উপরন্তু চৌদ্দ মাত্রার পয়ার ছন্দটি অতিশয় স্থিতিস্থাপক —এতে গদ্যাত্মক কাজও দিব্যি চলে যায়। বোধ হয় এইজন্য সাহিত্যকর্মে বাংলা গদ্যের ব্যবহার হতে বিলম্ব হয়েছিল। তবে এই গদ্যরীতির মূলে এই প্রভাবগুলি কার্যকরী হয়েছিল বলে মনে হয়ঃ সংস্কৃত গদ্যরীতি, কথক ঠাকুরদের রচনাবিন্যাস এবং সরল পয়ারের বিলম্বিত তাল। কালক্রমে পয়ারছন্দের লয় বর্ধিত হয় এবং অন্ত্যানুপ্রাস উঠে গিয়ে মুখের কথার প্রভাবে গদ্যরীতির উদ্ভব হয়। অবশ্য প্রাচীন বাংলা গদ্যের ছাঁদটি বিশুদ্ধ সাধুভাষার ছাঁদ হলেও মুখের কথার বিন্যাসপদ্ধতি যে গদ্যরীতিকে প্রভাবিত করবে তাতে আর আশ্চর্য কি। গদ্ ধাতুর তো মানেই হল কথা বলা।[২] কিন্তু প্রাচীন বাংলায় পয়ার-ত্রিপদার মূল ছাঁদটি যেমন প্রায়শই সাধুরীতিকে অনুসরণ করেছে, তেমনি খুব পুরনো কাল থেকেই বাংলা গদ্যে সাধুরীতি অনুসৃত হয়ে আসছে। অনেকের ধারণা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতের দলই বাংলা গদ্যের কৃত্রিম সাধুরীতি তৈরী করেছিলেন। এ-কথা যে ঠিক নয়, তার প্রমাণ প্রাগাধুনিক পর্বের এই গদ্য পত্রগুলি ঃ

> ১. "এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার-আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।" (১৪৭৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে অহোমরাজকে লেখা কুচবিহাররাজের পত্রাংশ)[৩]

২. 'সাহিত্যদর্পণে' গদ্যের সংজ্ঞা—"বৃত্তগন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্"—অর্থাৎ ছন্দোলেশ-বর্জিত পংক্তিকে গদ্য বলে। দণ্ডী 'কাব্যাদর্শে' বলেছেন, "অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্"—যাতে চতুষ্পদীবৎ পদবিভাগ নেই তাকে গদ্য বলে।

৩. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ২য়, পৃ. ১৬৭২

২. "অতঃপর তারা প্রভৃতি দেবদারা সকল শিবের করে প্রহেলিকা প্রবন্ধে গৌরীকে সমর্পণ করিয়া কথোপকাল পালন করি বা হবেক ইঙ্গিত করিতেছেন অবধান করহ।"[৪] (সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন, এতে মাঝে মাঝে দু'চার ছত্র গদ্য আছে।)

৩. "আপনে আমার জ্ঞানদাতা শ্রীগুরু আপনি আমার জ্ঞান জন্মাইয়াছেন কিনা তাহার বুঝিবার কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহাতে আপনি আমাকে যে প্রকার জ্ঞান জন্মাইয়াছেন তাহাতে আমি যে প্রকার বুঝিয়াছি তেমত কহিলাম।"[৫] (১১৫৮ বঙ্গাব্দ বা ১৭৫০ খৃঃ অব্দে নকল করা 'জ্ঞানাদিসাধনা' শীর্ষক সহজিয়া গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।)

৪. "আমরা স্বকীয়ার দস্তখত বিনা বিচারে পারিব না আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বী অতএব বিচারে যে ধর্ম স্থায়ী হয় তাহাই লইবে এই মত করার হইল বিচার মানিলাম তাহাতে পাতসাই শুভা শ্রীযুত নবাব জাফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল তিঁহো কহিলেন ধর্মাধর্ম বিনা তজবিজ হয় না অতএব বিচার কবুল করিলেন।"[৬] (১২০৫ বঙ্গাব্দে বা ১৭১৭ খৃঃ অব্দে প্রস্তুত বৈষ্ণব পরকীয়া মত স্থাপনের দলিল)

৫. "সবিশেষ পত্রার্থে জ্ঞাত হইবে ১১ মাঘ রটন্তি চতুর্দ্দশীতে দুই প্রতিমার স্থাপনা করাইবে তাহার পরে শ্রীযুত দীননাথ রায়কে এথা পাঠাইবে। ফিতরত আলি খাঁ এথা পহুঁচে নাগ্রি দাখিল হইলে তাহার চলন মাফিক ব্যবহার হবেক শ্রীযুত মেস্তর মেদলটীন সাহেবকে জে খত এ পত্রের মধ্যে পাঠাইতেছি তাহাতে গোন্দ না দিয়া মহর করিয়া পাঠাইলাম পাঠ করিয়া গোন্দ দিয়া বন্ধ করিয়া তাঁহাকে দিয়া তথাকার রোয়দাদ লিখিবা আপনার মঙ্গলবার্তা

৪. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত 'শিবায়ন', পৃ. ১৪৬

৫. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ২য়, পৃ. ১৬৩৭

৬. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৩৮

লিখিয়া স্থির রাখিবা।"[৭] (১১৭৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৭২ খৃঃ অব্দে পুত্র গুরুদাসকে লেখা মহারাজ নন্দকুমারের চিঠি)

এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাবে, ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে-সমস্ত গদ্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে তার সাহিত্যগুণ ধর্তব্যের মধ্যে না হলেও এর অন্বয়বিন্যাস ও বাচনরীতি মোটামুটি সাধুভাষাকেই অনুসরণ করেছে। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দী থেকে চিঠিপত্র, ক্রয়-বিক্রয়, দলিলদস্তাবেজ-সংক্রান্ত গদ্য রচনাগুলিতে সে যুগের রেওয়াজ মতো অজস্র ফারসী-আরবী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। হলহেড তাঁর *The Grammar of the Bengal Language*-এ জগতধির রায়ের যে চিঠিখানিকে[৮] বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপিত করেছেন তাতে ইসলামী শব্দের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। সুতরাং সাধারণ কাজেকর্মে ও আদালতের বাংলায় কতটা আরবী-ফারসীর প্রভাব ছিল তা সহজেই অনুমান করতে পারা যায়। এখনও কি ধর্মাধিকরণের প্রাঙ্গণ থেকে সেমেটিক ভাষার অকারণ প্রাচুর্য উঠে গেছে? সে যাই হোক, শাসন-কার্য ও আইন-আদালতের প্রয়োজনেই সে যুগের গদ্যে কত আরবী-ফারসীর ছড়াছড়ি ঘটেছিল। এমন কি ফোর্টউইলিয়ম কলেজের রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'ও (১৮০১) ইসলামী শব্দের বাড়াবাড়ি হাস্যকর হয়ে পড়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আর-এক বিখ্যাত অধ্যাপক ও পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অসাধারণ ভাষাকুশলী হলেও তাঁর 'রাজাবলি'তে (১৮০৮) তিনি মুসলমান

৭. নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' থেকে উদ্ধৃত।

৮. এই ব্যাকরণ সাহেব কর্মচারীদের জন্য ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে ইংরেজীতে ছাপা হয়, শুধু দৃষ্টান্তগুলি বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল। উক্ত চিঠির একাংশ: "আমার জমিদারি পরগণে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দারিয়াপীকিশতী হইয়াছে সেই দুই গ্রাম পয়শতী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরী আজ জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শর-বরাহত মারা পড়িতেছি…।"

রাজত্বের ইতিহাস বর্ণনায় প্রচুর ইসলামী শব্দ (যথা—জিম্মা, কিল্লা, দখল, জবান, দমা, ওগয়রহ, তক্ত, তমস্থক, জলুস, মোক্তিয়ার, সলাই, সিক্কা, খোতবা, জিন্নতুল, বিলায়েৎ, বিরাদরি, দরমাদি, চুগল, খেদমত, গুজারি ইত্যাদি) ব্যবহারে কৃপণতা করেন নি। ১৭৮৮ সালে টমাস বাইবেলের যে সামান্য অনুবাদ করেছিলেন তাতেও ইসলামী শব্দ স্থান পেয়েছিল। যথা—"খোদার মাহিনা মিতু´ কিন্তু খোদার চিরকালই জিছছ্‌ ক্রাইষ্ট হইতে।" কিন্তু কেরী ও হলহেড বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের বাড়াবাড়ি আদৌ পছন্দ করতেন না। বোধ হয় কেরীর নির্দেশেই রামরাম বসু তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপিমালা'র (১৮০২) ভাষা থেকে ইসলামী শব্দের বহর একেবারে কমিয়ে দেন। কেরীর বাইবেল অনুবাদের ভাষাভঙ্গিমা অনভ্যস্ত ও কৃত্রিম হলেও তিনি সাধুভাষার ওপর ভিত্তি করেই বাইবেল অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। এখানে সাধুভাষার দৃষ্টান্ত হিসেবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত বলে গৃহীত একটু পরিচ্ছন্ন গদ্যের নমুনা উদ্ধৃত হচ্ছে :

> "বিক্রমাদিত্য কহিতে লাগিল। কন্যার খাটের সঙ্গে কথা কহিতে-ছিলাম। কন্যা তাহা গোষা করিয়া ফিরিয়া দিলেন। এ ঘরে আর কেহ আছহ। তালবিতাল উত্তর দিলেক। কেনো মহারাজ। পরে রাজা কহিলেন। কে তুমি। তালবিতাল কহিলেক। আমি রাজকন্যার পরিধেয় বস্ত্র…বল শুনি কন্যার কাপড়। সে কন্যা কে পাইবে। তালবিতাল কহিলেক। যে ফিরা ঘরে গিয়াছে সেই পাই-বেক। কন্যা একথা শুনিয়া কাপড় ফেলিতে পারেন না। হাসিয়া উঠিলেন। কথা কহিলেন।"[৯]

এখানে দেখা যাচ্ছে তালবেতালের গল্পে যেমন পরিহাসরস জমেছে, তেমনি সাধুভাষার ছাঁদটিও প্রায় আধুনিক কালের মতোই আকার নিয়েছে।

৯. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২৯শ ভাগ ('ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাগজপত্র'—ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)

৩.

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের বিবরণে দেখা যাচ্ছে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীরা, স্বয়ং রামমোহন এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) প্রকাশের পূর্ববর্তী সাময়িকপত্রে বাংলা গদ্যের অনভ্যস্ত জড়তা অনেকটা হ্রাস পেতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীদের অনেকেরই ভাষার জড়তা ঘোচে নি, কারও অন্বয় ঠিক হয় নি। এঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যভাষায় বেশ দক্ষতা ছিল; তিনি নানা ধরনের গদ্যরীতি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন; গুরুগম্ভীর সংস্কৃতগন্ধী সাধুভাষা, পরিচ্ছন্ন সরল সাধুভাষা এবং ভদ্রেতর সমাজের সংলাপ থেকে পাওয়া 'স্ল্যাং' ধরনের কথ্যভাষা—প্রতিটি বিভাগেই তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় (আনুমানিক ১৮১৩ সালে রচিত, ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত) কিছু কিছু উৎকট পংক্তি আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন, কটমট ধরনের দুর্বোধ্য গদ্য লিখতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।[১০] কিন্তু একথা সত্য নয়। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় নানা ধরনের গদ্যরীতির উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি সংস্কৃত শ্লোকের মূলানুগ অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষা অনেক সহজ অথচ ক্লাসিক গাম্ভীর্যপূর্ণ। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর এই রীতিটিকে মার্জিত করে যাবতীয় মননকর্মের বাহন করে তুলেছিলেন। ভাষাশিল্পী হিসেবে মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কিছু সাদৃশ্য আছে। লৌকিক বাগ্‌বিন্যাসের রীতি মৃত্যুঞ্জয় কতটা সাফল্য ও ঔদার্যের সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন, এখানে তার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে:

---

১০. রামগতি ন্যায়রত্ন এবং দীনেশচন্দ্র সেন মৃত্যুঞ্জয়ের একটি ছত্র তুলে তাঁকে নিন্দা করেছেন। সেটি হল এই—"কোকিল-কুল-কলালাপ-বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছী করাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে" (দ্রঃ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী', পৃ. ২৪৪)। এটি কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা নয়, একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ। 'বৈষম্য দোষরহিত' এবং 'সাম্যগুণবৎ বাক্যে'র উদাহরণ হিসেবে তিনি এই পংক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন।

"ইহা দেখিয়া গতিক্রিয়া কহিল খাও এখন পিঠা খাও যেমন মতি তেমনি গতি। অনন্তর তৎপতি গালে হাত দিয়া অধোমুখ হইয়া কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া কহিল যা যা তুই আর পোড়াসনে যার যেমন কপাল তার তেমনি সকলি মিলে। কিন্তু যা হউক বেটা ভাল বটে, আমি বিশ্ববঞ্চক আমাকেও বঞ্চনা করিল বাপের বেটা বটে। এ ব্যক্তি যেখানে থাকুক সেখানে গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুয়ালি করিতে হইল।[১১]

উইলিয়ম কেরীও এই ধরনের চল্‌তি বুলির সহায়তায় 'কথোপকথন' (ইংরেজী আখ্যা—*Dialogues, intended to facilitate the acquiring of the Bengalee Language—1801*) লিখেছিলেন।[১২] এ ভাষার কাঠামো সাধুভাষার হলেও এতে সংলাপের বাক্‌রীতিটি অনুসৃত হয়েছে ঃ

১মা—ওলো তোর ভাতার কারে কেমন ভালবাসে তাহা বল শুনি।
২য়া—আহা তাহার কথা কহ কেন এখন আর আমাদের কি আদর আছে। নূতনের দিকে মন ব্যতিরেকে পুরাণের দিকে কে চাহে।
১মা—তাহা হউক। তুই সকলের বড় তোর ছালাপিলা হইয়াছে।
২য়া—কালিকে ভাই দুপরবেলা কচকচি লাগালে মাঝ্যাবিটি তাহা কি বলিব।
১মা—কি জন্য কচকচি হইল।
২য়া—দূর কর ভাই। তাহা কহিলে আর কি হবে লোকে শুনিলে মন্দ বলিবে। আমার বাড়ী ভরা শত্রু এই জন্য ভয় করি।[১৩]

রাজা রামমোহন রায়কে (১৭৭৪-১৮৩৩) বাংলা গদ্যের একজন প্রধান লেখক বলা হয়ে থাকে। বলতে গেলে তিনি বাঙালীকে হাতে

১১. ঐ গ্রন্থ, পৃ. ২৬১

১২. এর সবটা তাঁর লেখা নয় বলে মনে হচ্ছে—মৃত্যুঞ্জয়ের বিশেষ প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়।

১৩. রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র তের সংখ্যক পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত।

ধরে বাংলা গদ্য পড়তে শিখিয়েছেন।[১৪] তাঁর আগে কেরী এবং তাঁর অনুচরবর্গ বাংলা গদ্যকে সাহিত্যকর্মে ব্যবহার করলেও মননশীল ও বিতর্কের বিষয়কে গদ্যের যুক্তিবন্ধের মধ্যে আনবার প্রথম গৌরব রামমোহনের প্রাপ্য। অবশ্য তাঁর গদ্যকে ঠিক সাহিত্যগুণোপেত ভাষা বলা যায় না। প্রমথ চৌধুরী তাঁর গদ্যরীতি সম্বন্ধে বলেছেন, "এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্ব-পক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।"[১৫] নৈয়ায়িক বাংলার উত্তর-সাধক রামমোহনের ভাষা হয় অধিকাংশ স্থলে বিতর্কের ভাষা হয়েছে, নয়তো "সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনা-পদ্ধতি"র অনুকরণে (প্রমথ চৌধুরী) পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর মতো অমিতবলশালী জ্ঞানযোদ্ধা ও অতন্দ্র কর্মযোগী বাংলা গদ্যের শিল্পরূপ দিতে পারেন নি, বড়ই আক্ষেপের বিষয়। অবশ্য কয়েক স্থলে তিনি অতি চমৎকার সরল গদ্য লিখেছিলেন। তাঁর 'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ'-এর (১৮২৩) তীক্ষ্ণ পরিহাস ছেড়ে দিলেও এর বাগ্‌ভঙ্গিমার লঘু ধরন বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। অতি সহজ, পরিচ্ছন্ন, সরস গদ্য লেখার সামর্থ্যও যে তাঁর প্রচুর ছিল তা এই দৃষ্টান্ত থেকে প্রতিভাত হবে :

> "বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন ; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকল পত্নী দাস্যবৃত্তি করে……স্ত্রীলোক সকল

১৪. 'বেদান্ত গ্রন্থে'র "অনুষ্ঠানে" রামমোহন লিখেছিলেন, "বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষমতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন।" (সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত "বেদান্ত গ্রন্থ", পৃ. ৯)

১৫. বিশ্বভারতী প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধসংগ্রহ', ১ম, পৃ. ৮০

গোসেবাদি কর্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম, তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।…দুঃখ এই যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"[১৬] (প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ)

(১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হলে সাহিত্য-রসসিক্ত গদ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা হল) রামমোহন বাংলা গদ্যকে সর্ববিধ মননকর্মের বাহন করে তুললেও তাতে রসসৃষ্টির অবকাশ ছিল না, যদিও তাতে বিচার-বিতর্ক খুব ভালো ভাবেই সমাধা হতে পারত।[১৭] দেখা গেছে রামমোহনের সমকালেই অনেকের লেখাতেই সাধু ছাঁদের পরিচ্ছন্ন রূপটি ক্রমেই একটা বিশিষ্ট রীতিরূপে ফুটে উঠেছিল। এখানে আমরা রামমোহনের সমকালীন কয়েকজন লেখকের রচনার যৎসামান্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে সে কথার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করব।

১. "এই সকল কথা শুনিয়া হাসিও পায় দুঃখও হয়। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যদি এই সকল গর্হিত কর্ম্ম করিলেই লোকে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়,তবে

১৬. সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত রামমোহন গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ", ১৮১৯ সালে প্রথম প্রকাশিত, পৃ. ৪৮

১৭. রামমোহন-ভক্ত কবি ঈশ্বর গুপ্ত এ বিষয়ে যথার্থ বলেছেন, "তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পরিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।" সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৪, ১৩ই মার্চ, (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িক পত্র' ৫২ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।)

হাড়ি ডোম চাঁড়াল ও মুচি ইহারা কি অপরাধ করিয়াছে, ইহারদিগকেও কেন ব্রহ্মজ্ঞানী না কহা যায়, তাহারা ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়সকল হইতেও এই সকল কর্ম্মে বরং অধিকই হইবেক, ন্যূন কোন মতেই হইবেক না…"।[১৮] (রামমোহনের প্রতিযোগী কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ডপীড়ন'—১৮২৩ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত)

২. "তালধ্বজ পুরীতে বিক্রম নামে রাজার পুত্র মাধব এক দিবস সৈন্য-সামন্ত সহিত মৃগ মারিতে কোন মহাবনে গিয়া সৈন্যসামন্ত রাখিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া অতিশীঘ্র মৃগের পাছে পাছে গিয়া আপন সেনাগণের অদৃশ্য হইলেন। অতি নির্জ্জন বনে মৃগের অন্বেষণে প্রবেশ করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, সে বনে চন্দ্রকলার মত চন্দ্রকলা নামে পরম সুন্দরী ষোড়শ বর্ষীয়া এক কন্যা জল লইতে সরোবরে যাইতেছে।"[১৯] (গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক'—১৮২৪)

৩. "বহু অন্বেষণ করিয়া যশোহরনিবাসী এক মুনসী সমভিব্যাহারে লইয়া আগমন করিলেন। কর্ত্তা কহেন শুন মুনসী আমার সন্তানদিগকে পারসী পড়াইবা এবং বহির্দ্বারে থাকিবা। যে দিবস বাবুরা কোন স্থানে নিমন্ত্রণে যানারূঢ় হইয়া গমন করিবেন সঙ্গে যাইবা। মাষ খোরাকি তিনটঙ্কা পাইবা।" (১৮২৩ সালে রচিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে প্রমথনাথ শর্মার 'নববাবুবিলাস' থেকে উদ্ধৃত।)

৪. "কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস মাস ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাস মাস ছাপা যাইত তবে কাহারো

১৮. 'রামমোহন গ্রন্থাবলী'র (সা. প. সংস্করণ) অন্তর্ভুক্ত পুস্তিকা 'পাষণ্ডপীড়ন' থেকে উদ্ধৃত।

১৯. বাংলা ১২৩১ অব্দে স্কুলবুক সোসাইটির জন্য মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩১

উপকার হইত না অতএব তাহার পরিবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।"[২০] (১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা)

৫. "এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহাদিগের কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদান্ত মনুমিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাঁহাদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।"[২১] (১৮৩১ সালে প্রকাশিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের প্রথম সংখ্যা)

৬. "মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন। অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ, যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবে।"[২২] (১৭৬৫ শকে ১লা ভাদ্র প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা)

৭. "পারি যুবরাজ হইয়াও গোরক্ষক ছিলেন, এবং সেই পর্ব্বতে আপন পিতার পশুগণ চরাইতেছিলেন; তিনি সেই স্থানে ঐ তিন দেবী কর্ত্তৃক সৌন্দর্যের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, বিনস দেবী অতি সুন্দরী; তাহাতে যুনো ও মিনর্বা এই উভয় দেবী বড় বিমর্ষা হইয়া ও ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার প্রাচীন পিতাকে শাস্তি করিতে উদ্যত হইলেন।" (কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে ১৮৩০ সালে প্রকাশিত 'সত্য ইতিহাসসার' পৃ. ৯)

২০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িক পত্র', পৃ. ১৬

২১. ঐ, পৃ. ৫৬

২২. বিনয় ঘোষ সম্পাদিত 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (২য় খণ্ড), পৃ. ৮৩

এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে দেখা যাবে, রামমোহনের সমকালে এবং বিদ্যা-সাগরের আবির্ভাবের আগেই সাধু ছাঁদের বাংলা গদ্য শিক্ষিতসমাজে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল—এ বিষয়ে সাময়িক পত্রের দানও কম নয়। কিন্তু তখনও সুর-তালের সামঞ্জস্য ও বাক্যগঠনের স্থিতিস্থাপকতা অনেকের কানে ধরা পড়ে নি। বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ('বেতালপঞ্চবিংশতি') থেকেই বাংলা গদ্যের মেদমাংসে লাবণ্য সঞ্চার করতে থাকেন। গদ্যভাষারও যে একটা বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতি আছে, তারও কবিতার মতো সুর-তাল-যতি আছে—সর্বোপরি গদ্যেও বিশেষ ব্যক্তিমনের প্রতিফলন হতে পারে, সাহিত্যে যাকে 'স্টাইল' বলে—একথা তাঁর গ্রন্থগুলিতে সর্বপ্রথম অবলীলাক্রমে ফুটে উঠল। অতঃপর আমরা এই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুবাদ ও অনুবাদমূলক রচনা

১.

বিদ্যাসাগরের পুণ্যস্মৃতি তর্পণ করতে গিয়ে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছিলেন, "রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা মরা-মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল। এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।" প্রায় সত্তর বছর (১৮৯৬) আগে রামেন্দ্রসুন্দর সক্ষোভে এই উক্তি করেছিলেন। তাঁর সংশয় এখনও অপনোদিত হয় নি; বরং যতই দিন যাচ্ছে ততই আমরা বিদ্যাসাগরের মানসিকতার উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলছি। বস্তুতঃ বর্তমান বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতিতে তাঁকে কিছুতেই স্থাপন করতে পারছি না। কারণ "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে" (রামেন্দ্র-সুন্দর)। সেই স্পর্ধা আজ ধৃষ্টতায় পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি বাঙালী-জীবনের ওপর দিয়ে যে অপঘাতের স্রোত বয়ে চলেছে, তাতে জাতি হিসেবে, একটা ঐশ্বর্যবান সংস্কৃতির বাহক হিসেবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার ইতিহাস ও ভূগোলের প্রেক্ষাপটে ক্রমেই হারিয়ে যেতে বসেছে। নীতি ও আদর্শের অবক্ষয়, জীবন সম্বন্ধে হেডোনিস্টিক ভোগ-বাদ এবং যে-কোন স্থায়ী বোধের বিরুদ্ধে, 'এস্টাব্লিশ্‌মেন্টে'র প্রতিকূলে নাস্তিক্যবাদী বৈনাশিকতা পূর্ব-প্রত্যন্তবাসী বাংলাভাষী নৃগোষ্ঠীকে ক্ষণভঙ্গবাদী মহাশূন্যতায় নামিয়ে দিচ্ছে। আজকে এই

কালাপাহাড়ী অবমূল্যায়নের যুগে, "এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায়" একাকী দাঁড়িয়ে আছে। সেই অশেষকল্যাণপ্রদ বিপুল ছায়াবিস্তারী ন্যগ্রোধের বিশালত্ব অনুধাবন করতে পারলে আমাদের মতো লতাগুল্মেরা এখনও বেঁচে যেতে পারে।

বর্তমান প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের চরিতকীর্তন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সে কাজ পূর্বযুগের আচার্যেরা করে গেছেন, জীবনচরিতকারেরা তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সমাপন করে ধন্য হয়েছেন। তবু তাঁর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে তাঁর চরিতকথার উল্লেখের কারণ—সেই বৃহৎ, মহৎ, প্রকাণ্ড মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সামান্যতম শ্রদ্ধা না থাকলে তাঁর গ্রন্থালোচনা নিষ্ফল হবে। এখন আবার অর্বাচীন বাল-খিল্যসমাজে পুরাতনের প্রতি দারুণ অনীহা সঞ্চারিত হচ্ছে, বিগতকে কবরস্থ করাই অধুনা ফ্যাশন বলে পরিগণিত হতে চলেছে। আজকের দিনে তাই তাঁর গ্রন্থালোচনা প্রসঙ্গে কবিগুরুর একটি বাণী মনে পড়ছে, "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।" বিদ্যাসাগরের বিচিত্র কীর্তি, সার্থক সাফল্য, সার্থকতর অসাফল্য—এ সব তাঁকে আজকের খর্ব-মানসিকতার যুগে অশেষ গৌরব দিয়েছে বটে; কিন্তু কর্মের সফলতা-বিফলতা দিয়ে তাঁর কীর্তির পরিমাপ করা যায় না। আসল কথা, কেবল কীর্তি দিয়েই তাঁকে মাপা যায় না। মনুষ্যত্ব হল হীরক, আর কীর্তি হল তার দীপ্তি। অনেক সময় চক্ষুষ্মান ব্যক্তিও দীপ্তির কিরণচ্ছটায় মুগ্ধ হয়ে কীর্তির জননস্থানটিকে ভুলে থাকেন। বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব তাঁর চরিত্রের প্রধান পরিচয়। কীর্তি, গৌরব, খ্যাতি-প্রতিপত্তি—সবই সেই মনুষ্যত্বকে কেন্দ্র করে চারিদিকে আলোর কণিকা বিচ্ছুরিত করেছে। তাই তাঁর গ্রন্থালোচনার প্রারম্ভে আমরা তাঁর সেই মহৎ মনুষ্যত্বকে স্মরণ করতে চাই।

২.

বিদ্যাসাগরকে কেউ কেউ (এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও) সে যুগে শুধু স্কুলপাঠ্য পুস্তিকা ও অনূদিত গ্রন্থের রচনাকার বলে গদ্যশিল্পী হিসেবে তাঁর কৃতিত্বকে লঘু করতে চাইতেন। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের গঠনের কালে অনুবাদ-কর্মের দ্বারাই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। তা ছাড়াও বিদ্যাসাগরের যে সমস্ত স্বাধীন রচনা আছে, তাতেও তাঁর মৌলিক রচনাশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময় লেখকের কৃতিত্বের গুণে অনূদিত গ্রন্থও মৌলিক গ্রন্থের মতোই চিত্তাকর্ষী হয়। এই অধ্যায়ে সেই কথাটাই প্রমাণের চেষ্টা করা যাবে।

'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হলেও, তাঁর জীবনচরিতকারদের মতে তিনি তারও আগে 'বাসুদেবচরিত' নামে একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন, যেটি ভাগবতের কৃষ্ণলীলার অন্তর্ভুক্ত কিয়দংশের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নি, এবং তার পাণ্ডুলিপিও নষ্ট হয়ে গেছে। এ বিষয়ে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করা গেছে।

বিদ্যাসাগরের দু'জন জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহারীলাল সরকার বলেছেন যে, 'বাসুদেবচরিত'-এর জীর্ণ পাণ্ডুলিপি তাঁরা স্বচক্ষে দেখেছিলেন।[১] এবং সেই পাণ্ডুলিপি থেকে তাঁরা স্ব-স্ব গ্রন্থে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন।

পাণ্ডুলিপির কোন্ পত্রাঙ্ক থেকে উদাহরণ নেওয়া হয়েছে তাঁরা তাও জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যাসাগর 'বেতালপঞ্চ-

---

১. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর (১৮৯৫), পৃ. ১৩৪
বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর (১৩২৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৮০
আমাদের এই আলোচনায় চণ্ডীচরণ ও বিহারীলাল-রচিত জীবনচরিত দু'খানির উল্লিখিত সংস্করণ থেকেই 'বাসুদেবচরিত'-সংক্রান্ত উপাদান ও উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে, পৃষ্ঠাঙ্কও ঐ সংস্করণের।

বিংশতি'র পূর্বেই 'বাসুদেবচরিত' রচনা করেছিলেন, বোধহয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে।[২]

সম্প্রতি একটি সংবাদে দেখা যাচ্ছে যে, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা কৃষ্ণলীলাবিষয়ক একখানি গদ্য-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আছে। লেখকের নাম হেনরি সার্জ্যান্ট। এটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কাগজপত্রের অন্তর্ভুক্ত।[৩] সাদা কাগজের খাতায় লেখা ভাগবত-অবলম্বী এই পাণ্ডুলিপির আখ্যাপত্র এই ধরনের:

> শ্রীমদ্ভাগবত/শ্রীশ্রীনারায়ণের অষ্টমাবতার/শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জন্ম ও বাল্যলীলা/এবং কংস বধের উপাখ্যান/ভাষা সংগ্রহঃ/হেনেরি সার্জ্যান্ট শাহেবেন ক্রিয়তে।

সারজ্যান্ট বোধহয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং বাংলা শিখে ভাগবতের কিয়দংশের চমৎকার অনুবাদ করেন। পাণ্ডুলিপিতে পেন্সিল দিয়ে সংশোধনের অস্পষ্ট চিহ্ন আছে, হাতের লেখা চমৎকার, কোন বাঙালী লিপিকারের হওয়াই অধিকতর সম্ভাবনা। এই সম্পর্কে কেউ কেউ অনুমান করেছেন, বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ছিলেন,[৪] তখন

২. বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃ. ১৫৯

৩. এশিয়াটিক সোসাইটির এই পাণ্ডুলিপির সংখ্যা—বঙ্গ—৪১। তালিকায় এই ভাবে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: Substance—country-made paper, 11×7 inches, folio 66, written in prose, character Bengali of the 19th century. Appearance fresh. This is one of the Mss. of Fort William College Collection.

৪. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগর দু'বার শিক্ষকতা করেছিলেন। প্রথমবার সেরেস্তাদারের (শিক্ষক) পদে বহাল ছিলেন ১৮৪১ থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত। তারপর সংস্কৃত কলেজে অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন, কিন্তু সেক্রেটারী রসময় দত্তের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে তিনি সে পদে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করে হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন (১৮৪৯)। অবশ্য এর কিছু দিন পরে তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজে আহূত হন, এবং অধ্যক্ষের পদে বৃত হন (১৮৫০)।

তিনি বোধ হয় কোন সিভিলিয়ান ছাত্রের লেখা ভাগবতের কিছু কিছু সংশোধন করে দেন। পরে যখন কলেজ-কর্তৃপক্ষ তাঁকে সরল বাংলায় বিদেশী ছাত্রের উপযোগী কোন আখ্যান লিখতে বললেন,[৫] তখন তিনি 'বাসুদেবচরিত' রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে করেন যে, বিদ্যাসাগর 'বাসুদেবচরিত' নামে বাস্তবিক কোন আখ্যান-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। উক্ত হেনরি সার্জ্যাণ্টের ভাগবত অনুবাদের কথা কিংবদন্তীর আকারে বিদ্যাসাগরের রচনা বলে প্রচারিত হয়েছে, প্রচার করেছেন তাঁর জীবনচরিতকারদ্বয়। কিন্তু এ অনুমানের পক্ষে কোন যুক্তি নেই। বিদ্যাসাগরের চরিতকারেরা যদি নির্জলা মিথ্যা বলে থাকেন তো আলাদা কথা। অন্য কোন বিরোধী প্রমাণ না পেলে 'বাসুদেবচরিত'কে বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্যগ্রন্থ বলে স্বীকার করে নিতে হবে।

অবশ্য উক্ত সার্জ্যাণ্ট সাহেবের বাংলা গদ্যের রীতি সে যুগের যে-কোন বাঙালীর পক্ষে শ্লাঘনীয় হতে পারত : "অনেক দিন পরে ভাদ্র-মাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথীতে বুধবারে অর্ধরাত্রিতে যখন পৃথিবী অনেক দুরাচার ও অধর্ম দ্বারা অনাথার ন্যায় হইলেন তখন স্বর্গ হইতে ঈশ্বরীযষ্টিহত (?) প্রকাশিত আশ্চর্য সন্তান উৎপন্ন হইলেন যে সময় বাসুদেব সেই বালককে সন্দর্শন করিয়া দিব্যচক্ষু পাইলেন তখন বুঝিলেন যে ইনি নিশ্চয় ঈশ্বর বটেন দেবকীরও তদ্রূপ জ্ঞান হইল....।"[৬] এ ভাষা বিদেশীর রচনা বলে মনেই হয় না।

মনে হয় এ আখ্যানে হিন্দুর ধর্মগ্রন্থের কাহিনী গৃহীত হয়েছিল বলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষ এটি কলেজের পাঠ্য গ্রন্থরূপে গ্রহণ ও প্রকাশ করতে সম্মত হন নি।[৭] পাণ্ডুলিপির আকারে এ গ্রন্থ বহুদিন বিদ্যাসাগরের কাছে ছিল, পরে যখন তিনি মুদ্রণের জন্য সচেষ্ট

৫. বিহারীলাল সরকারের উক্ত গ্রন্থে (পৃ. ১৫৯) তার উল্লেখ আছে।
৬. এশিয়াটিক সোসাইটির পাণ্ডুলিপির (বঙ্গ—৪১) ৭ ফোলিও।
৭. বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর', পৃ. ১৭৯

হন, তখন পাণ্ডুলিপিটি খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁর জীবিতকালে এর মুদ্রণ সম্ভব হয় নি। তাঁর লোকান্তর প্রাপ্তির পরে তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র অনেক কষ্টে এই পাণ্ডুলিপি কীটদষ্ট অবস্থায় খুঁজে পান এবং বিদ্যাসাগরের জীবনীকার দু'জনকে তিনি এ পাণ্ডুলিপি দেখতে দেন। তাঁরা এ পাণ্ডুলিপি (বিশেষতঃ বিহারীলাল) অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়েছিলেন।[৮] মনে হয় এই গ্রন্থ বিদ্যাসাগরের প্রথম বার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় এবং 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র রচনার পূর্বেই রচিত হয়। বিহারীলাল সরকার মনে করেন, ১৮৪২ থেকে ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে কোন-এক সময়ে এ গ্রন্থ রচিত হয়ে থাকবে।[৯]

বিদ্যাসাগরের এ অনুবাদ যে অতি সুললিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি এই গ্রন্থে অনুবাদ-কর্মের প্রথম পরীক্ষা করেছেন, রচনার গুণে অনুবাদ বলে মনেই হয় না। জীবনচরিতকারের একথা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত : "ইহা অবলম্বন বা অনুবাদ হউক ; লিপিচাতুর্য ও ভাষা-সৌন্দর্যে মূল সৃষ্টিসৌন্দর্যের সমীপবর্তী" (বিহারীলাল)। এর বিষয়বস্তু হল শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের কয়েকটি আখ্যান ; ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নয়, কোথাও ভাবানুবাদ, কোথাও-বা কিঞ্চিৎ আক্ষরিক অনুবাদ। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

> "একদিবস কৃষ্ণবলরাম ও অন্য অন্য গোপবালকেরা একত্রে মিলিয়া খেলা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে বলরাম প্রভৃতি গোপনন্দনেরা নন্দমহিষীর নিকট গিয়া কহিল, ওগো, কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছে। আমরা বারণ করিলাম, শুনিল না। তখন পুত্রবৎসলা যশোদা আস্তেব্যস্তে আসিয়া কৃষ্ণের গণ্ড ধরিলেন এবং তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, রে দুষ্ট তুই মাটি খাইয়াছিস! রহ, আজ আমি তোকে মাটি খাওয়া ভাল করিয়া শিখাইতেছি।"[১০]

---

৮. বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' পৃ. ১৮০

৯. ঐ, পৃ. ১৮০

১০. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর (পৃ. ১৬৪)

এই অনুবাদ যে কত সরল, তা পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত এবং শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত অধুনা-প্রচলিত ভাগবতের অনুবাদ (পৃ. ৬২২) মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।* বিহারীলাল সরকার বলেছেন, "তবে 'বাসুদেবচরিত'-এর অনুবাদের ভাষা ও লিপিভঙ্গী অপেক্ষা তাঁহার পরবর্তী অনুবাদ ও প্রবন্ধাদির লিপিভঙ্গী যে অধিকতর পরিমার্জিত ও বিশুদ্ধীকৃত হইয়াছে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।"[১১] এ বিষয়ে আমরা কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করি। 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রথম সংস্করণের ভাষা 'বাসুদেবচরিত'-এর ভাষার চেয়ে অনভ্যস্ত। কিন্তু 'বাসুদেবচরিত'-এর ভাষা প্রথম রচনা বলে মনেই হয় না। এর পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়াতে বাংলা গদ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

৩.

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ১৮৪৭ সালে (সংবৎ ১৯০৩) প্রকাশিত হয়। এই আখ্যানগ্রন্থ থেকে সে যুগের বাঙালী-সমাজ সর্বপ্রথম গল্পরসের আস্বাদ লাভ করে। বেতালের অদ্ভুতরস এবং বুদ্ধির চমক সে যুগের সাধারণ পাঠকের বিশেষ কৌতূহল জাগিয়েছিল। শিরীষ বৃক্ষে প্রলম্বমান বেতালের প্রশ্নে রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচক্ষণ জবাব সহজ বুদ্ধিকেই আশ্রয় করেছে, কোন কুটিল, জটিল বা দুরূহ-দুরধিগম্য বিষয় বেতাল অবতারণা করে নি। যে প্রশ্নের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা জবাব দেওয়া যায় বিক্রমাদিত্যের অবলম্বন সেই সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি। রাজা বেতালের আখ্যানঘটিত চব্বিশটি প্রশ্নেরই

*তুলনীয়—"একদা রাম প্রভৃতি গোপবালকেরা ক্রীড়া করিতে করিতে আসিয়া মাতা যশোদাকে নিবেদন করিল,—'কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে।' হিতৈষিণী যশোদা শিশুর হস্তদ্বয় ধারণপূর্বক ভয়চকিতলোচনে পুত্রকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—'রে দুর্বিনীত! নির্জনে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছিস কেন?"—শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত, (পৃ. ৬২২), ১৩৬২ বঙ্গাব্দ

১১. বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর (পৃ. ১৭৮)

যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়েছেন, কেবল শেষ আখ্যানের (পঞ্চবিংশতি আখ্যান) জবাব দিতে না পেরে মৃদু হেসে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছেন। সে আখ্যান ও তৎসংলগ্ন প্রশ্নটি এখানে সংক্ষেপে বলা যাচ্ছে ঃ

দাক্ষিণাত্যের ধর্মপুর নগরের রাজা মহাবল রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে মহিষী ও কন্যাকে নিয়ে অরণ্যে পালিয়ে যান। একদা আহার সংগ্রহের ইচ্ছায় অন্যত্র যাবার সময়ে তিনি অরণ্যের একস্থানে মহিষী ও কন্যাকে বসিয়ে রেখে যান। বহুক্ষণ হয়ে গেলেও রাজা ফিরলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হল। তখন মাতা-কন্যা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে রোদন করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে কুণ্ডিনের অধিপতি চন্দ্রসেন এবং তাঁর পুত্র ঐ অরণ্যে মৃগয়াব্যপদেশে হাজির হন। তাঁরা মাতা ও কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে রাজধানীতে নিয়ে এলেন এবং "কিছুদিন পরে, রাজা রাজকন্যার, রাজকুমার রাজমহিষীর পাণিগ্রহণ করিলেন।" এই আখ্যানটি বিবৃত করে বেতাল জিজ্ঞাসা করল, "মহারাজ! এই দুই নারীর সন্তান জন্মিলে তাহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ হইবে, বল।" এ উদ্ভট প্রশ্নের জবাব দেওয়া দুরূহ। এখনকার বেতাল একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করতে পারত, এদের সন্তান পরস্পরকে কি বলে ডাকবে। এ হেঁয়ালীর যথার্থ জবাব হয় না। তাই "বিক্রমাদিত্য, ঈষৎ হাসিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।" অবশ্য আমাদের পিতৃ-অনুগামী সমাজ বলে এ প্রশ্নেরও জবাব দেওয়া যায়। তাদের মধ্যে খুড়ো-ভাইপোর সম্বন্ধ হবে। অর্থাৎ রাজা চন্দ্রসেন এবং মহাবলের কন্যার সন্তান হবে খুল্লতাত, এবং রাজপুত্র হবে ভ্রাতুষ্পুত্র। এই আখ্যান থেকে মনে হচ্ছে, শিরীষবৃক্ষে দোদুল্যমান বেতালের বাসরঘরের জামাই-ঠকানো প্রশ্ন বিলক্ষণ জানা ছিল।

এ আখ্যান অবক্ষয়ী হিন্দুযুগে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। ফলে এতে নরনারীর শঠতা, বঞ্চনা, চরিত্রভ্রষ্টতা, কামুকতা এবং উপপতি-উপপত্নীর বাহুল্য অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। এর সঙ্গে সে যুগের সমাজ-জীবনের কিছু সংযোগ থাকা বিচিত্র নয়। কারণ অধঃপতিত ভ্রষ্ট সমাজ

না হলে ভ্রষ্ট নরনারীরগল্প সে-যুগে এত মুখরোচক হত না।'বেতালপঞ্চবিংশতি'র মূল হচ্ছে সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর', তাতে এটি "বেতালপঞ্চবিংশতিকা" নামে উল্লিখিত হয়েছে।'কথাসরিৎসাগরে' এবং ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী'-তে বেতালের আখ্যানপুরাতন আকারেই ছিল — যদিও মূল গল্পগুলির উৎস অন্য কোন বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে হয়। পরে অনেকেই এই আখ্যানগুলিকে পদ্যে এবং গদ্যে-পদ্যে ('চম্পূ') পুনর্লিখনে উৎসাহিত হয়েছিলেন। শিবদাস ভট্ট, জম্ভলদত্ত এবং বল্লভদাসের নামে 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র নানা সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গেছে। কেউ কেউ বলেন, গল্পগুলি নাকি পূর্বে ছন্দেই লেখা হয়েছিল। এর মধ্যে বল্লভদাসের গল্পগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত।[১২] এ পর্যন্ত সংস্কৃত 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র তিনটি নির্ভরযোগ্য সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে কলকাতা থেকে জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় জম্ভলদত্তের বেতাল নাগরী অক্ষরে ছাপা হয়। বেতালের এই হচ্ছে এই অঞ্চলের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ। এরপর লাইপজিগ থেকে ১৯১৫ সালে শিবদাস ভট্টের মূল সংস্কৃত বেতাল জার্মান টীকা সহ প্রকাশিত হয়—*Die Vetala Pancavimsatika*, এবং ১৯৩৪ সালে American Oriental Series-এর চতুর্থ খণ্ডে জম্ভলদত্তের বেতাল প্রকাশিত হয়েছে।[১৩] প্রাদেশিক ভাষাতেও এর অনুবাদ খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে রাজা জয়সিংহের আদেশে সুরত কবীশ্বর 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র ব্রজভাখায় অনুবাদ করেন। গিলক্রাইস্টের প্রবর্তনায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য উক্ত কলেজের মুন্সী মুজাহার আলি খাঁ (ইনি 'বিলা' নামে হিন্দুস্থানী সাহিত্যে পরিচিত) এবং 'প্রেমসাগর'-এর কবি লাল্লু লাল কব্ ব্রজ্ভাখা থেকে হিন্দীহিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করেন (১৮০৫)। এর নাম দেওয়া হয়েছিল

১২. A. B. Keith—*History of Sanskrit Literature* (1941), p. 288.

১৩. Edited by M. B. Emenneaw.

'বৈতাল পচ্চীসী'। ১৮৫২ সালে বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় এর একটি নতুন সংস্করণ এবং ১৮৫৮ সালে হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারা বিদ্যাসাগরের সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়।[১৪] বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' সংস্কৃত থেকে নয়, 'বৈতাল পচ্চীসী' শীর্ষক হিন্দুস্থানী গ্রন্থ থেকেই অনূদিত হয়েছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ (সেক্রেটারী) জি. টি. মার্শেলের নির্দেশে বিদ্যাসাগর "বৈতাল পচীসী নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন" (দ্বিতীয় সংস্করণ বেতালের বিজ্ঞাপন) করে অনুবাদ করেন এবং নাম দেন 'বেতালপঞ্চবিংশতি'। এর প্রথম থেকে নবম সংস্করণ পর্যন্ত তিনি বিরামচিহ্ন হিসেবে শুধু দাঁড়ি চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু দশম সংস্করণ (১৯৩৩ সংবৎ—১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ) থেকে ইংরেজী গ্রন্থের কমা-সেমিকোলন প্রভৃতি বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছিল।[১৫] সংস্কৃত থেকে অনুবাদ না করে তিনি হিন্দুস্থানী 'বৈতাল পচ্চীসী' থেকে কেন অনুবাদ করলেন তার কারণ দুর্জ্ঞেয় নয়। প্রথম বার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারের (অর্থাৎ প্রধান পণ্ডিত) পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে তাঁকে বিদেশী ছাত্রদের বাংলা পড়াতে হত, বাংলা ও হিন্দীতে লেখা উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে হত। কার্যানুরোধে তাঁকে বেশ ভালো করে ইংরেজী ও হিন্দী শিখতে হয়েছিল। একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত প্রতিদিন তাঁকে হিন্দী শেখাতেন। এইভাবে তিনি অল্পকালের

১৪. এটির আখ্যাপত্র এইরূপ: *The Bytal-Pacheesee* or The Twenty-five Tales of the Demon (Vidyasagara's edition), Printed by Harish Chandra Tarkalankar (1858), Published by W. Nassan Lees.

১৫. দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, "এই পুস্তক, এত দিন, বাঙ্গালা ভাষার প্রণালী অনুসারে মুদ্রিত হইয়াছিল; সুতরাং ইঙ্গরেজী পুস্তকে যে সকল বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পূর্ব পূর্ব সংস্করণে সে সমুদয় পরিগৃহীত হয় নাই। এই সংস্করণে সে সমস্ত সন্নিবেশিত হইল।"

মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্থানী ভাষায় বিশেষ অধিকার অর্জন করেন। হিন্দী ভাষা-জ্ঞান তাঁর কিরকম আয়ত্তে এসেছে তার পরীক্ষা করবার জন্যই বোধহয় তিনি হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী' অবলম্বনে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। অবশ্য এর কিছু কিছু উগ্র আদিরসের বর্ণনা (যা মূল সংস্কৃতেও ছিল) তিনি দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে ত্যাগ করেছিলেন।

একদা 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র গ্রন্থকর্তৃত্ব সম্বন্ধে কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটেছিল। বিদ্যাসাগরের সতীর্থ, সহকর্মী ও বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগরের সর্ববিধ মঙ্গলকর্মে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন —এ বিষয়ে তাঁর মন আশ্চর্য ধরনের আধুনিক ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে 'বিদ্যাভূষণ') ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত 'কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্‌-গ্রন্থ আলোচনা' পুস্তিকার দু' এক স্থলে এমন মন্তব্য করেছিলেন যে, বিদ্যাসাগরের ক্ষুব্ধ হবার কারণ ঘটেছিল। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, যদিও ও গ্রন্থ বিদ্যা-সাগরের রচনা বলে চলে, তবু ও-তে তাঁর শ্বশুর মদনমোহনেরও যথেষ্ট দান আছে :

> "বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতি-তে অনেক নূতনভাব, ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" (ঐ পুস্তিকা, পৃ. ৪২)

একথা সত্য হলে এ গ্রন্থের যশোভাগ দুজনকেই ভাগ করে দিতে হবে এবং প্রকারান্তরে বিদ্যাসাগরের ওপর অনৃতাচারের অভিযোগ এসে পড়বে। যিনি সারাজীবন 'পিরামিডের'[১৬] মতো মাথা উঁচু করে চলে-

১৬. কবি মানকুমারী বসু বিদ্যাসাগরের শেষকৃত্যের সময়ে শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। মহাপুরুষের নশ্বর কলেবর ভস্মীভূত হতে দেখে শোকাহত মানকুমারী এইভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন, "অই জাহ্নবী বক্ষে ধূ ধূ করিয়া

ছিলেন, অন্যায় অসত্যকে বিষবৎ পরিহার করে চলতেন, তিনি প্রিয়বন্ধু মদনমোহনের পরিশ্রমের গৌরব আত্মসাৎ করবেন এ কখনও সম্ভব নয়।[১৭] আসল ব্যাপার বিদ্যাসাগর 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে বেতালের রচিতাংশ শুনিয়ে তিনি তাঁদের অভিমত চাইতেন। 'জীবনচরিত'-এর বিজ্ঞাপনেও তিনি মদনমোহনের নিকট অনুবাদকর্মের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিলেন। বেতাল-সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলছেন :

> "আমি বেতালপঞ্চবিংশতি লিখিয়া, মুদ্রিত করিবার পূর্বে, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে[১৮] শুনাইয়াছিলাম। তাহাদিগকে শুনাইবার অভিপ্রায় এই যে কোনও স্থল অসঙ্গত ও অসংলগ্ন বোধ হইলে, তাঁহারা স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন; তদনু-

চিতার আগুন জ্বলিতেছে। ঐ আগুনে বাঙ্গালার সর্বনাশ হইতেছে।—বাঙ্গালীর পিরামিড ভস্মসাৎ হইতেছে।" —শোকোচ্ছ্বাস

১৭. বরং তিনি নিজের রচনা অপরের নামে প্রকাশ করতে কখনও দ্বিধা বোধ করেন নি। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকার সময়ে *Moral Class Book* অবলম্বনে 'নীতিবোধ' রচনা আরম্ভ করেন। খানিকটা রচনার পর এ গ্রন্থ রচনা ত্যাগ করে কার্যান্তরে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর অনুমতিক্রমে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও কিছু লিখে বিদ্যাসাগরের রচনাগুলি সহ 'নীতিবোধ' নিজ নামে প্রকাশ করেন।

১৮. মদনমোহন বিদ্যাসাগরের সহচর হলেও চরিত্রের দিক দিয়ে নরম প্রকৃতির ছিলেন, শনৈশ্চরের ধূম্রবলয়ের মতো বিদ্যাসাগরের চারিদিকে আবর্তিত হতেন। তার চরিত্র সম্বন্ধে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য যথার্থ বলেছেন, "বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার-বিদ্যাসাগর দুইজনেই বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র অংশে আসমান-জমিন প্রভেদ। যাহাকে back-bone কহে, বিদ্যাসাগরের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয়তো vertebrate শ্রেণীর অন্তর্গত হবেন কিনা সন্দেহ।" —বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম, পৃ. ১৩৬

সারে আমি সেই সেই স্থল পরিবর্ত্তিত করিব। আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, কোন কোন উপাখ্যানে একটি স্থলও তাঁহাদের অসঙ্গত বা অসংলগ্ন বোধ হয় নাই; সুতরাং সেই সেই উপাখ্যানের কোনও স্থলেই কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা ঘটে নাই। আর, সে সকল উপাখ্যানে, স্থানে স্থানে, দুই একটি শব্দ মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন ও তর্কালঙ্কার ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই করেন নাই।" (বেতালের দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন)

তখন মদনমোহন পরলোক গমন করেছেন, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তখনও সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখে পাঠালেন: "এতদ্বিষয়ে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই— আপনি, বেতালপঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত হইত। বেতালপঞ্চবিংশতি বিষয়ে আমার অথবা তর্কালঙ্কারের, এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।"[১৯] এই সমস্ত উল্লেখ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র গ্রন্থকর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাসাগরের, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মদনমোহন এবং অনুচর

১৯. মদনমোহন বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও উভয়ের মধ্যে নানা কারণে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের 'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস' পুস্তিকায় কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। মদনমোহনের লোকান্তরের বেশ কয়েক বৎসর পরে তাঁর জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শ্বশুরের জীবনচরিত রচনাপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রতি কয়েকটি প্রচ্ছন্ন কটু ইঙ্গিত করেছিলেন। তার মধ্যে কিছু ইঙ্গিত অর্থনৈতিক, কিছু 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-র গ্রন্থকর্তৃত্ব সম্বন্ধে মদনমোহনের দান সম্পর্কিত। তবে এই ঘটনাটি নাকি যোগেন্দ্রনাথ তারানাথ তর্কবাচস্পতির কাছে শুনেছিলেন। (দ্রষ্টব্য: বিহারীলালের 'বিদ্যাসাগর' পৃ. ১৯৪)

গিরিশচন্দ্রকে তিনি কিছু কিছু অংশ শুনিয়েছিলেন, তাঁদের অভিমতও চেয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে বোমণ্ট ও ফ্লেচারের নাটকের মতো 'বেতালপঞ্চবিংশতি' দু' বন্ধুর মিলিত রচনা—একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রথম সংস্করণের ভাষায় কিছু জড়তা ছিল, এবং দু-চারটি আদিরসের উগ্র বৃত্তান্তও ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি ভাষার জড়তা অনেকটা কাটিয়ে ওঠেন এবং অপ্রচলিত দুরূহ শব্দের স্থলে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেন। অবশ্য ভূরুহ,[২০] প্রাড়্-বিবাক, মলিম্লুচ, বৈয়র্থ্য, মহানস প্রভৃতি দু'চারটি অপ্রচলিত শব্দ থাকলেও বিদ্যাসাগর বেতালের ভাষাবিন্যাস ও শব্দযোজনায় অতি সরল অথচ গম্ভীর রীতি ব্যবহার করেছেন। যাকে সাহিত্যের সাধু-ভাষা বলে, তার প্রথম পরিচয় 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র ভাষায় পাওয়া গেল। এখানে এই ধরনের দুটি একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

> ১. "এই মায়াময় সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে লিপ্ত থাকিলে, কেবল জন্মমৃত্যু পরম্পরারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে হয়। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থ মাত্রই মায়াপ্রপঞ্চ, বাস্তবিক কিছুই নহে। কে

২০. প্রথম সংস্করণের ভাষা দ্বিতীয় সংস্করণ থেকেই সরল হতে আরম্ভ করে। প্রথম সংস্করণে ছিল, "উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল উৎফুল্ল ফেননিচয়চুম্বিত ভয়ঙ্কর তিমিমকরশক্রচক্র ভীষণ স্রোতস্বতীপতি-প্রবাহ মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য-তরু উদ্ভূত হইল।" পরবর্তী সংস্করণে এর গুরুভার হ্রাস পেল, "কল্লোলিনী-বল্লভের প্রবাহ মধ্য হইতে অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল।" (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪) 'বৈতাল পচ্চীসী'-র রূপান্তর—"সাগরমেঁ সে এক সোনেকা তরবর নিকলা। বহু জমুরুদকে পাত, পুখরাজকে ফুল, মুক্তেকে ফলোঁসে ঐসা খুব লদা হুআ থা, জি জিসকা বয়ান নহী হো সকতা।" বেতালের প্রথম সংস্করণে মূল 'বৈতাল পচ্চীসী'র অনাবশ্যক আলঙ্কারিক বাহুল্য তিনি কিছু রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বর্ণনার ঘনঘটা অনেকটা পরিত্যাগ করেন। শুধু লাল্লুলাল যেখানে 'সোনেকা তরবর' বলেছেন, সেখানে বিদ্যাসাগর একটু অপ্রচলিত 'ভূরুহ' শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

কাহার পিতা, কে কাহার পুত্র। সকলই ভ্রান্তিমূলক"।[২১] (বিদ্যা-সাগর-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬)

২. "তথায় এক অতি মনোহর সরোবর ছিল। তিনি তাহার তীরে গিয়া দেখিলেন, কমল সকল প্রফুল্ল হইয়া আছে; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া, গুণগুণ রবে গান করিতেছে; হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গগণ তীরে ও নীরে বিহার করিতেছে; চারিদিকে, কিশলয় ও কুসুমে সুশোভিত নানাবিধ পাদপসমূহ বসন্তলক্ষ্মীর সৌভাগ্য বিস্তার করিতেছে; সর্ব্বতঃ শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতেছে।" (বি. রচনাবলী, পৃ. ৯০)

৩. "সখি! আমি এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি, কি উপায় করি, বল। গৃহে গিয়া কেমন করিয়া, পিতামাতার নিকট মুখ দেখাইব। তাঁহারা কারণ জিজ্ঞাসিলে, কি উত্তর দিব। বিশেষতঃ আজ আবার সেই সর্ব্বনাশিয়া আসিয়াছে; সেই বা, দেখিয়া শুনিয়া কি মনে করিবেক! সখি! তুমি আমায় বিষ আনিয়া দাও, খাইয়া প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলেই সকল আপদ ঘুচিয়া যায়।" (ঐ, পৃ. ৪৪)

এই তিনটি দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে প্রথমটিতে ক্লাসিক গাম্ভীর্য, দ্বিতীয়টিতে রোমান্টিক বর্ণনার জন্য ভাষা ভঙ্গিমায় কিছু লঘুতা এবং তৃতীয়টিতে সাধুভাষার মারফতে নাটকীয় ধরনের মেয়েলি বাক্‌রীতি অনুসৃত হয়েছে।

শোনা যায় গোড়ার দিকে নাকি বেতালের ততটা জনপ্রিয়তা হয় নি। প্রথম দিকে ভাষার অনভ্যস্ততাই বোধ হয় তার কারণ। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে ভাষা সরল ও মার্জিত হলে এটি একটি আদর্শ আখ্যানগ্রন্থরূপে সর্বত্র সমাদৃত হয়। এমন কি, সে যুগে "অনেকে বেতালের অনেক অংশ

২১. এখানে পৃষ্ঠাসংখ্যা বিদ্যাসাগর রচনাবলীর পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশ করছে। অন্য উল্লেখ না থাকলে, বিদ্যাসাগরের রচনা-উদ্ধৃতিতে যে পৃষ্ঠাঙ্ক থাকবে তা এই গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক বুঝতে হবে।

মুখস্থ করিয়া রাখিতেন।"[২২] পল্লীগ্রামের অন্তঃপুরিকারাও এ গ্রন্থ শুনতে খুব ভালোবাসতেন।[২৩]

অনুবাদে বিদ্যাসাগর লাল্লুজীর হিন্দু-হিন্দুস্থানী গ্রন্থকে রেখায় রেখায় অনুসরণ করেন নি, অনেক স্থান বাদ দিয়েছিলেন (দ্বিতীয় সংস্করণে আদিরসের গল্পগুলির উত্তাপ হ্রাস করা হয়), অনেক দীর্ঘ বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছিলেন। এখানে শিবদাস ভট্টের 'বেতালপঞ্চবিংশতি', লাল্লুজীর 'বৈতাল পচ্চীসী' এবং বিদ্যাসাগরকৃত বাংলা 'বেতালপঞ্চবিংশতি' থেকে একই অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত হচ্ছে :

১. "অন্যদা শ্মশানে নিশীথসময়ে রুদন্তঃ সকরুণং শব্দং রাজা শৃণোতি। রাজ্ঞোক্তম্ দ্বারে কস্তিষ্ঠতি। বীরবরেণোক্তম্ দেবাহমস্মি। রুদন্ত্যা নার্য্যাঃ শব্দং শৃণোমি। তেনোক্তম্। তস্যাঃ সমীপে গত্বা শীঘ্রমেব স্বরূপং সমানয়। ততো বীরবরো রুদন্ত্যাঃ শব্দলগ্নোগতঃ।" (শিবদাস ভট্ট)

২. "অলকিস্সঃ একরোজ কা জিক্রহৈ কি ইত্তিফাকন রাতকে বক্ত মরঘটমে রংডীকে রোনেকী আবাজ আই। রাজা সুনকে পুকারা কোই হাজির হৈ। বীরবর সুনতে হী বোলা হাজির জী হুকম, রাজনে যো হুকম কিয়া, জহা সে ঔরতকী রোনেকী আবাজ আতী হে, যহাঁ জাও; ঔর উসসে রোনেকা খবর পুছকর জলদ আও..।" (১৮৫৮ সালে মুদ্রিত 'বৈতাল পচ্চীসী'র নব সংস্করণ)

৩. "একদিন নিশীথ সময়ে, অকস্মাৎ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া রাজা বীরবরকে আহ্বান করিলে, সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিল, মহারাজ! কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, দক্ষিণদিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শুনা যাইতেছে; ত্বরায় ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া আমায় সংবাদ দাও। বীরবর, যে আজ্ঞা মহারাজ, বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।" (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ১ম, পৃ. ৩২)

২২. বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর, পৃ. ১২৯

২৩. দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক (সৈরিন্ধ্রীর উক্তি- "ছোট বউ, বসিস, আমি আসচি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুনব।")

লাল্লুজী ব্রজ্ ভাখা থেকে অনুবাদ করলেও শিবদাস ভট্টের সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে এর বিশেষ পার্থক্য নেই। অবশ্য জম্ভল দত্ত ও শিবদাস ভট্টের মধ্যে ভাষাগত কিছু পার্থক্য আছে। বিদ্যাসাগর মূলকে যথাসম্ভব অনুসরণ করেছেন। গ্রন্থ রচনার পর এটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের উপযুক্ত হয়েছে কিনা তার বিচারের ভার পড়ে রেভাঃ কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। তিনি প্রতিকূল মত প্রকাশ করেন। তখন বিদ্যাসাগর শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সায়েবের অনুকূল মত সংগ্রহ করে এ গ্রন্থকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ 'বেতালপঞ্চবিংশতি'কে কলেজ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত হন।[২৪] কিন্তু বেতাল সম্বন্ধে কৃষ্ণমোহনের আপত্তির কারণ বোঝা যাচ্ছে না। বেতালের প্রথম সংস্করণের ভাষার কিছু জড়তা ছিল বটে, কিন্তু কৃষ্ণ-মোহনের 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'-এর তুলনায় এ ভাষা কোনও দিক দিয়েই কঠিন নয়। আর তাছাড়া খ্রীস্টানধর্মাবলম্বীদের অরুচিকর হতে পারে এমন বিশেষ কোন ধর্মীয় ব্যাপারেরও (কালিকার কাছে বলি দেওয়ার প্রসঙ্গ বাদ দিলে) উল্লেখ নেই। তবে রুচির স্থূলতার জন্য (সংস্কৃত 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' ও হিন্দী 'বৈতাল পচ্চাসী'-তে প্রচুর অশ্লীল উপাখ্যান আছে) হয়তো কৃষ্ণমোহন এ আখ্যানের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যের আখ্যানে এরকম আদিরসের গল্প হামেশাই পাওয়া যাবে, আধুনিক কালের রুচি যাকে প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারবে না। বিদ্যাসাগর ১৮৫২ সালে লাল্লুজীর 'বৈতাল পচ্চাসী'র যে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার ভূমিকায় তিনি সংস্কৃতে লেখা মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "The work contains no traces

২৪. এই বই ছাপাতে খরচ হয়েছিল তিন শ' টাকা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী মার্শেল সায়েব একশ খানি কপি (প্রত্যেকখানির দাম তিন টাকা) কলেজের জন্য কিনে নিলে বিদ্যাসাগরের মুদ্রণব্যয় সঙ্কুলান হয়। বাকি কপিগুলি বন্ধুবান্ধবদের উপহার দিতেই ফুরিয়ে যায়। কাজেই প্রথম সংস্করণে এর থেকে বিদ্যাসাগরের বিশেষ কিছুই প্রাপ্তি ঘটে নি। দ্রষ্টব্য—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' (পৃ. ১৬৭)।

of art or genius in its composition, but on the contrary exhibits the clumsy attempts at the wonderful, sometimes bordering on childishness, which are so general in the Legends of a dark age." সে যাই হোক সরস অনুবাদের গুণে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' একদা অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল—গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরেই সে জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল। বাংলা গদ্যের বিবর্তন ইতিহাসের দিক থেকেই 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' অধিকতর মূল্যবান, কারণ এই গ্রন্থেই সাহিত্যের গদ্যের প্রথম সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে।

৪.

জন ক্লার্ক মার্শম্যান সায়েবের *Outlines of the History of Bengal for the use of Youths in India* গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় (একাদশ—উনবিংশ অধ্যায়) অবলম্বনে বিদ্যাসাগর 'বাংলার ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ' (১৮৪৮) রচনা করেন। এতে ১৭৫৬ সাল অর্থাৎ সিরাজের সিংহাসন লাভের পর থেকে শুরু করে ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দ —লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকাল পর্যন্ত মোট উনআশি বৎসরের বাংলার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মার্শম্যানের ইংরেজী গ্রন্থ দীর্ঘকাল ছাত্র-সমাজের পাঠ্যপুস্তক বলে পরিগণিত হয়েছিল, এ ছাড়া স্টুয়ার্টের ইতিহাসও কিছু জনপ্রিয় ছিল। তবে মার্শম্যানের গ্রন্থ অধিকতর বিস্তারিত ও তথ্যবহ—অবশ্য শ্বেতাঙ্গ-অহমিকা বর্জিত নয়। বিদ্যা-সাগরের সঙ্গে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের, বিশেষতঃ মার্শম্যান সায়েবের বেশ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। মিশনারীদের প্রতি তাঁর কোন বিরাগ ছিল না।[২৫] 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র ব্যাপারে মার্শম্যানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

২৫. অনেক মিশনারীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বেশ সদ্ভাব ছিল। বোস্টনের ইউনিটেরিয়ান খ্রীস্টান সোসাইটির সদস্য পাদরি ডল সায়েব এদেশে এসে ধর্মতলায় Useful Arts School খুলেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে খুব ভালো-বাসতেন, ডল সাহেবও বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। (বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃ. ৪৯৩)

মার্শম্যানের ইংরেজী গ্রন্থটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ বলে বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থের কয়েকটা অধ্যায় প্রায় অনুবাদ করলেন। এর রচনার গুণে গ্রন্থটি ছাত্রসমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আর একটা কৌতূহলজনক সংবাদ দেওয়া যেতে পারে। ১৮৫০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী মেজর জি. টি. মার্শেল বিদ্যাসাগরের 'বাংলার ইতিহাস'-এর ইংরেজী অনুবাদ টীকাটিপ্পনীসহ প্রকাশ করেন।) গ্রন্থটির আখ্যাপত্র এইরূপ : *A Guide to Bengal* being a close translation of *Ishwar Chandra Sharma's,* Bengalee Version of that portion of *Marshman's History of Bengal,* which comprizes the rise and progress of the British Dominion, with notes and observations, By *Major G. T. Marshall,* Secretary and Examiner to the Fort William. এর ভূমিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্গ-সরকার ১৮৪৬ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য দু'খানি বাংলা পাঠ্যপুস্তকর পৃষ্ঠপোষকতা করবার জন্য দুটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দেন—কোন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক যুগের হিন্দু-রাজার বর্ণনা এবং ভারত বা বাংলাদেশের ইংরেজ রাজত্বকালীন ইতিহাস। "Accordingly two works were prepared by Iswar Chandra Sharma, namely, 'Betala Panchabingshati' being a translation of Hindee work 'Bytal Pachisi', containing legends of Raja Vikramaditya and 'Banglar Itihas' being a free translation of that portion of Marshman's History of Bengal which comprehends the rise and progress of the British Dominion in Bengal." মার্শেল সায়েব মার্শম্যানের সম্মতিক্রমে বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর ইংরেজী অনুবাদ করে নাম দেন *A Guide to Bengal.* তিনি বাংলাভাষা বেশ ভালই জানতেন,

সুতরাং তাঁর অনুবাদ মূল গ্রন্থকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছিল।[২৬] উপরন্তু তিনি বিদেশী ছাত্রদের জন্য এতে বাংলাদেশের পথঘাট, লোকজন, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধেও কিছু কিছু টীকা যোগ করে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারদের মধ্যেও কতটা খ্যাতিলাভ করেছিল—এটাই তার বড় প্রমাণ। এর সুললিত ভাষা ও পরিচ্ছন্ন ভঙ্গিমার জন্য সে যুগের কেউ কেউ এর অনেকস্থল আবৃত্তি করতে পারতেন।[২৭]

এ গ্রন্থ রচনার পর বিদ্যাসাগরের নির্দেশ ও উপদেশে তাঁর স্নেহভাজন পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মার্শম্যানের ইংরেজী গ্রন্থের প্রথমাংশ অনুবাদ করে 'বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ' (১৮৫৯) রচনা করেন। এতে তিনি "হিন্দু রাজাদিগের চরমাবস্থা অবধি নবাব আলিবর্দী খাঁর অধিকার কাল পর্যন্ত" সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। উক্ত পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি মার্শম্যান ও স্টুয়ার্টের নাম উল্লেখ করেছিলেন।

বাংলার ইতিহাস পুনরুদ্ধারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যেমন কৌতূহলী ছিলেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিলেন, এ-বিষয়ে একখানি বিস্তারিত গ্রন্থ লিখবার জন্য বহু উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ভারত ও বাংলার ইতিহাস-সংক্রান্ত দেশীয় ও ইংরেজীভাষায় লেখা বহু গ্রন্থ ও তথ্য সংগৃহীত

২৬. মার্শেল যে বাংলা ভাষা বেশ ভালোই আয়ত্ত করেছিলেন তা তাঁর উক্তি থেকেই বোঝা যাবে: "My principal objects in this undertaking have been, to give a specimen of close and accurate translation into, and to illustrate by notes the etymology and idiomatic peculiarities of the language translated from." (*A Guide to Bengal*—Preface)

২৭. জীবনচরিতকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "আমরা বাল্যকালে বিদ্যালয়ে এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম। এখনও তাহার সুমিষ্ট পদাবলীপূর্ণ স্থানসকল কণ্ঠস্থ আছে।" ('বিদ্যাসাগর', পৃ. ১৬৮)

হয়েছিল।[২৮] কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হল না। এজন্য তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও পরিচিত জনের কাছে নিত্যই ক্ষোভ প্রকাশ করতেন।[২৯] শেষজীবনে শয্যাগত হয়েও বাংলার তথা ভারতের ইতিহাস রচনার অভিলাষের কথা ভুলতে পারেন নি। সেই সময় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, "ভারতবর্ষের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, কেবল শরীর ভাল নয় বলিয়া আজ কাল করিয়া বিলম্ব হইয়া পড়িতেছে।"[৩০]

সে যুগে বাংলাভাষায় লেখা ছাত্রপাঠ্য বাংলার ইতিহাস বলতে প্রায় কোন গ্রন্থই ছিল না। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যা-কল্পদ্রুমে' রোম ও মিশর দেশ সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও তাঁর ভাষা অত্যন্ত জড়তাগ্রস্ত, স্কুলপাঠ্য হওয়ার অনুপযোগী। ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'গ্রীকদেশীয় ইতিহাস' (১৮৩৩), ফেলিক্স কেরীর 'ব্রিটনদেশীয় বিবরণসঞ্চয়' (১৮১৯-২০) মার্শম্যানের 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ' (১৮৩৩), পিয়ার্সনের 'প্রাচীন ইতিহাসসমুচ্চয়' (১৮৩০) প্রভৃতি গ্রন্থগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের ইতি-হাসের বড় একটা যোগাযোগ ছিল না। কারণ এগুলি অন্যদেশের ইতিবৃত্ত। একমাত্র ক্ষেত্রমোহনকে বাদ দিলে, অন্য লেখকদের রচনা-ভঙ্গিমার জড়তার জন্য তাঁদের গ্রন্থ আদৌ জনপ্রিয় হয় নি। অবশ্য রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' ভারতের রাজপুতকাহিনী (১৭৭৩ শকের ২য় সংখ্যা), চন্দ্রগুপ্তের বিবরণ (ঐ সংখ্যা), ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, সম্রাট অশোক প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রামাণিক

২৮. তাঁর গ্রন্থাগারে সিরাজদ্দৌলা সংক্রান্ত এত তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল যে, শুধু সেই উপাদান অবলম্বনেই বিহারীলাল সরকার 'ইংরেজের জয়' নামে একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। (বিহারীলালের 'বিদ্যাসাগর', পৃ. ১৯৯)

২৯. বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর (পৃ. ১৯৯)

৩০. চণ্ডীচরণ—বিদ্যাসাগর (পৃ. ১৮৯)

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। নীলমণি বসাকের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৫৭) স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ হলেও এতেই সর্বপ্রথম ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের হিন্দু, পাঠান ও মুঘল যুগের ইতিহাস আলোচনার চেষ্টা দেখা যায়। উক্ত ইতিহাসের প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে নীলমণি বসাক যা বলেছিলেন বিদ্যাসাগরের অভিমতের সঙ্গে তার কোন বিরোধ নেই : "এই দেশের যে পুরাবৃত্ত আছে, তাহা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গালা ভাষাতে এই পুরাবৃত্ত প্রায় নাই। এই ভাষাতে যে দুই একখানা পুস্তক দেখা যায়, তাহা ইংরাজী হইতে ভাষান্তরিত, তাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং তাহা এমত নীরস যে, কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং পাঠ করিলেও তৃপ্তিবোধ হয় না। অধিকন্তু এই সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠের উপযোগী নহে, এইজন্য তাহা কোন পাঠশালাতে পঠিত হয় না, সুতরাং বালকেরা ভারতবর্ষের ভালমন্দ কিছুই জানিতে পারে না, এবং ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বালকের এমত সংস্কার জন্মে যে, এদেশের ধর্ম্মকর্ম্ম সকলি মিথ্যা এবং হিন্দুরা পূর্ব্বকালে অতি মূঢ় ছিলেন, অপর বালকেরা অন্যদেশের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে, কিন্তু জন্মভূমির কোন বিবরণ বলিতে পারে না।"

বিদ্যাসাগর স্কুলপাঠ্য পুস্তকের জন্যই মার্শম্যানের গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন বটে, কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য এই গ্রন্থের প্রথম পরিকল্পনা হয়।[৩১] সে যাই হোক এর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিমা এত চমৎকার যে, একে প্রায় মৌলিক গ্রন্থ বলেই মনে হয়। কিন্তু কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন (যথা বিহারীলাল সরকার), বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের শ্বেতাঙ্গসুলভ অ-ভারতীয় মনোভাবকেও অবিকল গ্রহণ করেছেন কেন? উপরন্তু অন্ধকূপহত্যা সম্বন্ধে তিনি নিঃস্পৃহভাবে মার্শম্যানের বিবৃত

৩১. G. T. Marshall—*A Guide to Bengal* (Preface). ইতিপূর্বে মার্শালের সেই উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে।

ঘটনাই মেনে নিয়েছেন, তার সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেন নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে, এমন কি, এই শতাব্দীতেও অনেকে সিরাজের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান। ইংরেজের শত্রু আমাদের মিত্র, এই সূত্রানুসারে সিরাজকে ভাবাবেগের দৃষ্টিতে প্রায় শহীদের পর্যায়ে তুলে ধরা হয়। সে যুগে কেউ কেউ মনে করতেন, গবেষণার সাহায্যে সিরাজকে মার্শম্যানের আঁকা চিত্রের বিপরীতভাবেও দাঁড় করানো যেতে পারে।[৩২] কিন্তু বিদ্যাসাগর সিরাজকে যে অতি অপদার্থ জঘন্য-চরিত্রের ব্যক্তি মনে করতেন তা তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর 'বিজ্ঞাপন' থেকেই জানা যায়—"এই পুস্তকে, অতি দুরাচার নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি, চিরস্মরণীয় লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের অধিকারসমাপ্তবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।" অবশ্য অন্ধকূপ-হত্যার অপরাধ থেকে তিনি সিরাজকে মুক্তি দিয়েছেন, "কিন্তু তিনি পরদিন—প্রাতঃকাল পর্যন্ত, এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। সে রাত্রিতে সেনাপতি মাণিকচাঁদের হস্তে দুর্গের ভার অর্পিত ছিল; অতএব, তিনিই এই সমস্ত দোষের ভাগী।" সিরাজের নারীর প্রতি অত্যাচার ও ধনসম্পত্তির ওপর লোভ (পৃ. ২০৮),[৩৩] মূঢ়ের মতো ক্রোধোন্মত্ততা (পৃ. ১১৩), অব্যবস্থিতচিত্ততা (পৃ. ১১৯), দুর্দান্ত প্রকৃতি (পৃ. ১১৯), নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা (পৃ. ১১৯) প্রভৃতি দোষগুলি বর্ণনায় তিনি মার্শম্যানকেই অনুসরণ করেছেন। মার্শম্যান সিরাজকে "A Monster of Cruelty" বলেছেন; বিদ্যাসাগর বলেছেন "নৃশংস রাক্ষস।"[৩৪] অবশ্য দু-এক স্থলে তিনি মার্শম্যানের

---

৩২. বিহারীলাল সরকার--বিদ্যাসাগর (পৃ. ১৯৯)

৩৩. বন্ধনীর মধ্যে পৃষ্ঠাঙ্কগুলি এই গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।

৩৪. সিরাজের একমাত্র বিদেশী (ফরাসী) শুভানুধ্যায়ী জঁ ল'ও বলতে বাধ্য হয়েছেন, **"The character of Siraj-ud-daulah was reputed to be one of the worst ever known...Every one trembled at the name of Siraj-ud-daulah."** (স্যর যদুনাথ সরকার সম্পাদিত ***History of Bengal*** [**Vol. II, P. 469**] থেকে উদ্ধৃত)

মন্তব্যের সঙ্গে কিছু নিজ মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন। মার্শম্যান লিখেছেন, "There can be no doubt that Nanda Koomar was one of the most infamous characters among the natives." কিন্তু বিদ্যাসাগর এর সঙ্গে আর একটি পংক্তি যোগ করে দিয়েছিলেন, "নন্দকুমার দুরাচার ছিলেন যথার্থ বটে; কিন্তু, ইম্পি ও হেষ্টিংস তাঁহা অপেক্ষা অধিক দুরাচার, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

ইতিপূর্বে হিন্দী থেকে বাংলা অনুবাদে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদেও যে তিনি অসাধারণ কুশলী ছিলেন, এখানে মার্শম্যান ও তাঁর রচনা পাশাপাশি রেখে তার প্রমাণ দেওয়া যাচ্ছে:

> মার্শম্যান—"There was in the fort at this time a room, eighteen feet long by fourteen, with only one window at each end to admit air, in which turbulent soldiers used to be confined. Into this small chamber, the Mahomedans thurst all the European prisoners in the hottest month of the year...Gradually one after another sank down dead on the floor; and remainder, standing on this heap of bodies, had more room to breathe in; and thus a few survived." (১৮৫৬ সালের সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত)
>
> বিদ্যাসাগর—"তৎকালে দুর্গের মধ্যে, দৈর্ঘে বার হাত, প্রস্থে নয় হাত, এরূপ এক গৃহ ছিল। বায়ুসঞ্চারের নিমিত্ত, ঐ গৃহের এক এক দিকে এক একমাত্র গবাক্ষ থাকে। ইংরেজেরা কলহকারী দুর্বৃত্ত সৈনিকদিগকে ঐ গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। নবাবের সেনাপতি, দারুণ গ্রীষ্মকালে, সমস্ত য়ুরোপীয় বন্দীদিগের ঐ ক্ষুদ্র গৃহে নিক্ষিপ্ত করিলেন...এক এক জন করিয়া ক্রমে ক্রমে, অনেকে পঞ্চত্ব পাইয়া ভূতলশায়ী হইল। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা শবরাশির উপর দাঁড়াইয়া, নিশ্বাস

আকর্ষণের অনেক স্থান পাইল, এবং তাহাতেই কয়েকজন জীবিত থাকিল।" (বি. রচনাবলীর ১০৯-১১০ পৃষ্ঠা)

এ অনুবাদ মূলানুগ, অথচ মৌলিক রচনার লক্ষণযুক্ত। ইংরেজী থেকে অনুবাদে তিনি কতটা পারঙ্গম ছিলেন, তা তাঁর 'ভ্রান্তিবিলাস' পড়লেই বোঝা যাবে। অথচ তিনি ভালো করে ইংরেজী শেখার প্রথম প্রয়োজন বোধ করেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণের পর। সেকালে গোড়ার দিকে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শেখাবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এদিকে সংস্কৃত কলেজের দেবভাষানুরাগী ছাত্রগণও বাস্তব জগতে চলবার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে লাগল। ১৮২৭ সালে এই ছাত্রেরা সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ লাভ করল। অবশ্য ইংরেজী ভাষাশিক্ষা প্রবর্তিত হলেও এ-ভাষা তখনও অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয় হয় নি। ব্যাকরণশ্রেণী থেকে ছাত্রগণ ইচ্ছা করলে ইংরেজী শ্রেণীতে ইংরেজী শিক্ষার জন্য যোগ দিতে পারত। বিদ্যাসাগর ১৮৩০ সালে ব্যাকরণের মুগ্ধবোধ শ্রেণীতে পড়তে পড়তে ইংরেজী ক্লাসে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৩৩-৩৪ খ্রীস্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজীর পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্ররূপে তিনি পারিতোষিক পেয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের কালে তিনি মোটামুটি ইংরেজী জ্ঞান সংগ্রহ করেছিলেন, এবং সেই বয়সেই তিনি "বহুল পরিমাণে ইংরাজী ভাব ও ইংরাজী চিন্তার সংস্পর্শে" (চণ্ডীচরণ – পৃ. ৬৯) আসেন। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে উক্ত কলেজের ছাত্রেরা পুনরায় ইংরেজী চালু করার জন্য সেক্রেটারী জি.টি. মার্শেলের নিকট আবেদন করেন, স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার নামও ছিল। সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজী তুলে দেওয়া হলেও মাদ্রাসা থেকে কিন্তু ইংরেজী লুপ্ত হয় নি, বরং তার উন্নতিই হচ্ছিল। এইজন্য সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা সেক্রেটারীর নিকট এই মর্মে আবেদন করেন : "অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে, অনুগ্রহপূর্ব্বক রীত্যনুসারে আমারদিগের ইংরাজিভাষা-

ভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয় তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য্য ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া লৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ হইতে পারি।” এর ফলে ১৮৪১ সালে সংস্কৃত কলেজে আবার ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়; কিন্তু এবারেও এ বিভাগের বিশেষ উন্নতি হয় নি। অতঃপর উত্তর-কালে স্বয়ং বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে (১৮৫১) ইংরেজী শিক্ষার অধিকতর সুষ্ঠ ব্যবস্থা করেন—১৮৫৩ সাল থেকে রীতিমতো এবং নিয়মানুগভাবে ইংরেজী শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। এর পূর্বে তিনি নিজের চেষ্টায় ইংরেজী ভাষায় মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করে-ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারের পদে যোগ দিয়ে প্রয়োজনের অনুরোধে তিনি ইংরেজী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে সরে গেলে (১৮৫০) শিক্ষাপরিষদ বঙ্গীয় সরকারকে সেই পদে বিদ্যা-সাগরকে নিযুক্ত করতে সুপারিশ করলেন এবং তিনি যে ইংরেজী ভাষায় বিজ্ঞ একথাও তাঁরা জানালেন, “একদিকে তিনি ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্যদিকে সংস্কৃতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত।”[৩৫]
যাই হোক বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতা কার্যে যোগ দিয়ে ইংরেজী শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতির জনকস্থানীয় সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ গুপ্ত, আনন্দকৃষ্ণ বসু, অমৃতলাল মিত্র এবং শ্রীনাথ ঘোষের কাছে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকেরা কেউ তাঁর ছাত্রস্থানীয় কেউ-বা বন্ধু। ইংরেজী ভাষায় তিনি কতটা অভিজ্ঞ হয়েছিলেন, তার নানা প্রমাণ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে

৩৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে’ (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা) এই সুপারিশপত্রের অনুবাদ উদ্ধৃত হয়েছে। পৃ. ২৮

আছে। ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদেও তিনি বাংলা ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। একবার অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদ পড়ে তিনি বলেছিলেন, "লেখা বেশ বটে; কিন্তু অনুবাদের স্থানে স্থানে ইংরেজী ভাব আছে।"[৩৬] এরপর তিনি অক্ষয়কুমারের বাংলা অনুবাদের ইংরেজী ভাব সংশোধন করে দিতেন। তিনি শেক্স্‌পীয়রের নাটক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পড়েছিলেন। শোভাবাজারের আনন্দকৃষ্ণ বসুর কাছে তিনি প্রত্যহ রাত্রিতে শেক্সপীয়র পড়তে যেতেন।[৩৭] সুতরাং 'বাঙ্গালার ইতিহাস' যে একখানি সুললিত অনুবাদগ্রন্থ হবে তাতে আর সন্দেহ কি? তবু এ গ্রন্থ স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ, কোন মৌলিক রচনা নয়। এবং মৌলিক রচনা নয় বলে, তিনি মার্শম্যানের মূল গ্রন্থকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছিলেন —অবশ্য কোন কোন উপাদান তিনি অন্য স্থান থেকেও নিয়েছিলেন। উপরন্তু এটি পাঠ্যপুস্তক বলে ইতিহাস সম্পর্কে কোন বিতর্ক ব্যাপারের অবতারণা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। বিস্তারিত আকারে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করবেন বলে বিদ্যাসাগর অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। দুঃখের বিষয় নানা কারণে, শারীরিক অসুস্থতার জন্যই, এ-কার্যে তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন নি। যদি তিনি এই বিপুল পরিশ্রমসাধ্য কর্মে সফল হতেন তা হলে বাঙালীর লেখা একখানি মৌলিক ইতিহাস-গ্রন্থ বাঙালীর গৌরব বৃদ্ধি করত, বাংলার ইতিহাস-সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হত।

৩৬. বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর, পৃ. ১২৪

৩৭. বিহারীলালের উক্ত গ্রন্থ (পৃ. ১২৩) দ্রষ্টব্য। ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করা যে কঠিন সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলেছেন, "বাঙ্গালায় ইংরেজীর অবিকল অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম; ভাষাদ্বয়ের রীতি ও রচনা পরস্পর নিতান্ত বিপরীত; এই নিমিত্ত অনুবাদক অত্যন্ত সাবধান ও যত্নবান হইলেও অনুবাদগ্রন্থে রীতিবৈলক্ষণ্য, অর্থপ্রতীতির ব্যতিক্রম ও মূলার্থের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে।" ('জীবনচরিত'-এর বিজ্ঞাপন)

৫.

কালিদাসের প্রতি বিদ্যাসাগরের কী পরিমাণ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক পুস্তিকায় কালিদাসের গ্রন্থালোচনায় দেখা যাবে। সেই শ্রদ্ধা-ভক্তির আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁর সম্পাদিত কালিদাসের কয়েকখানি গ্রন্থের সংবাদ নিলে। ১৮৫৩ সালের জুন মাসে তাঁর সম্পাদিত 'রঘুবংশম্' প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর কাহিনীর অনুবাদ—'শকুন্তলা'।[৩৮] এর পর তাঁর সম্পাদনায় ১৮৬১ সালে 'কুমারসম্ভবম্', ১৮৬৯ সালে 'মেঘদূতম' এবং ১৮৭১ সালে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর ভূমিকাযুক্ত সুসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হলে বাঙালী পাঠক কালিদাসের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। বিদ্যাসাগরের মতে কালিদাস শুধু ভারতবর্ষের নন, বিশ্বেরও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। তিনি বিশ্বাস করতেন, "মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা (শকুন্তলা) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না।" বস্তুতঃ তাঁর মতে কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল' "অলৌকিক পদার্থ" (ঐ. পৃ. ৩৬)। তিনি বাল্মীকির দোষ নির্দেশ করতেও কুণ্ঠিত হন নি,[৩৯] কিন্তু কালিদাসকে তিনি "অদ্বিতীয় কবি" বলেছেন।[৪০] শকুন্তলার প্রথম ইংরেজী অনুবাদক এশিয়াটি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম জোন্স কালিদাসকে শেক্স্পীয়রের তুল্য মনে করতেন। গ্যয়ঠের স্তুতিবাদ আমরা অন্যত্র উল্লেখ করেছি।

---

৩৮. বেঙ্গল লাইব্রেরীর তারিখ অনুসারে এ গ্রন্থ ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে সংবৎ ১৯১১ আছে—দু'তারিখের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু বিহারীলাল সরকার ভ্রমক্রমে ১৮৪৪ খ্রীঃ অঃ (৯ই ডিসেম্বর) বা ১২৪৭ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ বলেছেন। (বিহারীলালের 'বিদ্যাসাগর', ৪র্থ সং, পৃ. ২৭৪)

৩৯. "বাল্মীকি কাব্যে পৌনরুক্ত, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অতিবিস্তৃত বর্ণনা প্রভৃতি কতিপয় গুরুতর দোষ আছে।" (ঋজুপাঠ. ২য় ভাগ)

৪০. ঋজুপাঠ, ৩য় ভাগ।

অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে ইংরেজী সাহিত্যের প্লাবনের যুগে শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে শেক্স্‌পীয়রের গ্রন্থাবলী বিরাজ করত।[৪১] কিন্তু কালিদাস সম্বন্ধে ইংরেজী শিক্ষিতসমাজে সর্বত্র উচ্চ প্রশংসা প্রচলিত ছিল না। হেমচন্দ্র তো শেক্স্‌পীয়রের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে বলেছেন, "ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি"—অর্থাৎ কালিদাস শুধু ভারতবর্ষের কবি, কিন্তু শেক্স্‌পীয়র হলেন বিশ্বের কবি। এ বিষয়ে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সাক্ষ্য গৃহীত হতে পারে, "একদিন কালিদাস ও শেক্স্‌পীয়র সম্বন্ধে তাঁহার (বিদ্যাসাগর) সহিত আলাপ করিতেছিলাম। বিদ্যাসাগর কালিদাসের এমন একান্ত ভক্ত ছিলেন যে, কালিদাস যে কাহারও অপেক্ষা হীন একথা একেবারেই স্বীকার করিতে চাহিতেন না। আমি হেমবাবুর 'ভারতের কালিদাস জগতের তুমি' একথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তিনি রাগিয়া উঠিলেন ও

৪১. বঙ্কিমচন্দ্র "শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা" প্রবন্ধে ('বিবিধ-প্রবন্ধ'—১ম) বলেছেন, "আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা-ফার্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত করি, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্স্‌পীয়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন।" অমরনাথও শচীন্দ্রের ('রজনী', ৩য় পরিচ্ছেদ) পড়ার টেবিলে 'সেক্স্‌পীয়র গ্যালেরি' খানা টেনে নিয়ে ছবিগুলির ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও শেক্স্‌পীয়রের ভক্ত ছিলেন। শোভাবাজারের আনন্দকৃষ্ণের নিকট তিনি মনোযোগ দিয়ে শেক্স্‌পীয়র পড়েছিলেন এবং অতিশীঘ্র শেক্স্‌পীয়রের রসের মধ্যে অগাধ প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন (বিহারীলাল সরকারের, 'বিদ্যাসাগর'—পৃ. ১২২-১২৩)। তাঁর শেক্স্‌পীয়র প্রীতির শ্রেষ্ঠ চিহ্ন *Comedy of Errors* অবলম্বনে লেখা 'ভ্রান্তিবিলাস'। কেউ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করলে তাকে বিদ্যাসাগর প্রায়ই শেক্স্‌পীয়রের গ্রন্থাবলী উপহার দিতেন। মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে এক সেট শেক্স্‌পীয়র গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন। বাংলার প্রথম মহিলা এম. এ. চন্দ্রমুখী বসুকেও তিনি শেক্স্‌পীয়র গ্রন্থাবলী উপহার দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন।

বলিলেন, "হেমবাবুর একথা বলিবার অধিকার নাই। সে ত সংস্কৃত জানে না" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', নতুন সংস্করণ, ১৩৭৩, পৃ. ২৯)[৪২]। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র শেক্স্‌পীয়র ও কালিদাসের তুলনায় শেক্স্‌পীয়রের ওপর অধিকতর গৌরব আরোপ করেছিলেন।[৪৩] তাঁর কিছু পরে রবীন্দ্রনাথ আবার বিপরীত দিক থেকে বিচার শুরু করে কালিদাসকে বিদ্যাসাগরের মতোই সর্বোচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেন ('প্রাচীন সাহিত্য'—"শকুন্তলা" প্রবন্ধ) এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মিরান্দা ও শকুন্তলা-সংক্রান্ত মতামতের পরোক্ষ প্রতিবাদ করে শকুন্তলা চরিত্রের অধিকতর প্রশংসা করেন।[৪৪] বিদ্যাসাগর শেক্স্‌পীয়রের গৌরব সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না, কিন্তু কালিদাসের সমগ্র নাট্যকাব্য বিচার করে তাঁকে তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সারস্বত সাধক বলে স্থির করেছিলেন। এ সমস্ত মতামতের

৪২. একথা ঠিক। স্বয়ং হেমচন্দ্র সে কথা স্বীকার করে 'বৃত্রসংহার'-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন, "বাল্যাবধি আমি ইংরেজি ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি।" "ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি" তাঁর 'নলিনী-বসন্ত'-এর (টেম্পেস্ট্) আখ্যাপত্রে সংযোজিত হয়েছিল।

৪৩. 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলার চরিত্রকে দেস্‌দিমোনা-মিরন্দার তুলনায় অপকৃষ্ট বলেছেন। 'ওথেলো' এবং 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর তুলনামূলক আলোচনায় তিনি একই মনোভাবের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, "শেকস্‌পীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকানন তুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না।"

৪৪. উভয়ের সরলতার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র মিরান্দাকে অধিকতর সরল এবং শকুন্তলাকে কিঞ্চিৎ coquettish বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে বলেন, "বস্তুত: শকুন্তলার সরলতা স্বভাবগত এবং মিরান্দার সরলতা বহির্ঘটনাগত। · শকুন্তলা মিরান্দার মতো স্বতন্ত্র নহে, শকুন্তলা তাহার চতুর্দিকের সহিত একান্তভাবে বিজড়িত।" দু' নাটকের তুলনামূলক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রশংসার পাল্লা শকুন্তলার দিকেই ঝুঁকেছে. "টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি। টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি। টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতার অবসান।" ('প্রাচীন সাহিত্য')

যুক্তিযুক্ততার মধ্যে প্রবেশ না করে এটুকু নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে যাঁরা কালিদাসকে জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধার্হ আসনে বসিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর অগ্রগণ্য। সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি ছিলেন শ্রুতকীর্তি। পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি অজ্ঞ ছিলেন না। সুতরাং কালিদাস-সম্পর্কিত তাঁর মতামত সে যুগের শিক্ষিত সমাজে বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই গৃহীত হয়েছিল।

কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকের আখ্যানভাগকে বাংলা গদ্যে রূপান্তরিত করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্কোচের সীমা ছিল না। কারণ তাঁর ধারণা, কালিদাসের এই অমর নাটককে দুর্বল প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশ করতে যাওয়া দুঃসাহসিক কর্ম। তাই তিনি তাঁর 'শকুন্তলা' আখ্যানের ভূমিকায় ('বিজ্ঞাপন') বিনীতভাবে বলেছেন, "বস্তুতঃ বাঙ্গালায় এই উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া, আমি কালিদাসের ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের অবমাননা করিয়াছি। পাঠকবর্গ! বিনীত বচনে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা যেন, এই শকুন্তলা দেখিয়া, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন।" কিন্তু তাঁর অনূদিত শকুন্তলার আখ্যান পড়ে সে যুগের পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, এটি বিদ্যাসাগরের বিনয় মাত্র। তাঁর অনুবাদে কালিদাসের অবমাননা হয় নি। (অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে তিনি কালিদাসের নাটকের কাহিনীর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন) এ বিষয়ে তিনি হয়তো কিঞ্চিৎ-পরিমাণে ল্যাম্ব্ ভ্রাতা-ভগিনীর রচিত *Tales from Shakespeare*-এর (১৮০৭) দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। ল্যাম্বেরা ভাই-বোনে শেক্স্পীয়রের নাটকের গদ্য-আখ্যানে রূপ দিয়েছিলেন এবং মূলের রস যথাসম্ভব বজায় রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব এর চেয়ে কিছুমাত্র ন্যূন নয়। অবশ্য বিনয় প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, "যাঁহারা অভিজ্ঞান শকুন্তলা পাঠ করিয়াছেন, এবং এই উপাখ্যান পাঠ করিবেন, চমৎকারিত্ব বিষয়ে উভয়ের কত অন্তর, তাঁহারা অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন; এবং সংস্কৃতাভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট

কালিদাস ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের এইরূপ পরিচয় দিলাম বলিয়া, মনে মনে, কতশত বার, আমায় তিরস্কার করিবেন" ('শকুন্তলার' বিজ্ঞাপন)। কিন্তু একথা স্বীকারে বাধা নেই যে, সে যুগে বহু পাঠক তাঁর 'শকুন্তলা' পড়েই কালিদাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন, যাঁরা 'সংস্কৃতাভিজ্ঞ' ছিলেন, তাঁরাও বিদ্যাসাগরের আখ্যান পড়ে মূল নাটককে আরও সুচারুভাবে বুঝতে পারতেন।[৪৫] বস্তুতঃ শকুন্তলার দ্বারাই তিনি পাঠকমহলে যথার্থ গদ্যশিল্পী বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন—যদিও 'শকুন্তলা'র আগেই তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল ('বেতাল পঞ্চবিংশতি' —১৮৪৭, 'বাঙ্গালার ইতিহাস'—১৮৪৮, 'জীবনচরিত'—১৮৪৯, 'বোধোদয়'—১৮৫১, 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব'—১৮৫৩)। (কিন্তু যথার্থ সাহিত্যরস ও লিপিকৌশল সর্বপ্রথম 'শকুন্তলা'য় প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর এক জীবনীকার যথার্থ বলেছেন, "শকুন্তলার সমাগমে বাঙ্গালা সাহিত্য এক অপূর্ব নূতন শ্রী ধারণ করিল। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কিশোরীর বাল্যলীলায় যৌবনের নবোদ্গম দেখা দিল) শকুন্তলায় তাঁহার লিপিচাতুর্য, রচনামাধুর্য ও পদলালিত্য দর্শনে পাঠক মাত্রেই মোহিত হইয়া গেলেন এবং চারিদিকে তাঁহার প্রশংসা বিস্তৃত হইয়া পড়িল।"[৪৬]

এখন দেখা যাক, বিদ্যাসাগর কোন্ রীতিতে মূল নাটককে বাংলা কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছেন। নাটকের আখ্যানভাগকে গদ্যে বিবৃত করে তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং সাত অঙ্কে বিভক্ত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর ঘটনাসন্নিবেশকে সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন।

---

৫. "এ অনুবাদের তুলনা নাই। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সংস্কৃত যেমন মধুর, এই কুন্তলার বাঙ্গালা তেমনই মধুর। এককথায় বলি, অভিজ্ঞান শকুন্তলা পড়িয়া াহা বুঝি নাই, ইহাতে তাহা বুঝিয়াছি।"—বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃ. ২৭৫)

৬. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর (১৮৯৫), পৃ. ১৬৯

সংলাপ এবং ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রবহমান নাটকীয় কাহিনীকে গদ্য-বিবৃতির দ্বারা উপস্থাপিত করতে হলে বহু স্থলে স্বয়ং লেখককে প্রযোজকের ভূমিকা নিতে হয়। বিদ্যাসাগর অনেক স্থলে মূল সংলাপের অনেকটা বজায় রাখলেও বিবৃতির ধরনেই কাহিনীর ধারা অনুসরণ করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক অঙ্কের ঘটনাকে প্রত্যেক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করাতে গদ্যকাহিনীতেও নাটকীয় সংবেগ অনেকটা রক্ষিত হয়েছে, এবং চরিত্রের বিকাশ ও রূপান্তর নাটকীয় হতে পেরেছে। অবশ্য মূল নাটককে বিদ্যাসাগর হুবহু নাটকীয় কাহিনীর আকারে পরিবেশন করেন নি। নাটকে যে কাহিনী শোভা পায়, অনেক সময়ে গদ্য-কাহিনীতে তার যৌক্তিকতা থাকে না। যেমন—মূল নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার ও নটীর সংলাপ ও বর্ণনা বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। তিনি ঘটনাগ্রন্থনেও নাটকের কোন কোন বর্ণনাকে বাদ দিয়েছেন, বা সংক্ষেপে সেরেছেন। যেখানে আদিরসে বর্ণনা ছিল, সেখানে তিনি সেগুলিকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করেছেন। কারণ 'শকুন্তলা' ছাত্রদের পাঠ্যগ্রন্থ হবে, এই ছিল তাঁর অভিলাষ।

প্রথম অঙ্কে শকুন্তলা অনসূয়াকে নিজের বক্ষবন্ধন শিথিল করে দিতে অনুরোধ করলে প্রিয়ংবদা ঈষৎ ব্যঙ্গচ্ছলেই বলল, "এত্থ পঞ্জর-বিত্থার-ইত্তঅং অত্তণো জোব্বণং ঔবালহ" (নিজের যে-যৌবন পয়োধরযুগলকে স্ফীত করে তুলছে তাকেই নিন্দে কর)। বিদ্যাসাগর এ আদিরসের পংক্তি একেবারে বাদ দিয়েছেন। অন্তরাল থেকে নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা শকুন্তলাকে দেখে দুষ্মন্ত যে-সমস্ত আদিরসের শ্লোক আওড়েছিলেন, বিদ্যাসাগর অনুবাদের সময় তারও অনেকটা কেটেছেঁটে দিয়েছেন। তৃতীয় অঙ্কের শেষাংশে যেখানে সখীদ্বয় রাজা ও শকুন্তলাকে নির্জন লতাবিতানে একাকী রেখে চলে গেল, সেখানে কালিদাস নায়ক-নায়িকার প্রথম সমাগম বর্ণনা করতে গিয়ে যথেষ্ট সংযম রক্ষা করলেও আদিরসের আয়োজনকে নিতান্ত খাটো করতে পারেন নি। নির্জন লতাবিতানে উন্মত্ত দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে আলিঙ্গনাদি করতে চাইলে

সঙ্কুচিতা শকুন্তলা তাতে ঘোরতর অনিচ্ছা জানালেন এবং চলে যেতে চাইলেন। রাজা বললেন ঃ

অপরিক্ষতকোমলস্য যাবৎ কুসুমস্যেব নবস্য ষট্পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য ॥

তৃষার্ত ভ্রমর অপরিক্ষত (অচুম্বিত) কোমল নবপ্রস্ফুটিত কুসুমের মকরন্দের দ্বারা তৃষ্ণা মেটায়। ঠিক তেমনি, হে সুন্দরী, তোমার ঐ অক্ষত নবাধরের আস্বাদে যখন আমার তৃপ্তি হবে, তখন তোমাকে ছেড়ে দেব। এই বলে রাজা "মুখমস্যাঃ সমুন্নময়িতুমিচ্ছতি, শকুন্তলা নাট্যেন পরিহরতি।" রাজা শকুন্তলার মুখ উঁচু করে চুম্বনের চেষ্টা করলেন, কিন্তু শকুন্তলা তাতে বাধা দিলেন। এই অংশের অনুবাদ বিদ্যাসাগর এইভাবে করেছেন ঃ

"অনন্তর, রাজা, শকুন্তলার চিবুকে হস্ত প্রদান করিয়া, তাহার মুখকমল উত্তোলিত করিলেন। শকুন্তলা, শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া, রাজাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। (বি. র. ২. পৃ. ৭৪)

চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে সুপ্তোত্থিত শিষ্যের স্বগতোক্তি এবং অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কালিদাস কাহিনীর গতি যে-ভাবে বর্ণনা করেছেন, বিদ্যাসাগর সেখানে ঘটনাকে অতিশয় সংক্ষেপে সেরেছেন—শুধু ঘটনাটিকেই বিবৃত করেছেন। পতিগৃহে যাত্রার পূর্বে শকুন্তলাকে আশ্রম-তরুরাও অনেক মূল্যবান অলঙ্কার-আভরণ দিল—এ অলৌকিক বর্ণনা বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন, শুধু সংক্ষেপে বলেছেন, "অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, যথাসম্ভব, বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন" (ঐ, পৃ. ৭৮)। অলৌকিকতার প্রতি তাঁর যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল না—এ থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে।[৪৭] অবশ্য অলৌকিকতা যেখানে মূল কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য, সেখানে তিনি তা স্বীকার করে

৪৭. দৈবপ্রভাবে তরুগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত অলঙ্কারের অলৌকিক কাহিনী বিদ্যাসাগর বর্জন করেছিলেন বলে তাঁর জীবনীকার রক্ষণশীল মতাবলম্বী বিহারীলাল সরকার বলেছেন, "শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তপুরে যাইবার উদ্যোগ করেন, তখন

নিয়েছেন। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরে এসে দৈববাণীর দ্বারাই দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বৃত্তান্ত জানতে পারেন। এখানে দৈববাণীর সহায়তা অপরিহার্য, কাজেই বিদ্যাসাগর তা যথাযথ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শকুন্তলার পতিগৃহে যাবার (চতুর্থ অঙ্ক) সময় আকাশবাণীর কল্যাণ দান অপ্রাসঙ্গিক বোধে বিদ্যাসাগর তা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন। পঞ্চম অঙ্কের শেষে পুরোহিত প্রবেশ করে রাজাকে বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনা জানালেন—শকুন্তলা কণ্ব-শিষ্যদ্বয়ের দ্বারা পরিত্যক্তা হয়ে বিলাপ করতে লাগলে "স্ত্রীসংস্থানং চাপ্সরস্তীর্থমারাদ্ উৎক্ষিপ্যৈনাং জ্যোতিরেকং জগাম।" স্ত্রীলোকের মতো আকৃতিবিশিষ্ট জ্যোতি শকুন্তলাকে অপ্সরতীর্থের দিকে নিয়ে গেল। রাজা বিস্মিত হলেও উদাসীনভাবে বললেন, "প্রাগপি সোঽস্মাভিরর্থঃ প্রত্যাদিষ্ট এব। কিং বৃথা তর্কেণান্বিষ্যতে।" আর ও বিষয়ের অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি? পূর্বেই তো আমি উপেক্ষা করেছি। বিদ্যাসাগর এইভাবে এর অনুবাদ করেছেন:

> "পুরোহিত সহসা, রাজসমীপে আসিয়া, বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে, আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! বড় এক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল। সেই স্ত্রীলোক, আমার সঙ্গে যাইতে যাইতে, অপ্সরাতীর্থের নিকট, আপন অদৃষ্টের দোষকীর্তন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল, অমনি এক, জ্যোতিঃপদার্থ স্ত্রীবেশে সহসা আবির্ভূত হইয়া,

তাঁহাকে সজ্জিত করিবার জন্য, কবি কালিদাস দেব-প্রদত্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দুসন্তানের ইহা আক্ষেপের বিষয় নহে কি?" ('বিদ্যাসাগর', পৃ. ২৭৬) বিশেষ করে শুধু হিন্দুসন্তানের জন্য ভাববার লোক বিদ্যাসাগর ছিলেন না। কঠোর বাস্তববাদী ও মানবতন্ত্রে দীক্ষিত বিদ্যাসাগর হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি কিছু উদাসীন ছিলেন। "ব্রাহ্মণ্যমহিমা বা ঋষিশক্তি বুঝাইবার জন্য" কালিদাস এই ব্যাপারের পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রয়োজনস্থলে যথাসাধ্য অলৌকিক ব্যাপার বর্জন করতে সঙ্কুচিত হতেন না, এর থেকে তাই মনে হচ্ছে।

তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল। রাজা কহিলেন, মহাশয়! যাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, সে বিষয়ের আলোচনায় আর প্রয়োজন নাই।" (বি. র. ২য়. পৃ. ৮৮)

এই অংশ স্বীকার না করলে শকুন্তলার কাহিনী পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে পারে না, কাজেই এই অলৌকিক ব্যাপার বিদ্যাসাগর বাদ দিতে পারেন নি। কিন্তু ষষ্ঠ অঙ্কের দুটি প্রধান অলৌকিক ব্যাপার তিনি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। আকাশযানে অদৃশ্যভাবে উপস্থিত সানুমতী অপ্সরার চরিত্র ও সংলাপ তিনি 'শকুন্তলা'র ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে একেবারে বর্জন করেছেন। আর এক স্থানে আছে, ছদ্মবেশী মাতলি বিদূষককে ধরে পীড়ন করতে লাগল, এবং বিদূষকের আর্তনাদে রাজা ব্যক্তিগত শোক ও অনুতাপ পরিত্যাগ করে অততায়ীর সঙ্গে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হলেন। বিদ্যাসাগর এই আকস্মিক ও অতিনাটকীয় ঘটনাও বাদ দিয়েছেন, শুধু সিদ্ধান্তটুকু এইভাবে জানিয়েছেন, "এই আদেশ দিয়া, প্রতিহারীকে বিদায় করিয়া, রাজা মাধব্যের সহিত, পুনরায়, শকুন্তলা-সংক্রান্ত কথোপকথনের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্র-সারথি মাতলি, দেবরথ লইয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন" (বি, র, ২য়, পৃ. ৯৩)।

দুষ্মন্ত যখন (৭ম অঙ্ক) নিজ পুত্র ভরতকে আলিঙ্গন করলেন, তখন তিনিই যে সে বালকের পিতা, এইটি ইঙ্গিতে বোঝাবার জন্য কালিদাস বালকের হাতে-বাঁধা রাখীর উল্লেখ করেছেন। এ রাখী হাত থেকে খুলে পড়লে, বাপ-মা ছাড়া আর যে-কেউ সে রাখী ছোঁবে তাকেই ঐ রাখী সাপ হয়ে দংশন করবে। কিন্তু ভরতের হাত থেকে রাখী পড়ে গেলে এবং দুষ্মন্ত ছুঁলেও রাখীর কোন পরিবর্তন হল না। এতে দুষ্মন্ত ও তাপসীরা বুঝতে পারলেন, এ বালক দুষ্মন্তেরই আত্মজ। এই নাটকীয় অলৌকিক কৌশল বিদ্যাসাগর অপ্রয়োজনীয় মনে করে পরিত্যাগ করেছেন।

নাটককে কাহিনীর আকারে রূপায়িত করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে কোন কোন স্থলে মূল নাটকের অনেক কবিত্বময় অংশ পরিত্যাগ

করতে হয়েছে। আক্ষরিক অথচ সাহিত্যরসসমৃদ্ধ অনুবাদ হিসেবে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি অপূর্ব হয়েছে :

মূল—ভোঃ ভোঃ সন্নিহিতাস্তপোবনতরব—
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু
যা নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতি-সময়ে যস্যাঃ ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥ (৪র্থ অঙ্ক)

অনুবাদ—''এই বলিয়া তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি, তোমাদের জল সেচন না করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন না; যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ, কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না; অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন। তোমরা সকলে অনুমোদন কর।"

(বি. র. ২য়. পৃ. ৭৮)

আর একটি দৃষ্টান্ত.

মূল—আলক্ষ্য-দন্ত-মুকুলাননিমিত্ত—
হাসৈরব্যক্ত-বর্ণ-রমণীয়-বচঃপ্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়-প্রণয়িনস্তনয়ান বহন্তো
ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি॥ (৭ম অঙ্ক)

অনুবাদ—"আহা! যাহার এই পুত্র, সে ইহারে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখচুম্বন করে; হাস্য করিলে, যখন ইহার মুখমধ্যে, অর্ধ-বিনির্গত কুন্দসন্নিভ দন্তগুলি অবলোকন করে; যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান ব্যক্তি কি অনির্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়।"

(বি. র. ২য়. পৃ. ৯৬)

এখানে অনুবাদ অনেকটা ভাবানুবাদ ধরনের হয়েছে, কিন্তু মূল ছেড়ে বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। বিদ্যাসাগর অনুবাদের বহুস্থলে মূলের ভাষা ও রস বজায় রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। প্রয়োজনস্থলে আলঙ্কারিক শব্দপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত হন নি।

শকুন্তলার অনুবাদ প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করে আমরা এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব। মূল নাটকের স্ত্রী, বিদূষক, রাজশ্যালক, রক্ষিদ্বয় এবং ধীবরের প্রাকৃত বাক্যের অনুবাদের সময়ে বিদ্যাসাগর যথাসম্ভব চলতি ও হালকা শব্দ ব্যবহার করেছেন। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

মূল নাটক—
গোতমী—(শকুন্তলামুপেত্য) জাদে অবি লহুসন্তাবাই দে অঙ্গাই।
শকুন্তলা—অত্থি মে বিসেসো।
গোতমী—ইমিণা দব্ভোদএণ নিরাবাহং এব্ব দে শরীরং হোহিই।
অনুবাদ "বাছা! শুনিলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল; এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন, হাঁ পিসি! আজ বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি। তখন গৌতমী, কমণ্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া, শকুন্তলার সর্বশরীরে সেচন করিয়া কহিলেন, বাছা! সুস্থ শরীরে চির-জীবিনী হয়ে থাক।" (বি. র. ২য়, পৃ. ৭৫)

মূল নাটকের রক্ষী, নগরপাল ও ধীবরের সংলাপ মাগধী প্রাকৃতে রচিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই সমস্ত সাধারণ লোকের সংলাপের ঢংটা সাধুভাষায় রাখলেও ভঙ্গিমাটি চলতি ভাষার অনুরূপ করেছেন। যথা :

মূল নাটক—
রক্ষিণৌ—(তাড়য়িত্বা) অলে কুম্ভিলআ কহেহি, কহিং তুএ এশে মণিবন্ধণুক্কিন্ন-নামহেএ লাঅকীএ অঙ্গুলীঅএ শমাশাদিএ।
পুরুষঃ—(ভীতি-নাটিতকেন) পশীদন্তু ভাবমিশ্শে। অহকে ন এরিশ-কম্মকালী।
প্রথমঃ—কিং কখু শোহণে বম্হণে ত্তি কলিঅ লগ্না পড়িগ্গহে দিগ্নে।
পুরুষঃ—শুণহ দাণিং অহকে শক্কাবদালব্ভন্তলবাশী ধীবলে।
দ্বিতীয়ঃ—পাডচ্চলা, কি অম্হেহিং জাদী পুচ্ছিদে। (৬ষ্ঠ অঙ্ক)
অনুবাদ—"নগরপাল আসিয়া ধীবরকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিল, এবং জিজ্ঞাসিল, অরে বেটা চোর! তুই এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি

বল্? ধীবর কহিল, মহাশয়! আমি চোর নহি। তখন নগরপাল কহিল, তুই বেটা যদি চোর নহিস, এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া পাইলি? যদি চুরি করিস নাই, রাজা কি, সুব্রাহ্মণ দেখিয়া, তোরে দান করিয়াছেন? এই বলিয়া নগরপাল চৌকীদারকে হুকুম দিলে চৌকিদার ধীবরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ধীবর কহিল, অরে চৌকিদার! আমি চোর নহি। আমায় মার কেন, আমি কেমন করিয়া, এই আঙটি পাইলাম, বলিতেছি। এই বলিয়া সে কহিল, আমি ধীবরজাতি। মাছ ধরিয়া, বিক্রয় করিয়া, জীবিকা নির্বাহ করি। নগরপাল, শুনিয়া, কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল, মর্ বেটা, অমি তোর জাতিকুল জিজ্ঞাসিতেছি নাকি?" (বি. র. ২য়. পৃ. ৮৮-৮৯)

কিছু কিছু বাগ্‌ভঙ্গিতেও বিদ্যাসাগর মূলের অনুরূপ তীক্ষ্ণ এবং লঘুরীতি ব্যবহার করেছেন। যেমন, বিদূষকের রসিকতাপূর্ণ উক্তি, "এসা দাণিং অনুউল্লাদে অত্তখণা"—এর বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদ—"মন্দ কি, এ তোমার অনুকূল গলহস্ত।" আরও কিছু দৃষ্টান্ত:

১. বিদূষক—তিসঙ্কু বিঅ অন্তরালে চিট্‌ঠ।
   অনু:—কেন, ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যস্থলে থাক।
২. সখ্যৌ—সিণেহো পাবসঙ্কী।
   অনু:—স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া থাকে।
৩. দ্বিতীয়া তাপসী—এবা কৃখু কেসরিণী তুমং লঙ্ঘেই জই সে পুত্তঅং ণ মুঞ্চেসি।
   অনু:—আর যদি তুমি উহারে ছাড়িয়া না দাও, সিংহী তোমারে জব্দ করিবেক।

যাই হোক এখানে সংক্ষেপে মূলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অনুবাদের তুলনা দিয়ে দেখা গেল, এ রকম সুললিত গদ্য রচনা তাঁর আগে আদৌ চোখে পড়ে না। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য খুব যুক্তিসঙ্গত:

"এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা

সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।"—বঙ্কিমরচনাবলী, বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ ; বিবিধখণ্ড, পৃ. ১৪২

এর পর বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস'-এর ভাষায় কিছু গুরুভার বাক্-রীতি ব্যবহার করেছিলেন ; কিন্তু 'শকুন্তলা'র ভাষা আখ্যানের আদর্শ-ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এর বেশ কিছুকাল পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রকাশিত হয়েছিল। এ উপন্যাসের কাহিনীর রস অদ্ভুত ও চিত্তাকর্ষী হলেও এর ভাষার কোথাও কোথাও জড়ত্ব রয়ে গেছে। সেদিক থেকে 'শকুন্তলা'র গদ্য প্রায় অননুকরণীয় হয়েছে, এবং পরবর্তী কালের ভাষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। 'শকুন্তলা'র কয়েক বছর পূর্বে তিনি 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) লিখেছিলেন। তার ভাষার তুলনায় 'শকুন্তলা'র ভাষা যেমন স্বচ্ছন্দ হয়েছে, তেমনই মূলানুগ হয়েও সরস ও স্বাধীন ধরনের রচনার রূপ ধরেছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেও পাঠকসমাজ 'শকুন্তলা' থেকে কথাসাহিত্যের রস উপলব্ধি করতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথ যেমন মহাকবি কালিদাসকে রসের দৃষ্টিতে বিচার করে মহাকবিকে বাঙালীর কাছে নতুন মহিমায় তুলে ধরেছেন ('প্রাচীন সাহিত্য'), বিদ্যাসাগরও তেমনি সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠককে কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলের রসোপভোগে সাহায্য করেছিলেন। 'শকুন্তলা'র গদ্য-আখ্যানের দ্বারা আধুনিক যুগে কালিদাস-সাহিত্য প্রচারে তাঁর দান শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়।

৬.

একথা অনস্বীকার্য যে, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বিশুদ্ধ সারস্বত ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব ঠিক সে ধরনের ছিল না। তাঁর অপ্রকাশিত

গ্রন্থ 'বাসুদেবচরিত' থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত রচনাই, (বোধ হয় 'ভ্রান্তিবিলাস', 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' ও 'বিদ্যাসাগর চরিত' রচনার পশ্চাতে কোনও প্রকার উদ্দেশ্য ছিল না) হয় ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থরূপে, আর না হয়, বিধবাবিবাহ-প্রচার এবং বহুবিবাহ-নিরোধক প্রচার-পুস্তিকা-রূপেই প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। ফলে পাঠ্যগ্রন্থের ক্ষুধা মেটানোর জন্য বহুস্থলে তাঁকে অনুবাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে—যদিও সে অনুবাদ মূলের মতোই মৌলিক গৌরব লাভ করেছে। কর্মযোগী মহাপুরুষ শুধু কর্মের দাসত্ব করেছিলেন, সাহিত্যের আনন্দলাভ ও রসবিতরণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। নিছক সাহিত্যচর্চা ও 'রসচর্বণা' তাঁর মতো উপযোগ-বাদী মানবপ্রেমিকের কাছে অলস মানসিক বিলাস (কবিগুরুর ভাষায় "অকাজের কাজ যত আলস্যের সহস্র সঞ্চয়") বলেই মনে হয়েছিল। এখানে তাঁর সঙ্গে রামমোহনের সাহিত্যপ্রচেষ্টার বেশ মিল আছে। রামমোহনও মূলতঃ প্রচারক ছিলেন ; ধর্ম ও সমাজঘটিত বাদ-প্রতিবাদ, বিচারবিশ্লেষণ, পরমত খণ্ডন ও স্বমত প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। নানা কর্মে ও দ্বন্দ্বে অহরহ নিমগ্নচিত্ত রামমোহন বাংলা গদ্যকে বিতর্ক ও সিদ্ধান্তে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগ করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চত্বর থেকে এ ভাষার গদ্যরীতিকে উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যা-সাগর পাঠ্যপুস্তক লিখলেও, মূলতঃ ছিলেন শিল্পী ; তাঁর অজ্ঞাতসারেই পাঠ্যপুস্তক ও অনুবাদ-গ্রন্থে ব্যক্তিস্পর্শজনিত পারিপাট্য ও শ্রীছাঁদ সঞ্চারিত হয়েছে—রামমোহনের গদ্যে যার একান্ত অভাব। অর্থাৎ একথা নিশ্চয় বলা যেতে পারে, যাঁরা বিদ্যাসাগরের পূর্বে গদ্য রচনা করেছিলেন, তাঁরা বস্তু ও ভাবের দিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের গদ্যে তদতিরিক্ত শিল্পশ্রী, সুর, ছন্দ রং ও রস ফুটে উঠল। তাঁর পূর্ববর্তী লেখকেরা শুধুই গদ্যলেখক, বিদ্যাসাগর হলেন গদ্যশিল্পী। প্রকাশভঙ্গিমাই সাহিত্যের মূল রহস্য একথা বিদ্যাসাগর জানতেন, আর প্রকাশভঙ্গিমা মূলতঃ ব্যক্তি-আশ্রয়ী ; লেখকের মানসিক প্রবণতা, 'ইডিওসিনক্র্যাসি', তাঁর সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্ব সাহিত্যের প্রকাশ

বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্তিক বৈচিত্র্য দান করে। বাংলা গদ্যে সেই ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র প্রথম ফুটে উঠল বিদ্যাসাগরের রচনায়—তা সে পাঠ্যপুস্তকই হোক, আর প্রচার-পুস্তিকাই হোক। তাঁর সেই শিল্পীপ্রতিভা আমরা তাঁর অনেক গ্রন্থে দেখতে পাব।

১৮৬০ সালের জানুয়ারী মাসে (সংবৎ ১৯১৬, ১লা মাঘ) বিদ্যাসাগরের 'মহাভারত' (উপক্রমণিকা ভাগ) প্রকাশিত হয়। এর চার বছর আগে তাঁর 'কথামালা' (১৮৫৬) ও 'চরিতাবলী' (১৮৫৬) প্রকাশিত হয়েছিল। তার চার বছর পরে মহাভারতের উপক্রমণিকা প্রকাশিত হল। এই চার বছরের মধ্যে শুধু 'শিশুপালবধ' (১৮৫৭) এবং 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' (১৮৫৩-৫৮) তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই চার বৎসরে তাঁর অন্য কোন বাংলাগ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়ার কারণ, এই সময়ে তিনি বিধবাবিবাহ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, নানা দিক থেকে মানসিক পীড়নও ভোগ করছিলেন। বোধহয় এই সমস্ত কারণে তাঁর রচনায় কিছু ভাঁটা পড়েছিল।

'মহাভারত'-এর (উপক্রমণিকা) বিজ্ঞাপনে তিনি অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য দিয়েছিলেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, তত্ত্ববোধিনী সভার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি মূল মহাভারতকে বাংলা গদ্যে অনুবাদে প্রস্তুত হন। লিপিকর প্রমাদে বা অজ্ঞাতকুলশীল কবিযশঃপ্রার্থীদের লেখনীকণ্ডুয়নের জন্য সংস্কৃত মহাভারতের অনেক শব্দ ও ছত্রের সহজ অর্থ হয় না, অনেক স্থলে অর্থের অসঙ্গতি টীকাকারদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছে। সেই অসঙ্গতিকে 'ব্যাসকূট'-এর আড়ালে বৃদ্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের স্কন্ধে সব সময়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। ভারতের নানা অঞ্চলে প্রচলিত সংস্কৃত মহাভারতের এক পুঁথির সঙ্গে অন্য পুঁথির বহুস্থলে শুধু শব্দের গরমিল নেই, অধ্যায়-সংখ্যারও ইতরবিশেষ আছে। বিদ্যাসাগর যে সংস্কৃত মহাভারত থেকে অনুবাদ করেছিলেন, তার আদিপর্বে ৬২টি অধ্যায় ছিল। কিন্তু অধুনা গবেষকগণ মহাভারতের যে composite text প্রকাশ করেছেন, তাতে অধ্যায়-সংখ্যা কিছু কম। পণ্ডিত

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সংস্করণেরও অধ্যায়-সংখ্যা কম। সুতরাং মহাভারতের কোন্ পুঁথির পাঠ বিশুদ্ধ তা নিয়ে দীর্ঘকাল তর্ক চলতে পারে। কিন্তু তাতে অনুবাদকের বিড়ম্বনার অন্ত থাকে না। তাই এর অনুবাদপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছিলেন, "ফলতঃ নানা কারণ বশতঃ মহাভারতের অনুবাদ নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়।" তিনি স্পষ্টতঃ পাঠককে বলেছেন, "মূলের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে অনেক স্থলে অর্থগত ও তাৎপর্যনিষ্ঠ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবেক, তাহার সংশয় নাই। মূল গ্রন্থে অনেক স্থান এরূপ আছে যে, সহজে অর্থবোধ ও তাৎপর্যগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। সেই সকল স্থল, অনুধাবন করিয়া, অথবা টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা দেখিয়া, পূর্বাপর যেরূপ বোধ হইয়াছিল, তদনুসারেই অনুবাদিত হইয়াছে" (বিজ্ঞাপন)।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধনির্বাচক-কমিটীর তিনি ছিলেন উৎসাহী সদস্য। অক্ষয়কুমার দত্ত এবং আরও অনেক গদ্যলেখকের লেখা তিনি সংশোধন করে দিলে তবে তা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হতে পারত। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার শেষ দু' বৎসর উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধাদি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। বিধবাবিবাহ-বিষয়ক তাঁর প্রথম পুস্তিকার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক) ; দ্বিতীয় প্রস্তাবের উপক্রমভাগও তত্ত্ববোধিনীতে মুদ্রিত হয়েছিল।[৪৮]

৪৮. ১৭৮০ শকাব্দের মাঘ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে এই মর্মে বিজ্ঞাপন ছিল, "তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক পরিবর্তন হইয়াছে, এ নিমিত্ত সকলকে জানান যাইতেছে যে, অতঃপর যাঁহাদের সভায় কোন পত্র লিখিবার প্রয়োজন হইবেক, তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রকারে শিরোনামা দিয়া লিখিবেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক। কলিকাতা।" তিনি ১০৫৮-৫৯ এই দুই বৎসর তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পাদক থাকার সময়ে সভ্যদের অভিপ্রায়ানুসারে ১৭৮১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা বিলুপ্ত হয় এবং এই

তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদনাভার গ্রহণ করার অনেক পূর্ব থেকেই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। সুতরাং তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার নির্দেশে মূল মহাভারতের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করলেন ১৭৭০ শকাব্দে (১৮৪৮)। মহাভারতের উপক্রমণিকা ১৭৭০ থেকে ১৭৭৪ শকাব্দ পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, কখনও প্রতিমাসে, কখনও বা দু-এক মাস অন্তর অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৭৭০ শকের (১৮৪৮) ফাল্গুন মাস থেকে ১৭৭৪ শকাব্দের (১৮৫২) চৈত্রমাস পর্যন্ত এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১৭৭১ শকাব্দের কার্তিক, মাঘ, ফাল্গুন, ১৭৭২ শকাব্দের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-পৌষ, ১৭৭৩ শকাব্দের আষাঢ়-কার্তিক, মাঘ এবং ১৭৭৪ শকাব্দের আষাঢ় ও আশ্বিন-ফাল্গুন সংখ্যায় মহাভারতের কোন অংশ মুদ্রিত হয় নি। 'তত্ত্ব-বোধিনীপত্রিকা'য় প্রকাশের সময় এর নাম ছিল 'মহাভারত—আদিপর্ব'। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এর নাম দেওয়া হয় 'মহাভারত (উপক্রমণিকা)'। এ বিষয়ে বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন, "মহাভারতে নির্দেশ আছে, কেহ প্রথম অবধি, কেহ আস্তীক পর্ব অবধি, কেহ

প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজে অর্পিত হয়। সুতরাং বিদ্যাসাগর তত্ত্ব-বোধিনী সভার শেষ সম্পাদক।

এই প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কৌতূহলজনক বিজ্ঞাপনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সেটি এই: "বিজ্ঞাপন। চিত্রপট বিক্রয়। মহামান্ত, দেশহিতৈষি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিকৃতি চিত্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, পটখানির পরিমাণ দেড়হস্ত হইবেক, এবং মূল্য এক টাকা নির্ধারিত হইয়াছে, যাঁহার প্রয়োজন হয়, লালবাজারের ২৩নং ভবনে শ্রী এন. সি. ঘোষ কোম্পানির নিকট মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইবেন।"—তত্ত্ববোধিনী, ১৭৮১ শক, জ্যৈষ্ঠ। এর পূর্বে রামমোহনের ছবি সম্বন্ধে এই ধরনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। লোকান্তরিত রামমোহন তখন মহাপুরুষ রূপে প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছিলেন। কিন্তু জীবিতকালেই নরদেব বিদ্যাসাগরের দেশের ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছিল।

উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি, ভারতের বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা শেষ কল্প অবলম্বন করেন, তাঁহাদের মতে উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি ভারতের প্রকৃত আরম্ভ, সুতরাং তত্তন্মতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সকল তদীয় উপক্রমণিকা স্বরূপ। এই পুস্তক ঐ অংশের অনুবাদ মাত্র; এই নিমিত্ত শেষ কল্প অবলম্বন করিয়া অনুবাদিত অংশ উপক্রমণিকাভাগ বলিয়া উল্লিখিত হইল।”

এর থেকে দেখা যাচ্ছে মহাভারতের আদি পর্বের ৬১টি অধ্যায় ১৮৪৮ থেকে ১৮৫২ সাল মোট চার বৎসরের মধ্যে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় প্রকাশিত হয়। এই সময়ের মধ্যে তাঁর ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ (১৮৪৮), ‘জীবনচরিত’ (১৮৪৯), ‘বোধোদয়’ (১৮৫১), ‘উপক্রমণিকা’ (১৮৫১) এবং ‘ঋজুপাঠ’ ১ম ও ২য় ভাগ (১৮৫১-১৮৫২) মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথমে তিনি সমগ্র মহাভারতের অনুবাদের পরিকল্পনা করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। ‘মহাভারত’-এর বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছিলেন, “মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা পৃথক প্রচারিত হয় আমার এরূপ অভিলাষ ছিল না। অবশেষে কতিপয় বন্ধুর সবিশেষ অনুরোধে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।” এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, উপক্রমণিকাভাগকে পৃথক ভাবে প্রকাশ না করে তিনি সমগ্র মহাভারত অনুবাদে হস্তক্ষেপ করবার ইচ্ছা পোষণ করতেন। কিন্তু সময়াভাবে বা অন্য কোন কারণে তিনি আর অগ্রসর হতে পারেন নি। এ বিষয়ে তাঁর জীবনচরিতকার যথার্থ বলেছেন, “গভীর পরিতাপের বিষয় যে. এরূপ সুললিত পদবিন্যাস-সম্পন্ন ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত গদ্য মহাভারত গ্রন্থ তাঁহার লেখনীতে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার বিচারশক্তি ও বহুজ্ঞানপ্রসূত আলোচনাসহ মহাভারত গ্রন্থ যে, এক উপাদেয় বস্তু হইত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ কেবল তাহারই আভাস প্রদান করিতেছে।”[৪৯]

৪৯. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর (১৮৯৫), পৃ. ১৭২

বিদ্যাসাগর মহাভারতের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেন, কিন্তু আদিপর্ব অনুবাদের পর অন্যান্য পর্বে আর হাত দেন নি। এর কারণ স্বরূপ কেউ কেউ মনে করেন, কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে প্রকাশিত মহাভারতের অনুবাদ দেখে তিনি স্বয়ং আর অনুবাদের প্রয়োজন বোধ করেন নি। ১৮৫২ সালের (১৭৭৪ শক, চৈত্র) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় মহাভারতের আদিপর্বের অনুবাদ সমাপ্ত হয়, অনূদিত অংশ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত হবার পর তিনি বোধ হয় অবকাশ মতো অন্যান্য পর্বে হাত দেবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু নানা কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্য আর অগ্রসর হতে পারেন নি। ইতিমধ্যে ১৮৫৮ সালে ১৩ই জুলাই 'সংবাদ প্রভাকরে' এই মর্মে এক বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়: "মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা ১লা শ্রাবণ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, ঐ দিনে রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ হইবে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।" তা হলে দেখা যাচ্ছে, কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি মহাভারত অনুবাদের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৬০ সালের ১৬ই এপ্রিলের পূর্বে[৫০] মহাভারতের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং ১৮৬৬ সালের মধ্যে মোট ১৭টি খণ্ডে সম্পূর্ণ মহাভারত অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৮শ খণ্ডে অনুবাদের উপসংহার-রূপে কালীপ্রসন্ন সম্পাদকীয় বিবৃতি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের মহাভারতের আদিপর্ব 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রকাশের (১৮৫২) ছ' বৎসর পরে কালীপ্রসন্ন সম্পূর্ণ মহাভারতের অনুবাদের সঙ্কল্প করেন এবং কাজ আরম্ভ করেন; তারপর ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬ সালের মধ্যে পণ্ডিতদের সাহায্যে সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ করেন। আদিপর্বটি তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হতে আরম্ভ করে।

৫০. ১৮৬০ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখের 'সোমপ্রকাশে' মহাভারতের প্রথম খণ্ড সমালোচিত হয়েছিল।

কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে উক্ত সভার সম্পাদক রাধানাথ বিদ্যারত্ন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (১৭৮০ শক, ফাল্গুন) এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেন: "শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় কর্ত্তৃক গদ্যে অনুবাদিত বাঙ্গালা মহাভারত। মহাভারতের আদিপর্ব্ব তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে। অতি ত্বরায় মুদ্রিত হইয়া সাধারণে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। অতএব যাঁহারা বিনা ব্যয়ে প্রথমাবধি শেষ খণ্ড পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ফাল্গুন মাসের মধ্যেই শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের নামে পত্র লিখিবেন, তাহা হইলে পুস্তক প্রস্তুত হইলেই পত্রলেখক মহাশয়দিগের নিকট প্রেরিত হইবে।" কালীপ্রসন্নের এই মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার মূলে বিদ্যাসাগরের বিশেষ উৎসাহ ছিল, বস্তুতঃ তাঁরই অনুরোধে কালীপ্রসন্ন এই দুরূহ এবং ব্যয়বহুল কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত করেন।[৫১] কালীপ্রসন্ন সে কথা স্বীকার করে মহাভারতের উপসংহার অর্থাৎ ১৮শ খণ্ডে (১৮৬৬ সালে প্রকাশিত) লিখেছিলেন:

> "আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের অধীনস্থ তত্ত্ব-

৫১. এ বিষয়ে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের উক্তি উল্লেখযোগ্য: "বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি (কালীপ্রসন্ন) অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। মহাভারতের অনুবাদ বিদ্যাসাগরের প্ররোচনায় হইয়াছিল। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে বিদ্যাসাগর এই কার্যে ব্রতী করিয়াছিলেন। যে পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা মহাভারত অনূদিত হইয়াছিল তাঁহারাও বিদ্যাসাগরের লোক" (বিদ্যাভারতী প্রকাশিত বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ', নতুন সংস্করণ, পৃ. ৪৯)। আর এক স্থলে কৃষ্ণকমল বলেছেন, "তিনি (কালীপ্রসন্ন) বিদ্যাসাগরের কথায় এই বিরাট কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিজেরও higher, nobler, sympathies যথেষ্ট ছিল; লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক, লেখাপড়ার প্রচারের একটা প্রবল বাসনা ছিল।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', পৃ. ৫০)

বোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরল হৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন।"

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মন্তব্য (৫১ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যাসাগরই কালীপ্রসন্নকে মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত করেছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্নের উল্লিখিত উক্তি থেকে মনে হয়, তিনি নিজেই মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; সে সংবাদ পেয়ে বিদ্যাসাগর মহাভারতের বাকি অংশের অনুবাদে ক্ষান্ত হন এবং কালীপ্রসন্নকে এই ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। এ বিষয়ে কয়েকটি সন-তারিখের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৪৮ থেকে ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে বিদ্যাসাগর-অনূদিত মহাভারতের আদিপর্বের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তারপর দীর্ঘকাল তিনি মহাভারতের কোন পর্ব অনুবাদ করেন নি, পরে বন্ধু-জনের অনুরোধে পূর্বপ্রকাশিত অংশটুকুর কিছু সংশোধন করে 'মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ)' এই নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন (১৮৬০, জানুয়ারী)।[৫২] কালীপ্রসন্ন ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসের

৫২. প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' তারিখ আছে সংবৎ ১৯১৬, ১লা মাঘ। বিদ্যাসাগরের চরিতকার বিহারীলাল সরকারের মতে "১৯১৬ সংবতে (১২৬৭ সালে) ১লা মাঘে বা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা (অর্থাৎ মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ) প্রকাশ করেন।"—বিদ্যাসাগর (৪র্থ সং), পৃ. ৩৬৮

মাঝামাঝি মহাভারত অনুবাদে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিয়োগ করেন এবং ১৮৬০ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমে বা কিছু পূর্বে মহাভারতের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। মুদ্রণের সংবাদ ১৭৮৯ শকের ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়। আমাদের মনে হয়, নানা কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্য বিদ্যাসাগর ১৮৫২ সালের পর মহাভারতের উপক্রমণিকার পরবর্তী অংশে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাননি। তার কয়েক বছর পরে তিনি যখন শুনলেন, বা কালীপ্রসন্নের কাছে সংবাদ পেলেন যে, সিংহ মহাশয় মহাভারতের সমগ্র অনুবাদ করতে সঙ্কল্প করেছেন, তখন তিনি তাঁকে সেই কাজে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন এবং নিজে মহাভারতের অন্যান্য পর্ব অনুবাদে ক্ষান্ত হলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর মতো কর্মব্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে অষ্টাদশ পর্বের বিপুল-কলেবর মহাভারতের গদ্যানুবাদ প্রকাশ অতি দুঃসাধ্য ও তাঁর একার পক্ষে ব্যয়বহুল ব্যাপার। কালীপ্রসন্ন সিংহের মতো ধনাঢ্য, শিক্ষিত ও দেশহিতব্রতী তরুণ এই কাজে উদ্যোগী হলে তিনি খুশী হয়েই নিজের পূর্বপরিকল্পনা পরিত্যাগ করে কালীপ্রসন্নকে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন। এতদিন তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত মহাভারতের আদিপর্বের অনুবাদ গ্রন্থকারে প্রকাশ করেন নি। বোধ হয় সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করে বা কয়েকটি পর্বের অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবেন এই রকম তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে কালীপ্রসন্নের উদ্যোগে সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ শুরু হলে এবং ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দের ফাল্গুন মাসে বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিজ্ঞাপনে মুদ্রণকার্য আরম্ভের সংবাদ ঘোষিত হলে বিদ্যাসাগর এই ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে, যোগ্য ব্যক্তিই এই বিরাট কাজে হাত দিয়েছেন। তখন তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে তিনি তাঁর অনূদিত অংশটুকু মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় ফেলে না রেখে কালীপ্রসন্নের মহাভারতের প্রথম খণ্ড প্রকাশের কয়েক মাস আগেই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেন। কিন্তু এক বিষয়ে একটু সংশয় থেকে যাচ্ছে।

তরুণ কালীপ্রসন্ন তাঁকে অতিশয় মান্য করতেন, তিনিও এই ধনাঢ্য অথচ সংস্কৃতিবান যুবককে স্নেহ করতেন। তা হলে বিদ্যাসাগরের অনূদিত অংশটুকু স্বচ্ছন্দেই তো কালীপ্রসন্নের মহাভারতের প্রথম পর্ব-রূপে প্রকাশিত হতে পারত।[৫৩] তাতে কালীপ্রসন্নের মহাভারতের গৌরব বৃদ্ধিই পেত। সে যাই হোক, বিদ্যাসাগর উপযুক্ত পাত্রের হস্তে এই কর্মভার ন্যস্ত হয়েছে দেখে এ বিষয়ে ক্ষান্ত হয়ে কালীপ্রসন্নকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে থাকেন, অনুবাদ-সংক্রান্ত উপদেশ দিয়ে, উপযুক্ত পণ্ডিত ও অনুবাদকের সন্ধান দিয়ে এবং মুদ্রণকার্য পরিদর্শন করে কালীপ্রসন্নের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর ইতিপূর্বে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' অনুবাদ করে অনুবাদক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বস্তুতঃ বেতালের মারফতে তিনি সর্বপ্রথম সরল ভাষায় গল্পরস পরিবেশন করেছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি যখন মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হলেন, তখন তিনি সংস্কৃত ভাষাকে বাংলায় রূপান্তরিত করবার শিল্পরীতিসম্মত প্রকরণটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তারও আগে ভাগবতের কৃষ্ণলীলার কিয়দংশ অবলম্বনে তিনি যে 'বাসুদেবচরিত' লিখেছিলেন (মুদ্রিত হয় নি, পাণ্ডু-

৫৩. অনেক সময় বিদ্যাসাগর নিজের কোন কোন অসমাপ্ত রচনার সমাপ্ত করার ভার কোন বন্ধু বা স্নেহভাজনের ওপর ছেড়ে দিয়ে তার নামেই গ্রন্থ প্রকাশের অনুমতি দিতেন। ইংরেজী *Moral Class Book* অবলম্বনে তিনি 'নীতিবোধ' নামে একখানি বালপাঠ্য text book রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং গুটি-কয়েক প্রস্তাব অনুবাদের পর নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উক্ত পুস্তিকা সম্পূর্ণ করতে বলেন—রাজকৃষ্ণের নামেই পুস্তিকাটি প্রকাশ করতে অনুমতি দেন। শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের 'রামের রাজ্যাভিষেক' প্রকাশিত হলে বিদ্যাসাগরের ঐ নামে যে গ্রন্থ ছাপা হচ্ছিল, তিনি তখনই তার মুদ্রণকার্য বন্ধ করে দেন। কালীপ্রসন্নের মহাভারত আগে গ্রন্থাকারে ছাপা হলে বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হতেন কি না জানি না, সম্ভবতঃ হতেন না।

লিপিও হারিয়ে গেছে), তার যেটুকু পাওয়া গেছে, তার ভাষারীতিও বেশ সহজ ও প্রসন্ন। মহাভারত অনুবাদ অত্যন্ত দুরূহ, তা তিনি উক্ত পুস্তিকার 'বিজ্ঞাপনে' স্বীকার করেছিলেন। কারণ দেশভেদে ও কালভেদে বৈয়াসকি মহাভারতের নানা রূপান্তর প্রচলিত আছে, প্রক্ষেপের ফলে অনেক স্থল অতিশয় দুর্বোধ্য। নানা অঞ্চলের পুঁথির পাঠ মিলিয়ে, টীকাকারদের ভাষ্য বিচার করে এবং স্বাভাবিক রস-বোধের সাহায্যে বিদ্যাসাগর মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হলেন। মহা-ভারত শুধু মহাকাব্য নয়, ধর্মগ্রন্থ ও ইতিবৃত্তরূপেও এর মূল্য অসাধারণ। সেই অসাধারণ গ্রন্থকে সাধারণ পাঠকসমীপে উপস্থিত করা সহজ ব্যাপার নয়। কারণ ধর্মগ্রন্থ বলে এটি ভারতীয় সমাজে দীর্ঘকাল ধরে শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে। সুতরাং তার অনুবাদ যথাসম্ভব আক্ষরিক হওয়া আবশ্যক, একটি অক্ষর ব্যত্যয়েও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির ধর্মবোধে আঘাত লাগতে পারে। আবার অন্যদিকে, পুরোপুরি আক্ষরিক অনুবাদ (রামমোহনের বেদান্ত অনুবাদের মতো) হলে, তা সুখপাঠ্য হয় না, সহজবোধ্যও হয় না। সুতরাং এই অনুবাদে তাঁর প্রতিভার অগ্নি-পরীক্ষা হয়ে গেছে। তিনি আক্ষরিক অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েও অনুবাদ-কর্মটিকে যথাসম্ভব শিল্পসম্মত ও সরস করতে চেষ্টা করেছেন। এখানে আমরা মূল মহাভারত, বিদ্যাসাগরের অনুবাদ এবং পরবর্তী কালের কয়েকটি অনুবাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বের পরিচয় নেবার চেষ্টা করব।

১. মূল মহাভারত ঃ

> লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতিঃ পৌরাণিকো নৈমিষারণ্যে শৌনকস্য কুলপতের্দ্বাদশবার্ষিকে সত্রে ॥ ১ ॥
>
> সুখাসীনানভ্যগচ্ছদ্ ব্রহ্মর্ষীন্ সংশিতব্রতান্।
> বিনয়াবনতো ভূত্বা কদাচিৎ সূতনন্দনঃ ॥ ২ ॥
> তমাশ্রমমনুপ্রাপ্তং নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
> চিত্রাঃ শ্রোতুং কথাস্তত্র পরিবব্রুস্তপস্বিনঃ ॥ ৩ ॥

অভিবাদ্য মুনীংস্তাংস্তু সর্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ।
অপৃচ্ছৎ স তপোবৃদ্ধিং সদ্ভিশ্চৈবাভিনন্দিতঃ ॥ ৪ ॥
অথ তেষূপবিষ্টেষু সর্বেষেব তপস্বিষু।
নির্দিষ্টমাসনং ভেজে বিনয়াল্লোমহর্ষণিঃ ॥ ৫ ॥

[মহাভারত, আদিপর্ব,
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সংস্করণ]

২. বিদ্যাসাগরের অনুবাদ :

"কুলপতি শৌনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে এক দিবস ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্মাবসানে একত্র সমাগত হইয়া কথা প্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছেন, এমন সময়ে সূত-কুলপ্রসূত লোমহর্ষণতনয় পৌরাণিক উগ্রশ্রবাঃ বিনীতভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বিগণ, দর্শনমাত্র অদ্ভুত কথা শ্রবণ বাসনাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। উগ্রশ্রবাঃ বিনয়নম্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অভিবাদনপূর্বক সেই সমস্ত মুনিদিগকে তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।" (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৬)

৩. কালীপ্রসন্ন প্রকাশিত মহাভারতের অনুবাদ :

"কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক, দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্ম সমাধান করতঃ সকলে সমবেত হইয়া কথা প্রসঙ্গে সুখে অধ্যাসীন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে লোমহর্ষণপুত্র পৌরাণিক সৌতি অতি বিনীতভাবে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া অত্যাশ্চর্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। উগ্রশ্রবাঃ সৌতি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।" (বসুমতী সংস্করণ)

৪. বর্ধমান রাজবাটী সংস্করণ :

"কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে সূতকুলোদ্ভব লোমহর্ষণপুত্র পৌরাণিক সূতকুলানন্দ উগ্রশ্রবা বিনয়াবনত হইয়া কুলপতি শৌনকের দ্বাদশ-

বার্ষিক সত্রে দীক্ষিত ও সুখোপবিষ্ট মহর্ষিগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিদিগের আশ্রমে সমাগত হইলে তপস্বীরা আশ্চর্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া তাঁহাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিলেন। সৌতি সেই সমস্ত মুনি ও তপস্বিগণকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তপোবৃদ্ধির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।"

৫. হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ ঃ

"কোন সময়ে লোমহর্ষণের পুত্র পুরাণশাস্ত্রজ্ঞ শ্রুতিধর সৌতি বিনয়ে অবনত হইয়া, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে ব্রতচারী ব্রহ্মর্ষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বীরা আশ্চর্য উপাখ্যান শুনিবার জন্য, আপন আশ্রমে উপস্থিত সৌতিকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। সাধুজন-প্রশংসিত সৌতি সমস্ত মুণিগণকেই নমস্কার করিয়া তাঁহাদের তপস্যার উন্নতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর সেই সকল তপস্বীরা উপবেশন করিলেন, সৌতি বিনীতভাবে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।"

এই দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে, কালীপ্রসন্ন-প্রকাশিত অনুবাদে বিদ্যাসাগরের রচনার গাঢ় প্রভাব আছে। বিদ্যাসাগর দীর্ঘ, জটিল, মিশ্র ও যৌগিক বাক্যকে ভেঙে প্রায়শঃই সরল বাক্যে পরিণত করেছেন, কোথাও-বা সরল বাক্যগুলিকে সংযোজক অব্যয় সহযোগে সন্নিকৃষ্ট করেছেন—আবার প্রয়োজন স্থলে অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা একাধিক বাক্যকে একই ভাবমণ্ডলের মধ্যে এনেছেন। তাঁর মহাভারতের অনুবাদ ১৮৪৮ সালে শুরু হয়েছে, এর অল্প কিছুদিন আগে 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয়েছিল। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, 'বেতালে'র প্রথম সংস্করণের ভাষা সম্পূর্ণরূপে জড়তা মুক্ত হতে পারে নি [৫৪], কিছু অনভ্যস্ত শব্দ, সমাস-সন্ধির অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি ছিল। কিন্তু পরবর্তী

৫৪. 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রথম সংস্করণের গুরুভার ভাষার দৃষ্টান্ত ঃ "উত্তাল তরঙ্গমালসঙ্কুল উৎফুল্লফেননিচয়চুম্বিত ভয়ঙ্কর তিমি-মকর-নক্র-চক্রভীষণ-স্রোতস্বতীপতি-প্রবাহমধ্য হইতে সহসা এক দিব্যতরু উদ্ভূত হইল।"

সংস্করণে 'বেতালে'র ভাষা অনেক সরল হয়েছিল। এই সময়ে বিদ্যাসাগর আক্ষরিক অনুবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েও অনুবাদের ভাষাকে যথাসম্ভব বাংলা ভাষার অভ্যস্ত রীতির অনুকূল করেছিলেন। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত থেকে তাঁর ভাষার সরল অথচ গম্ভীর ধ্বনিবিন্যাস সহজেই শ্রুতিগোচর হবে। অনেক পরে প্রকাশিত বর্ধমান রাজবাটীর মহাভারতের (১৮৯১) ভাষা বিদ্যাসাগরের ভাষার চেয়ে সহজ ও প্রসাদগুণমণ্ডিত হয় নি। সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদে বিদ্যাসাগরের এই ক্লাসিক অথচ সরস রীতিটি পরবর্তীকালে পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ও তাঁর সম্পাদিত ও অনূদিত মহাভারতে গ্রহণ করেছেন।

মহাভারতের দ্রুত ঘটমান কাহিনী ও সরল বিবৃতি বিদ্যাসাগর প্রায়ই রক্ষা করেছেন, প্রত্যক্ষ উক্তিকেও বাংলা সংলাপের ঢঙে সাজিয়েছেন— অবশ্য ক্রিয়াপদ ও সর্বনামে সাধুরীতিই বজায় রেখেছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ উক্তির নাটকীয়তা চমৎকার রক্ষা করেছেন। এখানে এই ধরনের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

> যদাশ্রৌষং দ্রৌপদীমশ্রুকণ্ঠীং সভাং নীতাং দুঃখিতামেকবস্ত্রাম্।
> রজস্বলাং নাথবতীমনাথবৎ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥ ১১৮ ॥
>
> (আদিপর্ব)

বিদ্যাসাগরের অনুবাদ :

> "যখন শুনিলাম, অশ্রুমুখী, অতিদুঃখিতা, একবস্ত্রা, রজস্বলা, সনাথা দ্রৌপদীকে অনাথার ন্যায় সভায় লইয়া গিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই।" (বি. র. ৩য়, পৃ. ১৫)

এখানে ধৃতরাষ্ট্রের উক্তিটি প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত হওয়াতে নাটকীয় রস সঞ্চারিত হয়েছে। অনুবাদ যে প্রায় মূলের স্বাদ সৃষ্টি করতে পারে তা মূল ও তার অনুবাদের তুলনা করলে বোঝা যাবে। আর একটি দৃষ্টান্ত :

> তপো ন কল্কোঽধ্যয়নং ন কল্কঃ স্বাভাবিকো বেদবিধির্নকল্কঃ।
> প্রসহ্য বিত্তাহরণং ন কল্কঃ তান্যেব ভাবোপহতানি কল্কঃ ॥ ২৩৬ ॥
>
> (আদি-১ম)

বিদ্যাসাগরের অনুবাদ :

> "তপস্যা পাপজনক নহে, বেদাধ্যয়ন পাপ-জনক নহে, বর্ণাশ্রমাদিনিয়মিত বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান পাপজনক নহে, অশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্বক জীবিকানির্বাহ করা পাপজনক নহে ; এই সমস্ত অসদভিপ্রায়দূষিত হইলেই পাপজনক হয়।" (বি. র. ৩য়, পৃ. ২২)

অবশ্য এই অনুবাদে বিদ্যাসাগর কিছু কিছু এমন সমস্ত-পদ ও শব্দ ব্যবহার করেছেন যা সচরাচর বাংলা গদ্যে প্রযুক্ত হয় না। যেমন—অনেকানেক, বিতথ, পুংস্কোকিল, অপূপ, ক্ষপণক, অরবিশিষ্ট, ভুণ্ডুভ, যত্রসায়ংগৃহ, ব্যালকুলসমাকুল, ভূরুহ, পরিঘ, শিলীমুখ, দন্দশূক, প্রভব-ভূমি, পরিপূর্যমান, সূনু, ন্যক্কৃত, পরাবরস্বরূপ, সংশিতব্রত, বড়িশপ্রায়, মরীচিপ, উশীরস্তম্ব, বসা, পন্নগ, অবভৃথ, শিংশবৃক্ষ। অবশ্য বাংলা গদ্যে এ শব্দগুলির ততটা প্রচলন না থাকলেও, মহাভারতের ক্লাসিক গাম্ভীর্য ও প্রাচীন ভাবমণ্ডল সৃষ্টির জন্য এরকম ভারী ভারী ও আভিধানিক শব্দপ্রয়োগকে সবসময়ে নিষ্প্রয়োজন বলা যায় না।

অনুবাদের ভাষাকে সংহত রূপ দেবার জন্য বিদ্যাসাগর অনেক সমাস-বদ্ধ পদ ব্যবহার করেছেন। মহাভারতের ঘনবিন্যস্ত শব্দ ও বাক্যকে বাংলায় অনুবাদ করতে গেলে বাংলা বাক্যের বহর বেড়ে যায়। বাক্-সংহৃতির জন্য তাঁকে তাই প্রচুর সমাসবদ্ধ শব্দের সাহায্য নিতে হয়েছে। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

> "দেবতারা অমৃতমন্থনের আদেশ পাইয়া মন্দর গিরিকে মন্থনদণ্ড করিবার নিশ্চয় করিলেন। কিন্তু সেই উত্তুঙ্গ শৃঙ্গসমূহসুশোভিত, বহুলতাজালসঙ্কীর্ণ বহুবিধ বিহগমণ্ডলকোলাহলসঙ্কুল, অনেক ব্যালকুল-সমাকুল, অপ্সর-কিন্নর-অমরগণসেবিত, একাদশসহস্র যোজন উন্নত ও তৎপরিমাণে ভূগর্ভে অবস্থিত গিরিরাজের উদ্ধরণে অসমর্থ হইয়া, তাঁহারা ব্রহ্মা ও নারায়ণের নিকটে আসিয়া বিনয়বচনে নিবেদন করিলেন, আপনারা আমাদিগের হিতার্থে কোনও সদুপায় নির্ধারণ ও মন্দরের উদ্ধরণে যত্ন করুন।" (বি. র. ৩য়, পৃ. ৬৫)

এখানে যেমন তৎসম শব্দসঙ্কুল সমাসবদ্ধ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি আবার তিনি "তাহারা কুশাসন চাটিতে লাগিল" (বি. র. ৩য়, পৃ. ৮৮), "আমি তোমার সমক্ষে বৃক্ষকে বাঁচাইতেছি" (ঐ, পৃ. ১০১)—এই দুই বাক্যের 'চাটিতে লাগিল' এবং 'বাঁচাইতেছি' ক্রিয়াপদে চলতি ধাতু ব্যবহার করেছেন। ইচ্ছা করলে তিনি এখানে চলতি ধাতুর (চাট ধাতু) স্থলে তৎসম 'লিহ্' ধাতু জাত 'লেহন' ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু হতবুদ্ধি ও লোভাতুর সর্পেরা কুশাসন চাটতে লাগল, এখানে 'চাট' ধাতু ব্যবহারে অমৃতপানে তাদের অমর হবার ব্যর্থতা, নৈরাশ্য ও মূঢ়তার ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে কাশ্যপ তক্ষককে নিজের বাহাদুরি দেখাবার জন্য বলেছেন, "হে পন্নগরাজ! আমার বিদ্যাবল দেখ, আমি তোমার সমক্ষে বৃক্ষকে বাঁচাইতেছি।" এখানে 'বাঁচাইতেছি'র স্থলে 'পুনরুজ্জীবিত করিতেছি' বললে বাহাদুরি দেখাবার ভাবটি ঠিক ফুটত না।

রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতি অনুবাদের জন্য সরল অথচ গম্ভীর, হালকা অথচ ক্লাসিক ধরনের ভাষার প্রয়োজন—এ কথা বিদ্যাসাগর অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বাসুদেবচরিত'-এর ভাষাও এই ধরনের সরল অথচ গম্ভীর ব্যাপারের বর্ণনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। বস্তুতঃ তাঁর পরে একাধিকবার মহাভারতের গদ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু কোনটিই আন্তরিকতা, সরসতা ও গাম্ভীর্যের দিক থেকে বিদ্যাসাগরকে অতিক্রম করতে পারে নি।

৭.

রামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়ের পরবর্তী জীবন ও সীতার পরিণাম অবলম্বনে রচিত বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' (১৮৬১) শ্রেষ্ঠ বাংলা ক্লাসিক গ্রন্থরূপে এবং আমাদের পবিত্র পারিবারিক কর্তব্যের স্মারক হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বোধ করি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬২) ছেড়ে দিলে, রামায়ণ অবলম্বনে লেখা আর কোন গ্রন্থ 'সীতার বনবাস'-এর মতো আমাদের

মনে এতটা প্রভাব মুদ্রিত করতে পারে নি। সে-যুগে এই গ্রন্থটি পাঠ্য-পুস্তকরূপে ছাত্রসমাজে সুপরিচিত ছিল, কৃতবিদ্য অন্তঃপুরিকারাও এই গ্রন্থপাঠে করুণ রসের *Katharsis* উপলব্ধি করতেন। (এক কথায়, ভাবে ও ভাষায়, আদর্শে, চারিত্রনীতিতে, সকরুণ বেদনায় 'সীতার বনবাস' একযুগের পাঠকসমাজের মন লুঠ করে নিয়েছিল।) এর সাহিত্যগুণ বাদ দিলেও, যথার্থভাবে বাংলা ভাষা শিখতে গেলে—এ ভাষার পদবিন্যাস, বাক্যপ্রকরণ, শব্দসম্ভার, সমাস-সন্ধি-অলঙ্কারের পরিমিত প্রয়োগ প্রভৃতি আয়ত্ত করতে গেলে এ গ্রন্থের ভাষাশিক্ষাগত উপযোগিতা বিশেষভাবে স্বীকার করতে হবে।) সে যুগে যিনি 'সীতার বনবাস' আয়ত্ত করতে পারতেন তিনি বাংলা গদ্যের অন্তঃপুরে প্রবেশে সমর্থ হয়েছেন, একথা অহমিকার সঙ্গেই বলতে পারতেন।

(১৮৬০ সালের বৈশাখ মাসে 'সীতার বনবাস' প্রকাশিত হয়।)[৫৫] প্রথম সংস্করণের প্রকাশের তারিখ—১৯১৭ সংবৎ, ১লা বৈশাখ। কিন্তু এটি ঠিক নয়। ১৯১৮ সংবতের ১লা বৈশাখ (১৮৬০ খ্রীঃ অঃ = ১২৬৭ বঙ্গাব্দ) এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কারণ ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের ২১ মে তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ আছে। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রন্থের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাঁর জীবিতকালের মধ্যে এর পঁচিশটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য একে মুদ্রণ না বলে সংস্করণ বলাই উচিত। কারণ প্রতি মুদ্রণেই তিনি এর কিছু না কিছু সংশোধন করতেন। ফলে এক সংস্করণের সঙ্গে অন্য সংস্করণের কিছু কিছু পাঠ-বৈষম্য লক্ষ্য করা যাবে।

কোন্ উৎস থেকে বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস'-এর উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তার হদিস তিনি গ্রন্থের বিজ্ঞাপনেই বলে দিয়েছেন। "এই

---

৫৫. এই সময়ে বিদ্যাসাগর নানাকাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে দিনের বেলা লিখবার সময় পেতেন না। রাত্রি আড়াইটে থেকে পরদিন বেলা দশটা পর্যন্ত একাদি-ক্রমে লিখে মাত্র চার দিনে 'সীতার বনবাস' সমাপ্ত করেন (দ্রষ্টব্য: বিহারী-লাল সরকার প্রণীত 'বিদ্যাসাগর', ৪র্থ সং, পৃ. ৬৬৯)

পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতি প্রণীত উত্তর-চরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তকবিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বন-পূর্বক সঙ্কলিত হইয়াছে।" ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' ভবভূতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গিয়ে তিনি 'শ্রীকণ্ঠ' ভবভূতির দোষগুণ দুই-ই নির্দেশ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর মতে, "কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষদেব ও বাণভট্টের পর তদীয় নাম (অর্থাৎ ভবভূতির নাম) নির্দেশ বোধ হয়, অসঙ্গত নহে" (বি. র. ২য়, পৃ. ৩৭)। তিনি 'উত্তরচরিত'কে করুণরসের সর্বোৎকৃষ্ট নাটক বলে মনে করতেন। "ফলতঃ শকুন্তলা আদিরস বিষয়ে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, উত্তরচরিত করুণরস বিষয়ে সেইরূপ। এই নাটক পাঠ করিলে মোহিত হইতে ও অশ্রুপাত করিতে হয়" (ঐ, পৃ. ৩৭-৩৮)।[৫৬] মানুষের দুঃখবেদনার প্রতি তাঁর ছিল অসীম সহানুভূতি; দুঃখকষ্টের কথা শুনলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না, অশ্রুসকাতরচিত্তে তা দূরীভূত করতে গিয়ে বহু অর্থব্যয় করে নিঃস্ব হতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। সুতরাং রামের উত্তরজীবন ও সীতার শোচনীয় পরিণামের জন্য তিনি যে ভবভূতির 'উত্তরচরিত'-এর অত্যন্ত অনুরাগী হবেন তাতে আর সন্দেহ কি?[৫৭]

৫৬. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যাসাগর ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে 'উত্তরচরিতের' দেবনাগরী হরফে ছাপা যে সংস্করণ সম্পাদনা করেছিলেন, তার বিজ্ঞাপনে বলেছেন, "এই নাটক কারুণ্য, মাধুর্য ও অর্থগাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর ও প্রগাঢ়। করুণরস বিষয়ে ভবভূতির উত্তরচরিত সংস্কৃত ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য।"—('উত্তরচরিতম্'-এর বিজ্ঞাপন, পৃ. ১) **Edited by Iswar Chandra Vidyasagar for the use of Candidates for the First Examinations in Arts of the Calcutta University. (3rd edition, 1876.)**

৫৭. এ বিষয়ে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ঠিকই অনুমান করেছেন। তাঁর মতে, "রামায়ণ ও উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা

'শ্রীকণ্ঠ' উপাধিক ভবভূতি অনুমান খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে বিদর্ভের (আধুনিক বেরার) পদ্মপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য এখন এ গ্রামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কালে তিনি কান্যকুব্জরাজ-যশোবর্মণের সভাকবি হয়ে তিনখানি নাটক ('বীরচরিত' বা 'মহাবীর-চরিত', 'উত্তররামচরিত' এবং 'মালতীমাধব') রচনা করেন। করুণরসের অতিবিস্তার এবং অর্থগম্ভীর রচনার জন্য সে যুগের কোন কোন মুগ্ধ সমালোচক তাঁকে কালিদাসেরও ওপরে স্থান দিয়েছেন। এ বিষয়ে একটি পুরাতন বাক্য প্রচলিত আছে, "কবয়ঃ কালিদাসাদ্যা ভবভূতির্মহাকবিঃ"—কালিদাস প্রভৃতিরা শুধু কবিমাত্র, আর ভবভূতি হলেন মহাকবি।[৫৮] এ যুগের ইংরেজী-নবিশ পণ্ডিতসমালোচকও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। স্বয়ং হোরেস হেমান উইলসন ভবভূতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ভাণ্ডারকর বলেছেন, "He has an equally strong perception of stern grandeur in human character, and is very successful in bringing out deep pathos and tenderness. He is skilful in detecting beauty even in ordinary things or action and in distinguishing the nicer shades of feeling. He is a master of style and expression, and his cleverness

---

করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতে নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদন-প্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ।" (সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত 'রামেন্দ্র-রচনাবলী,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯)

৫৮. অবশ্য সে যুগেও কিছু কাণ্ডজ্ঞানযুক্ত রসিক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁরা এর উত্তোর কেটেছিলেন এই ভাবে, "তরবঃ পারিজাতাদ্যাঃ স্নুহিবৃক্ষো মহাতরুঃ।" অর্থাৎ পারিজাত প্রভৃতি শুধু গাছ মাত্র, ফণীমনসাই হল যথার্থ মহাবৃক্ষ!

in adapting his words to the sentiment is unsurpassed." এ সব অতি-প্রশংসার চেয়ে বিদ্যাসাগরের তীক্ষ্ণ সমালোচনা ('সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব', এবং 'উত্তরচরিতম্'-এর বিজ্ঞাপন) এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নিপুণ রসবিশ্লেষণ ("উত্তরচরিত", 'বিবিধপ্রবন্ধ', ১ম খণ্ড) অনেক বেশী যুক্তিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস। সে যাই হোক, ভবভূতি নাটকের শেষে বলেছেন যে, তাঁর রচনা নাকি বাল্মীকির নিজেরই বাক্য।[৫৯] কিন্তু নাটকীয় চমৎকারিত্ব ও নতুন সৃষ্টির জন্য ভবভূতি বাল্মীকির কাহিনীর সূত্রমাত্র অবলম্বন করে, কিছু অন্য গ্রন্থ থেকে, কিছু কালিদাস থেকে ('রঘুবংশম্'), কিছু-বা নিজস্ব বৈচিত্র্য-লোভী কল্পনার কাছ থেকে উপাদান সঞ্চয় করেছেন।[৬০] অপর দিকে

৫৯. সপ্তম অঙ্কের সবশেষ পংক্তিতে আছে—"বাল্মীকেঃ পরিভাবয়ন্ত্বভিনয়ৈ-র্বিন্যস্তরূপাং বুধাঃ। শব্দব্রহ্মবিদঃ কবেঃ পরিণতপ্রজ্ঞস্য বাণীমিমাম্॥" অর্থাৎ—আশা করি এই অভিনয় দ্বারা যার স্বরূপ দেখান হল, তাকে পণ্ডিতেরা শব্দ-ব্রহ্মের পরিজ্ঞাতা পরিণতবুদ্ধি বাল্মীকির নিজের বাক্য বলেই মনে করবেন।

৬০. প্রথম অঙ্কের ('চিত্রদর্শনো নাম প্রথমোঽঙ্কঃ') আলেখ্যদর্শনের ব্যাপারটির সূত্র তিনি কালিদাসের 'রঘুবংশম্' থেকে নিয়েছিলেন বলে মনে হয়। যথা :

তয়োর্যথা প্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থানাসেদুষোঃ সদ্মসু চিৎবৎসু।
প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু সঞ্চিন্ত্যমানানি সুখান্যভূবন্॥
(রঘু।১৪।২৫)

তাঁদের (রামসীতার) আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ কোন ভোগ্য বস্তুর অভাব ছিল না। তাঁরা মিলনের দিনে মনোহর চিত্রশালায় এসে দণ্ডকারণ্যের অনন্ত দুঃখজনক ঘটনাসমূহের চিত্র দেখে, সেই দুঃখাবহ দিনগুলির কথা মনে করে এখন কত সুখ পেলেন।

'উত্তরচরিতে'র (৪র্থ-৫ম অঙ্ক) অশ্বমেধের অশ্বনিয়োগ উপলক্ষে অশ্বরক্ষক সৈন্যদের সঙ্গে লবের যুদ্ধবর্ণনা পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড-রামাশ্বমেধপ্রকরণ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ-ছাড়া অনেক স্থলে তিনি কালিদাসের রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু অনেক বিষয়ে বাল্মীকিকে পরিত্যাগ করেছিলেন—যেমন, নাটকের সমাপ্তিতে সীতার পাতালপ্রবেশ না দেখিয়ে রামসীতার পুনর্মিলনে

কালিদাস 'রঘুবংশম্' রচনায় বাল্মীকিকে অধিকাংশ স্থলেই শিষ্যের মতো অনুসরণ করেছেন। 'উত্তরচরিত'-এর প্রথম অঙ্কে অনেক ঘটনা একস্থানে সন্নিবেশ করা হয়েছে। লঙ্কাবিজয় ও রামাভিষেকের পর রামসীতার চিত্তবিনোদনের জন্য লক্ষ্মণ কর্তৃক চিত্রপ্রদর্শন, পূর্ণগর্ভা সীতার রামের বাহুউপাধানে নিদ্রা, দুর্মুখ নামে গুপ্তচরের কাছ থেকে রামের প্রজাদের দ্বারা গোপনে সীতাপবাদ আলোচনার কথা শ্রবণ এবং অতি বেদনাহত চিত্তে শুধু প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে বনবাস দিতে সিদ্ধান্ত—এই হল প্রথম অঙ্কের ঘটনা। দ্বিতীয় অঙ্ক ('পঞ্চবটী প্রবেশ') সীতা-নির্বাসনের বারো বছর পরে আরম্ভ হয়েছে।

'সীতার বনবাস'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বিদ্যাসাগর 'উত্তর-চরিত'-এর প্রথম অঙ্কের বিষয়বস্তু ভাগ করে সন্নিবেশ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে শুধু আলেখ্যদর্শন বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাম ও সীতার বিশ্রম্ভালাপ, সীতার নিদ্রাকর্ষণ, দুর্মুখ কর্তৃক সীতাপবাদ নিবেদন, রামের বিলাপ এবং সীতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস সত্ত্বেও প্রজা-নুরঞ্জনের জন্য জানকী পরিত্যাগের সঙ্কল্প—এইটুকু হল দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের কাহিনী। 'উত্তরচরিত'-এর প্রথম অঙ্কে আলেখ্যদর্শন থেকে রামের সীতা-পরিত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ পর্যন্ত বর্ণিত হওয়াতে এটি কিছু গুরুভার হয়ে গেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'উত্তরচরিত' অনুবাদে 'উত্তরচরিতম্'-এর প্রথম অঙ্কটিকে দুই দৃশ্যে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন।

নাটক শেষ করেছেন—অবশ্য অলকার শাস্ত্রের নির্দেশ বজায় রাখার জন্য (পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, শেক্সপীয়র বহুস্থল থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও নিজ প্রতিভা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন বলে, আকর-স্থানে থেকে পাওয়া উপাদানকে বদলাবার চেষ্টা করেন নি, কিন্তু ভবভূতি জানতেন যে, কাহিনীর দিক থেকে বাল্মীকিকে অতিক্রম করা অসম্ভব ; তাই তিনি বাল্মীকিকে প্রণাম করে ("ইদং গুরুভ্যঃ পূর্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে'-প্রস্তাবনা। অর্থাৎ এই সমস্ত পূর্ববর্তী গুরুদের প্রণাম করি।) অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে পূর্বসূরীকে পরিত্যাগ করে নতুন পথে যাত্রার চেষ্টা করেছেন। দ্রষ্টব্য : 'বিবিধ-প্রবন্ধ'-১ম (বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ), পৃ. ৩-৪

বিদ্যাসাগর 'উত্তরচরিত'-এর প্রথম অঙ্কের ঘটনা দুই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন, তা আমরা পূর্বে দেখেছি। এই অংশে আলেখ্যদর্শনের চিত্র কিছু সংক্ষিপ্ত হয়েছে। দুর্মুখের কাছ থেকে নিদারুণ সংবাদ শোনার পর তিনি যে বিলাপ করেছেন,[৬১] তাও ভবভূতির রামের চেয়ে সংক্ষিপ্ত, ভাবাবেগ কিছু প্রশমিত। যেমন, 'উত্তরচরিত'-এর—

> "হা দেবি দেবযজনসম্ভবে! হা স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রিতবসুন্ধরে! হা নিমিজনক-বংশনন্দিনি! হা পাবকবশিষ্ঠারুন্ধতীপ্রশস্তশীলশালিনি! হা রামময়জীবিতে! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা প্রিয়স্তোকবাদিনি! কথমেবং বিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ।"

এই সমাসসন্ধিভারমন্থর আবেগাপ্লুত বিলাপোক্তিকে বিদ্যাসাগর খুব সংক্ষেপে অনুবাদ করেছেন :

> "হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়জীবিতে! হা অরণ্যবাস-সহচরি! পরিণামে তোমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নের অগোচর।"[৬২] (বি. র. ৩য়, পৃ. ১৪৫)

---

৬১. বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত' আলোচনা প্রসঙ্গে ভবভূতির রামের অসংযত ও ভাবাবেগব্যাকুল বিলাপের নিন্দা করে বলেছেন, "তাঁহার (অর্থাৎ ভবভূতির রামচরিত্র) চরিত্রে বীর লক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য এবং ধৈর্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। সীতার অপবাদ শুনিয়া ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণস্থল।" (বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, 'বিবিধ প্রবন্ধ', ১ম, পৃ. ১০)

৬২. নানা কারণে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ওপর কিছু বিরূপ ছিলেন, পাঠ্যগ্রন্থ ও অনুবাদগ্রন্থের রচনাকার বলে বোধহয় মনে মনে কিছু তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন। তাই ভবভূতির রামের অসংযত বিলাপ এবং করুণরসের বাড়াবাড়িকে নিন্দা করতে গিয়ে 'সীতার বনবাসে'র ঐ অংশকে একটু খোঁচা দিতে দ্বিধা করেন নি। 'উত্তরচরিতে'র ঐ অংশের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "ইহার অনেকগুলির কথা সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা আর্যবীর্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালি বাবুর

ভবভূতি চরের নাম দিয়েছেন দুর্মুখ, বিদ্যাসাগর এ নাম বজায় রেখেছেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে (উত্তরাকাণ্ড। ৪৩ অধ্যায়। শ্লোক —৪) এবং কালিদাসের 'রঘুবংশে' এই চরের নাম ভদ্র। বিদ্যাসাগর 'উত্তরচরিত'-এর প্রথম অঙ্ক 'সীতার বনবাস'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু দুর্মুখ নাম বদলে নেন নি।

ভবভূতির গুরুগম্ভীর ও উৎকট বাক্যবিন্যাসকে বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাসে' অনেক সহজ করে এনেছেন।[৬৩] অনুবাদ বেশ সুখপাঠ্য— অবশ্য সমাসসন্ধির একটু আধিক্য আছে। বাক্যগুলি অনেক সময়

মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে।" (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম, পৃ. ১৬-১৭) বঙ্কিমচন্দ্রের এ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। বিদ্যাসাগর ভবভূতির অসংযত আবেগকে এবং করুণরসের মত্ত প্রবাহকে অনেকটা সংযত করেছেন। তাঁর রামের বিলাপ পরিসরেও সংক্ষিপ্ত।

৬৩. আগেই বলা হয়েছে, 'উত্তরচরিত'-এর দীর্ঘ বর্ণনাকে তিনি অনেকটা ছোট করে নিয়েছেন। 'উত্তরচরিতে' সীতাপরিত্যাগের পূর্বে ব্যাকুলহৃদয় রাম নিদ্রিতা সীতার চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করে ('সীতায়াঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা) বলেছিলেন, "দেবি! দেবি! অয়ং পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসা পাদপঙ্কজস্পর্শঃ"— দেবি, দেবি, রামের শিরে তোমার চরণকমলের এই শেষ স্পর্শ। এর পর তিনি কাঁদতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর রামের শিরে সীতার পা ঠেকাতে বাঙালীসুলভ দ্বিধায় পড়েছিলেন। তিনি এই অংশের এইভাবে অনুবাদ করেছেন, "এই বলিয়া, গলদশ্রুনয়নে, বিশ্রামভবনে গমনপূর্বক, রাম নিদ্রাভিভূতা সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক ('সীতায়াঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা' নয়), সাতিশয় করুণস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! হতভাগ্য রাম এ জন্মের মত বিদায় লইতেছে।" (বি. র. ৩য়, পৃ. ১৪৬)

মিশ্রধরনের—'শকুন্তলা'র মতো লঘু নয়। এখানে ভবভূতির রচনার পার্শ্বে বিদ্যাসাগরের অনুবাদের নমুনা দেওয়া যাচ্ছে :

উত্তরচরিত :

> "অয়মবিরলানোকহানিবহনিরন্তর স্নিগ্ধনীলপরিসরারণ্য পরিণদ্ধ গোদাবরীমুখরকন্দরঃ সন্ততমভিষ্যন্দমানমেঘদুরিতনীলিমা জনস্থান-মধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণো নাম।" (প্রথম অঙ্ক)

'সীতার বনবাসে' বিদ্যাসাগরের অনুবাদ :

> "এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চারমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপ-সমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়, পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, তরঙ্গবিস্তার করিয়া, প্রবলবেগে গমন করিতেছে।" (বি. র. ৩য়, পৃ. ১৩৯)

এই অনুবাদ সমাসসন্ধির শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে যেমন বাংলাভাষার পদান্বয়ের অনুকূল হয়েছে, তেমনই এর মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যর ক্লাসিক ও রোমান্টিক রীতির চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে।[৬৪] এ অনুবাদ অনেকটা

৬৪. কেউ কেউ এই জটিল বাক্যকে হুবহু অনুবাদ করতে গেছেন। যেমন—"যাহার গহ্বরসমূহ, নিবিড় তরুরাজিপূর্ণ (সুতরাং একেবারে অবকাশরহিত, অর্থাৎ বৃক্ষশ্রেণী এরূপ নিবিড় সন্নিবিষ্ট যে, সূর্যরশ্মি তাহার ভিতরে কোনরূপেই প্রবেশ করিতে পারে না) সুতরাং স্নিগ্ধ এবং শ্যামবর্ণ অরণ্যের প্রান্তভাগে বিস্তৃতা গোদাবরী নদীর ঝর ঝর শব্দে অনুক্ষণ শব্দায়মান হইতেছে, এবং যাহার নীলবর্ণ, অনুক্ষণ শূন্যমার্গে বিচরণশীল জলদরাজি সহযোগে অধিকতর শ্যামলতা ধারণ করিতেছে, এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ নামে গিরি!" ('উত্তর-চরিত'—অনুবাদক, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) এখানে অনুবাদ আক্ষরিক করতে গিয়ে লেখক বাংলা রীতির পদান্বয় গোলমাল করে ফেলেছেন।

এই বাক্যের অনুবাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এইভাবে করেছেন, "এই সেই 'জনস্থান'-অরণ্যের মধ্যবর্তী 'প্রস্রবণ' নামে পর্বত। অরণ্যটি দেখ, কেমন

মৌলিক রচনার মতো রূপ ও রস সৃষ্টি করতে পেরেছে—একে অনুবাদ বলে মনেই হয় না। এই ছত্রগুলি পুরাতন যুগের পাঠকদের নিশ্চয় কণ্ঠস্থ আছে। এই ছত্র কয়টির মধ্য দিয়ে প্রসন্নসলিলা গোদাবরীর তরঙ্গবিস্তারের মতো গদ্যের পংক্তিতে কবিতার ধ্বনি বয়ে চলেছে, কিন্তু গদ্যের অন্বয়বন্ধন কোথাও নষ্ট হয় নি। বাংলা গদ্যের এই দুর্লভ লক্ষণ কিছু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়—বেশীটা রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণতা লাভ করেছে। গদ্যে ছন্দের দোলন (Cadence) এবং ভাবযতি (Sense pause) অব্যাহত রেখে তালে তালে ধ্বনিস্পন্দন সৃষ্টি বিদ্যাসাগরের নিজস্ব স্টাইল। কাজের ভাষা গদ্যেরও যে ছন্দ-তাল আছে, তা তিনিই প্রথম ধরেছিলেন এবং 'কমা' বিরতিচিহ্নের বহুল ব্যবহারে ধ্বনি-সামঞ্জস্য ও অর্থযুক্ত পদান্বয়পদ্ধতি বাঙালীর কানে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। ভবভূতির কয়েকটির চমৎকার ছত্র বিদ্যাসাগরের অনুবাদে নবকলেবর লাভ করেছে। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

১. উত্তরচরিত :

> স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি।
> আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥

(১ম অঙ্ক, ১২শ শ্লোক)

সীতার বনবাস :

> "যদি প্রজালোকের সর্বাঙ্গীণ অনুরঞ্জনের জন্য, আমায় স্নেহ, দয়া বা সুখভোগে বিসর্জন দিতে হয়, অথবা প্রাণপ্রিয়া জানকীর মায়া পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি কিছুমাত্র কাতর হইব না।"
> (বি. র. ৩য়, পৃ. ১৩৭)

স্নিগ্ধ শ্যামল তরুরাজিতে আচ্ছন্ন—অরণ্যের প্রান্তদেশ দিয়ে গোদাবরী নদী কল কল স্বরে প্রবাহিত হচ্ছে। আর, উপরে মেঘের আবির্ভাব হওয়ায় পর্বতের নীলিমা যেন আরও ঘনীভূত হয়েছে।"—উত্তরচরিত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭। অবশ্য এও ঠিক যথার্থ অনুবাদ নয়, অনেকটা ভাবানুবাদের মতো।

২. উত্তরচরিত :

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি॥ (১ম অঙ্ক, ২৫ শ্লোক)

সীতার বনবাস :

"প্রিয়ে! তোমার বাহুলতার স্পর্শে, আমার সর্বশরীরে যেন অমৃত-ধারার বর্ষণ হইতেছে, ইন্দ্রিয়সকল অভূতপূর্ব রসাবেশে অবশ হইয়া আসিতেছে, চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে; অকস্মাৎ আমার নিদ্রাবেশ, কি মোহাবেশ উপস্থিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" (বি. র. ৩য়, পৃ. ১৪২)

৩. উত্তরচরিত :

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়ো
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ॥
(১ম অঙ্ক, ৩৮ শ্লোক)

সীতার বনবাস :

"ফলতঃ, ইনি গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, নয়নের রসাঞ্জনরূপিণী; ইহার স্পর্শ চন্দনরসে অভিষেকস্বরূপ; বাহুলতা, কণ্ঠদেশে বিনিবেশিত হইলে, শীতল মসৃণ মৌক্তিক সরের কার্য করে।" (বি. র. ৩য়, পৃ. ১৪২)

এখানে একটু হাল্কা রসের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে।

৪. উত্তরচরিত :

সীতা—বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা ?
লক্ষ্মণ (সলজ্জস্মিতমপবার্য)—অয়ে উর্মিলাং পৃচ্ছত্যার্যা। ভবতু, অন্যতঃ সঞ্চারয়ামি।

সীতার বনবাস :

> "সীতা বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্যমুখে উর্মিলার দিকে অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস ! এদিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে ? লক্ষ্মণ, কোনও উত্তর না দিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন...।" (বি. র, ৩য়, পৃ. ১৩৮)

এখানে দেবর-ভ্রাতৃবধূর মধুর প্রীতি-নিষিক্ত কৌতুকরস সুন্দর ফুটেছে।[৬৫]

অতঃপর বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পর তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে সর্বশেষ পরিচ্ছেদ (অষ্টম পরিচ্ছেদ) পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড থেকে নিয়েছেন। ঘটনার গতি এইভাবে অগ্রসর হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ—আলেখ্যদর্শন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—চরমুখে সীতাপবাদ শ্রবণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ—ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাম প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতা পরিত্যাগে প্রস্তুত হলেন এবং লক্ষ্মণের প্রতি এই নির্মম কর্মসম্পাদনের আদেশ দিলেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে সীতা লক্ষ্মণ কর্তৃক বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যক্তা হলেন এবং বাল্মীকি পূর্ণগর্ভা সীতাকে আশ্রয় দিলেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে লক্ষ্মণ সীতা বিসর্জনের পর রাজধানীতে ফিরে শোকাহত রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। এদিকে সীতা যথাকালে বাল্মীকির আশ্রমে দুটি যমজ পুত্র প্রসব করলেন, রাজপুত্র লবকুশ ঋষির আশ্রমে ঋষিপুত্রবৎ পালিত হতে লাগল। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের কাহিনী—রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞাভিলাষী হলে স্ত্রী ব্যতিরেকে যজ্ঞ হয় না বলে বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে

৬৫. রবীন্দ্রনাথ এই অংশকে এইভাব অনুবাদ করেছেন : "সীতা কেবল সস্নেহকৌতুকে একটিবার মাত্র তাহার উপরে তর্জনী রাখিয়া দেবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, ইনি কে ?' লক্ষ্মণ লজ্জিত হাস্যে মনে-মনে কহিলেন, 'ওহো, উর্মিলার কথা আর্যা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।' এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জায় সে ছবি ঢাকিয়া ফেলিলেন।" ('প্রাচীন সাহিত্য', রবীন্দ্ররচনাবলী—জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৬৬২।৩৯)

পুনরায় বিবাহ করতে বললেন। কিন্তু রামচন্দ্র এ প্রস্তাবের ঘোরতর প্রতিবাদ করলে সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিমা যজ্ঞস্থলে রাখার সিদ্ধান্ত করা হল। বাল্মীকি এই যজ্ঞে যোগদানের জন্য সীতার পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করলেন। সপ্তম পরিচ্ছেদের কাহিনী—বাল্মীকির নির্দেশে লবকুশ সভাস্থলে ও পথে-ঘাটে রামায়ণ গান করে বেড়াতে লাগল। রাম তাদের গান শুনে সীতাকে স্মরণ করে তাদের প্রতি বাৎসল্যস্নেহে পরিপ্লাবিত হয়ে মনে মনে নানা জল্পনা করতে লাগলেন। অষ্টম পরিচ্ছেদের কাহিনী—অযোধ্যাবাসীরা দীর্ঘদিন পরে সীতা ও তার দুই যমজপুত্রের পরিচয় পেল। কৌশল্যার নির্দেশে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রম থেকে সভামধ্যে আনা হল। সীতার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে অনেকে আনন্দে জয়ধ্বনি করলেও কেউ কেউ পূর্বের মতোই সন্দিহান হয়ে মৌন হয়ে রইল। রামচন্দ্র প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্য, নিজে জানকীর শুদ্ধ চরিত্র সম্বন্ধে অসংশয়চিত্ত হয়েও, তাঁকে পুনরায় সতীত্ব প্রমাণের আদেশ দিলেন। অপমানিতা সীতার সমস্ত আশা-ভরসা নির্মূল হল, তিনি লজ্জা ও অবমাননা সহ্য করতে পারলেন না, এই কথা "শ্রবণমাত্র বজ্রাহতার প্রায় গতচেতনা হইয়া, বাতাহতা লতার ন্যায়" মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। বাল্মীকি পরীক্ষা করে দেখলেন, "সীতা মানব-লীলার সংবরণ" করেছেন। এই হল 'সীতার বনবাস'-এর কাহিনী-সূত্র। এ থেকে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগর তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে মোটামুটি বাল্মীকিকে অনুসরণ করেছেন, প্রায় স্থলেই অবিকল অনুবাদ করেছেন, কিন্তু অক্ষরিক অনুবাদের কৃত্রিমতা ও জড়তা প্রায় কোথাও নেই, কোথাও রসভঙ্গ হয় নি। অবশ্য বাল্মীকির রামের চেয়ে বিদ্যাসাগরের রাম কিছু বেশী ভাবপ্রবণ ও কোমলচিত্ত। আবেগের কারণ ঘটলেই তিনি কেঁদে ফেলেন। যেখানে বিদ্যাসাগরের রাম জানকীকে বিসর্জন দিতে হবে জেনে দীর্ঘ বিলাপ করেছেন (ভবভূতির রামও প্রায় এই রকম), সেখানে বাল্মীকির রাম সীতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হয়েও শুধু প্রজাদের রটনা থেকে নিজেকে এবং ইক্ষ্বাকুবংশকে রক্ষা করবার

জন্যই লক্ষ্মণকে মর্মান্তিক আদেশ দিলেন—কান্নাকাটি কিছুই করলেন না। নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দিলেও নিজেকে সংযত করে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন :

স বিবেশ স ধর্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
শোকসংবিগ্নহৃদয়ো নিশশ্বাস যথা দ্বিপঃ॥

(উত্তরাকাণ্ড, ৪৫ সর্গ, ২৫ শ্লোক)

অনু: তখন তিনি ভাইদের সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। ঐ সময়ে তাঁর হৃদয় শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠল, তিনি হস্তীর মতো নিশ্বাস পরিত্যাগ করতে লাগলেন।

এ বর্ণনা ক্ষত্রিয়কুলপ্রদীপ মহাবীর্যবান রামচন্দ্রের বীরোচিত শোককে পবিত্র সাত্ত্বিকভাবে মণ্ডিত করেছে। বিদ্যাসাগর অবশ্য করুণ-রসোদ্রেকের জন্যই 'সীতার বনবাস' রচনা করেছিলেন। উপরন্তু তিনি স্বভাবতঃ মানুষের দুঃখশোক সহ্য করতে পারতেন না। রামচন্দ্রের সীতাবিসর্জনের দুঃখ তাঁর মতো হৃদয় দিয়ে কে বুঝতে সক্ষম? তাই তাঁর রামচরিত্র বাল্মীকির চেয়ে কিছু রোদনপরবশ হয়ে গেছে তা অস্বীকার করা যায় না।[৬৬] অবশ্য সে যুগের পাঠক-পাঠিকাসমাজে এই করুণরসের উচ্ছ্বাস বিশেষভাবেই চিত্তাকর্ষী হয়েছিল। রামের বেদনা ও বিলাপের সঙ্গে সেকালের পাঠকেরা একাত্ম হয়ে উঠতেন, রাম ও সীতার দুঃখে তাঁরাও অশ্রুপাত করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতেন।[৬৭] অবশ্য কেউ কেউ 'সীতার বনবাস'-এর করুণ রসের বাড়া-

৬৬. সুবলচন্দ্র মিত্র বলেছেন, "মহর্ষি-চিত্রিত ও বিদ্যাসাগর-চিত্রিত রামচরিত্রে কিঞ্চিৎ অসাদৃশ্য আছে। বাল্মীকির রাম ধৈর্যশীল এবং সংযত-স্বভাব। কিন্তু বিদ্যাসাগরের রাম কিছু কোমলপ্রকৃতি ও সহজেই আত্মহারা।" (সুবলচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'সীতার বনবাস', ভূমিকা, পৃ. ১॥৶০-১৸০)

৬৭. সে যুগের শিক্ষিত ও বিদ্যাসাগরের অনুরাগী পাঠকের মতের প্রতিধ্বনি করে রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছেন, "ঐ পুস্তকের ('সীতার বনবাস') প্রথমাংশ ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিতের প্রায় অবিকল অনুবাদ, কিন্তু অপর সমুদয়ভাগ

বাড়িকে অতটা বরদাস্ত করতে পারতেন না।[৬৮] গ্রন্থসমাপ্তিতে সীতার পরিণাম বর্ণনায় বিদ্যাসাগর বাল্মীকির অনুসরণ করেন নি বলে কেউ কেউ তাঁর রচনার কিছু প্রতিকূল সমালোচনাও করেছিলেন। বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের সপ্তনবতিতম সর্গে সীতার পরিণাম এইভাবে বর্ণিত হয়েছে : যজ্ঞভূমিতে লবকুশের রামায়ণ গান শুনে রামচন্দ্রাদি বুঝতে পারলেন যে, এরা সীতা ও রামের আত্মজ। রামচন্দ্র বাল্মীকির কাছে এই অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন যে, সীতা সভামধ্যে নিজের চারিত্রবিশুদ্ধির প্রমাণ দিতে সম্মত হলে রামচন্দ্রের কলঙ্ক দূর হয়, তিনি তা হলে সানন্দে এবং সগৌরবে সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারেন। বাল্মীকি তাতে সম্মতি দিলেন (৯৫ সর্গ)। পরদিন প্রভাতে সীতার

কেবল নূতনরূপ রচনাই নহে, উহাতে যে কি মধুর, কি চমৎকারজনক ও কি অলৌকিক কাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। বোধ হয় উহাতে এমন একটি ছত্রও নাই যাহা পাঠ করিতে পাষাণেরও হৃদয় দ্রব না হয়। করুণরসের উদ্দীপনে বিদ্যাসাগরের যে কি অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা এক সীতার বনবাসেই পর্যাপ্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।" ('বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব', তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৪৬)

৬৮. নানা কারণে, বিধবাবিবাহের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন ছিলেন। 'উত্তরচরিত' আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি 'সীতার বনবাস'-কে অযথা নিন্দা করেছেন। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতে, বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতার বনবাস'-কে "কান্নার জোলাপ" বলতেন (দ্রঃ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', নতুন মুদ্রণ, পৃ. ৪৫)। কৃষ্ণকমলের সাক্ষ্য অনুসারে, "একদিন বঙ্কিম আমাকে বলিলেন, 'বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ কোরে বাংলা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে গেছেন।" (পু. প্র. পৃ. ৪৬) বঙ্কিম একথা সত্যই বলেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু একবার তিনি প্রকাশ্য প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন—"বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" (বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিবিধ, পৃ. ১৪২)

শপথ দেখবার জন্য সভাস্থলে বহুজন সমবেত হল। সর্বসমক্ষে প্রচেতার দশমপুত্র মহাপুণ্যবান বাল্মীকি সীতার অপাপবিদ্ধ সচ্চরিত্রের কথা ঘোষণা করলেন। রামচন্দ্র বললেন যে, সীতার পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তবে "শুদ্ধায়াং জগতোমধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে।" জনসমাজে বৈদেহী সীতার বিশুদ্ধি প্রমাণিত হলে তাঁর আরও আনন্দ হবে। তখন "সীতা কাষায়বাসিনী অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধো-দৃষ্টির-বাঙ্‌মুখী"—কাষায়বস্ত্রধারিণী অধোমুখী সীতা কৃতাঞ্জলি হয়ে বলতে লাগলেন ঃ

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

(উত্তরাকাণ্ড, ৯৭সর্গ, ১৪-১৫ শ্লোক)

যদি রাম ভিন্ন আর কোন পুরুষকে মনেও না চিন্তা করে থাকি, তা হলে মা ধরিত্রী আমাকে তাঁর জঠরে ঠাঁই দিন। যদি কায়মনোবাক্যে রামের অর্চনা করে থাকি তা হলে মা ধরিত্রী আমাকে তাঁর জঠরে ঠাঁই দিন।

তিনি এইভাবে শপথ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভূতল বিদীর্ণ করে এক দিব্যরত্ন-বিভূষিত রথকে শিরে ধারণ করে নাগগণ সেখানে আবির্ভূত হল এবং—

তস্মিংস্তু ধরণীদেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ॥ ১৯॥
তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলম্।
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ॥ ২০॥

* * *

সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মুহূর্তমিবাত্যর্থং সর্বং সম্মোহিতং জগৎ॥ ২৬॥

(উত্তরাকাণ্ড, ৯৭ সর্গ)

ধরিত্রীদেবী দু'হাত দিয়ে মৈথিলীকে গ্রহণ করে স্বাগত সম্ভাষণের দ্বারা অভিনন্দিত করলেন এবং আসনে বসালেন। সেই আসনে বসে সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করতে দেখে স্বর্গ থেকে তাঁর ওপর অবিরল ভাবে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।....সীতার পাতাল প্রবেশ দেখে সেখানে সমাগত সকলে এবং সমগ্র জগৎ যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ল। রামচন্দ্র হতবুদ্ধি হয়ে এই দৃশ্য দেখলেন এবং আত্মবিস্মৃত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন, কখনও ক্রুদ্ধ হয়ে সমগ্র ধরণী বিনাশে উদ্যত হলেন। তখন ব্রহ্মা এসে তাঁকে বোঝালেন, তাঁর এত বিচলিত হওয়া উচিত নয়, তিনি 'জন্মবৈষ্ণব'—অর্থাৎ বিষ্ণুর অংশে জন্ম নিয়েছেন। তাঁকে মানব-লীলা সংবরণ করে যথাস্থানে ফিরে যেতে হবে। তাঁর পূর্বেই সতী সাধ্বী সীতা নাগলোকে গেছেন, "স্বর্গে তে সঙ্গমো ভূয়ো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।"—স্বর্গে তাঁদের পুনর্মিলন হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্রহ্মা এই গোপন রহস্য ফাঁস করে দিলেও রামচন্দ্র সীতার বিরহে চারিদিক শূন্য দেখতে লাগলেন এবং "শোকেন পরমায়স্তো ন শান্তং মনসাগমৎ"—শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন এবং অন্তরে কিছুমাত্র শান্তি লাভ করতে পারলেন না।

এখানে দেখা যাচ্ছে, রামচন্দ্র সীতাকে পরমপবিত্রা জেনেও শুধু লোক-নিন্দা থেকে নিজেকে এবং নিজ রাজকুলকে বাঁচাবার জন্য তাঁকে চারিত্রবিশুদ্ধিজ্ঞাপক শপথ গ্রহণ করতে বলেছিলেন। সভাস্থলে প্রতিকূল ও সন্দিহান প্রজাদের মৌন অসম্মতির কোন উল্লেখ বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায় না। বরং শপথগ্রহণাভিলাষিণী সীতাকে সভামধ্যে দেখে বিশাল জনতা শোকে-দুঃখে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল (উত্তরাকাণ্ড, ৯৬ সর্গ, ১৩ শ্লোক)। জনতার মধ্যে কেউ রামের, কেউ সীতার, কেউ-বা উভয়ের গুণকীর্তন ও সাধুবাদ দিতে লাগলেন (ঐ, ১৪ শ্লোক)।

ভবভূতি কিন্তু 'উত্তরচরিতে' এই দৃশ্যটি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে একটা জটিল নাটকীয় পরিস্থিতির সাহায্য নিয়েছেন। সপ্তম অঙ্কে, বাল্মীকির

নির্দেশে সীতার শেষ পরিণাম অভিনয় করে দেখান হল, রামচন্দ্র সীতার পাতালপ্রবেশের অভিনয় দেখে তাকে সত্য মনে করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তখন আসল সীতাকে এনে রামচন্দ্রের চৈতন্য সম্পাদন করা হল। ভগবতী অরুন্ধতী, অযোধ্যার জনসাধারণকে সাধ্বী সীতার চরিত্রে সন্দেহ করার জন্য, খুব ভৎর্সনা করলেন, সপ্তর্ষিগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন, রামের দুঃখের রাত্রি প্রভাত হল, তিনি পত্নী ও পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হলেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দেশের জন্য ভবভূতি সীতার পাতালপ্রবেশের শোকাবহ ঘটনায় নাটক শেষ করতে পারেন নি। অলঙ্কারশাস্ত্রের মর্যাদা (সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রমতে নাটকে উপসংহার অশুভজনক হতে পারবে না, সব সময়ে মিলনে নাটক পরিসমাপ্ত করতে হবে) রাখতে গিয়ে ভবভূতি আদিকবিকে পরিত্যাগ করেছেন। এর চেয়ে 'সিদ্ধরসে'র গুরুতর ব্যতিক্রম আর কী হতে পারে?

এখন দেখা যাক, বিদ্যাসাগর কিভাবে সীতার পরিণাম বর্ণনা করেছেন। 'সীতার বনবাসে' বাল্মীকি রামচন্দ্রকে পরমপবিত্রা সীতাগ্রহণে অনুরোধ করলেন। রামচন্দ্র বললেন যে, সীতা যে সতীসাধ্বী তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, এবং বিনা অপরাধে সীতাকে বিসর্জন দিয়ে তিনি যে "নৃশংস আচরণ" করেছেন এবং তার ফলে অধর্মগ্রস্ত হয়েছেন, তাতেও তাঁর সন্দেহ নেই। কিন্তু সন্দিগ্ধ প্রজাদের সন্দেহ দূর না হলে তিনি সীতাকে কি করে গ্রহণ করবেন? তাই বাল্মীকিকে অনুরোধ করলেন, "ভগবন্, আপনকার নিকটে আমার প্রার্থনা এই, সীতা উপস্থিত হইলে আপনি তাঁহারে আপন সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে লইয়া যাইবেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহার পরিগ্রহ বিষয়ে সকলের সম্মতি জিজ্ঞাসিবেন। যদি তাঁহার পরিগ্রহ সর্বসম্মত হয়, তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিব। সর্বসম্মত না হইলে, তাঁহাকে কোন অসন্দিগ্ধ প্রমাণ দ্বারা, প্রজাবর্গের সন্দেহ নিরাকরণ করিতে হইবেক।" (বি. র. ৩য়, পৃ. ১৮৭)

যথাকালে সীতাকে সভামধ্যে আনা হল। সীতা পুনর্বার শ্রীরামের ধর্মপত্নী বলে গৃহীত হবেন জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ভাবলেন, এতদিনে তাঁর দুঃখ বুঝি শেষ হল। বাল্মীকি সীতাকে সভামধ্যে নিয়ে এসে সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন :

> "এই সভায় নানাদেশীয় নরপতিগণ, কোশলরাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজাগণ, এবং অপরাপর সহস্র সহস্র পৌরবর্গ ও জানপদগণ সমবেত হইয়াছে ; তোমরা সকলেই অবগত আছ, রাজা রামচন্দ্র, অমূলক লোকাপবাদ শ্রবণে চলচিত্ত হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধে, জানকীরে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন ; এক্ষণে তোমাদের সকলের নিকট আমার অনুরোধ এই, তাঁহার পরিগ্রহ বিষয়ে তোমরা প্রশস্তমনে অনুমোদন প্রদর্শন কর ; জানকী যে সম্পূর্ণ শুদ্ধাচারিণী, সে বিষয়ে মনুষ্যমাত্রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।"
>
> (বি. রি. ৩য়, পৃ. ১৮৯)

তাঁর কথা শুনে সভা কোলাহলে মুখরিত হল। সমবেত রাজারা, প্রধান অমাত্য ও বিশিষ্ট প্রজারা সসম্ভ্রমে নিবেদন করলেন :

> "আমরা অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, রাজা রামচন্দ্র সীতাদেবীরে পুনরায় গ্রহণ করিলে, আমরা যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিব।" কিন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত লোক, অবনত বদনে, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল।" (ঐ. পৃ. ১৮৯)

রামচন্দ্র ও বাল্মীকি তখন বুঝতে পারলেন যে, "সীতাপরিগ্রহবিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সম্মতি নাই।" এতে রামচন্দ্র ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন, বাল্মীকিও হতোৎসাহ হয়ে বাধ্য হয়ে সীতাকে বললেন, "বৎসে জানকি! তোমার চরিত্রবিষয়ে প্রজালোকের মনে যে সংশয় জন্মিয়া আছে, অদ্যাপি তাহা অপনীত হয় নাই ; অতএব তুমি, কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া সকলের অন্তঃকরণ হইতে সেই সংশয়ের অপসারণ কর।" কিন্তু সীতা এ ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এই আদেশ শ্রবণমাত্র বজ্রাহতার প্রায় গতচেতনা হইয়া, বাতাহত লতার ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন।" রামচন্দ্রও মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বাল্মীকি সীতার

চেতনা আনার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন, "কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াস বিফল হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরেই, বুঝিতে পারিলেন, সীতা মানব-লীলা সংবরণ করিয়াছেন।" (বি. র. ৩য়, পৃ. ১৯০)

এখানে দেখা যাচ্ছে, মূল রামায়ণে সীতার পাতালপ্রবেশের যে বর্ণনা আছে, বিদ্যাসাগর তাকে অনৈসর্গিক বোধে পরিত্যাগ করে, দারুণ মানসিক আঘাতের ফলে সীতার স্বাভাবিক মৃত্যুই বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ[৬৯] বিদ্যাসাগরের এই নতুন বর্ণনা সম্পূর্ণ মানবিক ও স্বাভাবিক বলে স্বীকার করেছেন। কেউ-বা মনে করেন[৭০] এতে বাল্মীকির সীতার চেয়ে বিদ্যাসাগরের সীতা কিছু নীচু হয়ে গেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর রচনায় সাধ্যমতো অলৌকিক-অনৈসর্গিক বর্ণনা

৬৯. "এরূপ ঘটনা অস্বাভাবিক নহে। দ্বাদশ বৎসর বিচ্ছেদ-সন্তাপে সীতাদেবীর শরীর অস্থিচর্মসার হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর সভামধ্যে পুনরায় পরীক্ষা প্রদানের কথায় তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল।...এই ভাবিয়া তাঁহার মনে দারুণ অভিমানের সঞ্চার হইল। অভিমান আর কাহারও প্রতি নহে; তিনি অন্যের প্রতি ক্রোধ বা অভিমান করিতে জানিতেন না, সুতরাং আপনারই প্রতি—আপনার দুরদৃষ্টের প্রতি অভিমান করিলেন; তাঁহার বিরহক্লিষ্ট দুর্বল হৃদয় এই দুর্দম্য অভিমানের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ বর্ণনা অতি স্বাভাবিক হইয়াছে এবং ইহাতে সীতাদেবীর চরিত্রের উজ্জ্বলতা বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি কমে নাই।"—ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সীতার বনবাস'-এর ভূমিকা

৭০. "বিদ্যাসাগর মহাশয় সীতাকে সভামধ্যে পরীক্ষা প্রদানে অসমর্থা করিয়া যেন তাঁহাকে বাল্মীকি-চিত্রিতা সীতা অপেক্ষা কিছু নিম্নে স্থাপিত করিয়াছেন।... সীতার সতীত্বের এই জলন্ত দৃষ্টান্তের স্থল মূল রামায়ণে যেরূপ বর্ণিত আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন রূপ করিয়া সীতা-চরিত্রের মধ্যে যেন অল্পমাত্র খুঁৎ রাখিয়া দিয়াছেন।"—সুবলচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'সীতার বনবাস'-এর ভূমিকা

পরিত্যাগ করতে চাইতেন। এ বিষয়ে তাঁর মন অতিশয় আধুনিক ও বিজ্ঞানচেতন ছিল। তাই সীতার পাতালপ্রবেশের অলৌকিক বর্ণনা পরিত্যাগ করে তিনি অপমানিত ও শোকাহত জনকদুহিতার স্বাভাবিক মৃত্যু বর্ণনা করেছেন। যাঁরা মনে করেন, আদিকবির বর্ণনাকে পরিত্যাগ করার অধিকার কারও নেই, তাঁরা 'উত্তরচরিত'-এর সপ্তম অঙ্ক পরিপাক করেন কি করে? সেখানে তো রামায়ণের মৌলিক ঘটনাকেই অস্বীকার করা হয়েছে। সে যাই হোক, মূল রামায়ণকে অবলম্বন করে বিদ্যাসাগর অনেক বর্ণনা বাদ দিয়ে সীতার শোচনীয় পরিণাম বর্ণনা করেছিলেন বলে 'সীতার বনবাস'-এর সমাপ্তি নাটকীয় চমৎকারিত্বে পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু অতিনাটকীয় হয়ে রসহানি ঘটায় নি। এই শোকাবহ কাহিনী স্বতঃই পাঠকমনে বেদনা সৃষ্টি করে, তার ওপর বিদ্যাসাগরের করুণরসবর্ষী লেখনীর স্পর্শ—এইজন্য করুণরসের গদ্য-আখ্যান হিসেবে এ গ্রন্থ চিরদিন বাংলাভাষী সমাজে আদরণীয় হয়ে থাকবে।

অবশ্য মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের লেখনী করুণরসের ক্ষেত্রে কখনও কখনও উদ্দাম হয়ে উঠত বটে, কিন্তু সীতার তিরোধান বর্ণনার সময় তিনি ট্র্যাজেডির সংযম রক্ষা করেছেন। সীতার মৃত্যুটি শুধু ছোট একটি ছত্রে বর্ণিত হয়েছে—'সীতা মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।" দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক হলে এই প্রসঙ্গে অনেক হা-হুতাশ প্রকাশ করতেন। সর্বশেষ অনুচ্ছেদে তিনি সীতাচরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এই ভাবে গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন, "তাঁহার তুল্য সর্বগুণসম্পন্না কামিনী কোনও কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।" সীতা শুধু 'সর্বগুণসম্পন্না কামিনী' হলে বিদ্যাসাগর হয়তো এ কাহিনী লিখতে উৎসাহিত হতেন না, তাঁর মতো কোন নারী দুঃখভোগ করেন নি বলেই জনমদুঃখিনী সীতার পূত চরিত্রকথা এবং শোকাহত পরিণাম বর্ণনা করেছেন। বাস্তবে মানুষের দুঃখ তিনি সহ্য করতে পারতেন না, সাহিত্যের বেদনার কাহিনীও

তাঁকে খুব গভীরভাবে বিচলিত করত, 'সীতার বনবাস'ই তার দৃষ্টান্তস্থল।

এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় থেকে বিদ্যাসাগর মূল রামায়ণের কাহিনী সংক্ষেপে অনুসরণ করেছেন, তা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। উত্তরাকাণ্ডের ৪৩শ সর্গে রামচন্দ্র ভদ্র নামে গুপ্তচরের মুখে সীতার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে অযোধ্যাবাসীদের জল্পনা শুনলেন। এর পর ৯৮তম সর্গ পর্যন্ত সীতার বর্ণনা চলেছে। ৯৭তম সর্গে সীতার পাতালপ্রবেশ এবং ৯৮তম সর্গে ব্যাকুল রামচন্দ্রকে ব্রহ্মা সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর যথার্থ পরিচয় বুঝিয়ে দিলেন। 'সীতার বনবাস'-এর প্রথম দুই অধ্যায়ে 'উত্তরচরিতে'-এর কাহিনী সংক্ষেপে গৃহীত হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে (সীতার অপবাদ শুনে রামচন্দ্রের ভাইদের সঙ্গে মন্ত্রণা এবং লক্ষ্মণকে সীতানির্বাসনে নিয়োগ) রামায়ণের ৪৩-৪৫ সর্গ, চতুর্থ পরিচ্ছেদে (লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার তপোবন দর্শনে যাত্রা, বাল্মীকির আশ্রমে সীতার আশ্রয় লাভ) রামায়ণের ৪৬-৪৯ সর্গ, পঞ্চম পরিচ্ছেদে (সীতার বনবাসে রামচন্দ্রের বিলাপ, লক্ষ্মণ কর্তৃক সান্ত্বনাদান, বাল্মীকির আশ্রমে সীতার দুইটি যমজ পুত্র প্রসব, লব-কুশের ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্তি) রামায়ণের ৫২ ও ৬৬ সর্গের কাহিনী অনুসৃত হয়েছে। মূল রামায়ণে এর মাঝের সর্গগুলিতে যে সমস্ত কথাকাহিনী আছে, মূল ঘটনার সঙ্গে তার ততটা যোগ নেই বলে বিদ্যাসাগর এ কাহিনীগুলিকে পরিত্যাগ করেছেন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে (রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ, বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্রের অনুজদের অনুমোদন, স্ত্রী ব্যতিরেকে যজ্ঞানুষ্ঠান নিষ্ফল বলে বশিষ্ঠ কর্তৃক রামচন্দ্রকে পুনরায় বিবাহের নির্দেশ দান, সীতাগতপ্রাণ রামচন্দ্রের সে প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি, আসল সীতার পরিবর্তে স্বর্ণসীতাকে যজ্ঞস্থলে স্থাপন, যজ্ঞে মুনিঋষি ও রাজাদের আগমন, আমন্ত্রিত বাল্মীকি মনে করলেন—এই সুযোগে তিনি অনুরোধ করলে সীতা ও লবকুশকে রাম সর্বসমক্ষে গ্রহণ করবেন, বাল্মীকি কুমারদ্বয়ের সঙ্গে যজ্ঞসত্রে এলেন, লবকুশ রামচরিত গান করে প্রচুর প্রশংসা পেল) রামায়ণের

৮৪, ৯১, ৯২-৯৪ সর্গের কাহিনী, সপ্তম পরিচ্ছেদে (বাল্মীকির নির্দেশে লব-কুশ কর্তৃক রামচন্দ্রের নিকটে রামায়ণগান, তাদের দেখে রামের মনে বাৎসল্যরসের উৎপত্তি, চিত্তচাঞ্চল্য এবং লোকাপবাদ তুচ্ছ করে সীতাকে পুনর্গ্রহণ করার সঙ্কল্প) রামায়ণের ৯৫ অধ্যায় এবং অষ্টম পরিচ্ছেদে (রামের সভায় সর্বজনসমক্ষে বাল্মীকির শিষ্য লব-কুশের পুনরায় রামায়ণ গান, তাদের রাম-সীতার পুত্র বলে কৌশল্যার দৃঢ় প্রত্যয়, অন্য সকলেরও সেইরূপ বিশ্বাস, বাল্মীকি কর্তৃক এদের যথার্থ পরিচয় দান, সীতাকে আনবার জন্য কৌশল্যার ব্যাকুলতা, বাল্মীকি কর্তৃক সীতার বিশুদ্ধি ঘোষণা, তাঁর আশ্রম থেকে সীতাকে আনয়ন, দু'একজন ছাড়া উপস্থিত সকলেই সীতা গ্রহণে বিশেষ উৎসাহী, কিন্তু দু'একজনের মৌন অবলম্বন, সীতাকে কোন শপথ গ্রহণের জন্য বাল্মীকির অনুরোধ, অপমানিতা সীতার এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদে মূর্চ্ছা ও পতন, বাল্মীকি কর্তৃক তাঁর মৃত্যু ঘোষণা) রামায়ণের ৯৬ ও ৯৭ সর্গের ঘটনা সংক্ষেপে অনুসৃত হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, বিদ্যাসাগর মূল রামায়ণের অপ্রাসঙ্গিক ও আদিরসের আখ্যান 'সীতার বনবাসে' সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। যেমন—রাজা নৃগের গল্প, বশিষ্ঠ ও রাজা নিমির কাহিনী, উর্বশীকে দেখে বরুণের বৈক্লব্য, যযাতির কাহিনী[৭১], লবণাসুরের পরাজয়কাহিনী এবং শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণবধ, কল্মষপাদের কাহিনী, শম্বুক বধের কাহিনী। এগুলি তিনি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। তিনি রামায়ণের কোন কোন সুদীর্ঘ বর্ণনা নিজ গ্রন্থে অনেক সঙ্কুচিত করেছেন, কোথাও-বা বর্ণনাকে কল্পনার দ্বারা কিছু বর্ধিত করেছেন। উল্লিখিত কাহিনীগুলি তিনি পরিত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু সীতাকে বনবাস দিয়ে সীতাবিরহে এবং লবকুশের পরিচয় পেয়ে রামচন্দ্রের বিলাপ মূল রামায়ণে দু'চার কথায় সারা হয়েছে; করুণরস সৃষ্টির জন্য এই অংশগুলি বিদ্যাসাগর অনেক বাড়িয়েছেন। খানিকটা ভবভূতির

৭১. কারও কারও মতে শ্রীরামচন্দ্র ও কুকুর এবং গৃধ্র ও উলূকের কাহিনী মূল রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

প্রভাবে, কিছুটা করুণরসের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতার জন্য 'সীতার বনবাসে' রামের বিলাপে একটু আতিশয্যদোষ ঘটেছে। আদিকবি বাল্মীকি মহাকাব্য লিখতে বসে ভাবাবেগকে সংযত করে কাহিনীর প্রবাহের দিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। 'সীতার বনবাস'-এর সপ্তম পরিচ্ছেদে লবকুশকে সীতার পুত্র জেনে এবং সীতার প্রতি নির্মম ব্যবহারের জন্য রামচন্দ্র প্রচুর বিলাপ করেছেন। কিন্তু বাল্মীকির রামচন্দ্র (৯৫ সর্গ) বিলাপে বিহ্বল না হয়ে বাল্মীকিকে সীতার শপথ গ্রহণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে বলেছেন। আসল কথা বিদ্যাসাগর কোন অনুবাদ-গ্রন্থেই অবিকল অনুবাদের রীতি অনুসরণ করেন নি। সীতার শোচনীয় অবসান বর্ণনা করার জন্য তিনি যে গদ্য-আখ্যায়িকা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাতে প্রয়োজনের অনুরোধে তিনি কোন কোন স্থলে করুণরসের একটু বেশী স্থান দিয়েছেন।

'সীতার বনবাস' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকসমাজে দ্রুত প্রচারলাভ করে, ছাত্রদের পাঠ্যগ্রন্থরূপেও সারা বাংলাদেশে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর নাট্যাভিনয়ও হয়েছিল।[৭২] সে যুগে এই গ্রন্থ রচনার জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর গুণগ্রাহীরা তাঁকে সোনার কলম উপহার

---

৭২. উমেশচন্দ্র মিত্র 'সীতার বনবাস'-এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। এটি ১৮৬৬ সালের জুনমাসে ভবানীপুরের নীলমণি মিত্রের বাড়ীতে অভিনীত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষও ১২৮৮ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে 'সীতার বনবাস' নামে যে নাটক রচনা করেন, তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরে আখ্যানের কোন সংযোগ নেই। এতে নাট্যকার দেখিয়েছেন যে, সীতার চরিত্রে রামচন্দ্রের প্রকৃত অবিশ্বাস জন্মেছিল। এমন কি, তিনি কলঙ্কিনী সীতাকে বধ করবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন :

শুন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ,
দুষ্টা নারী সীতা……
নাহি জানি কি হেতু রমণীবধে মানা,
কলঙ্কিনী বধিলে কি দোষ ? (১ম অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

গিরিশচন্দ্র যথারীতি সীতার পাতালপ্রবেশ বর্ণনা করেছেন। ১৩২০ সনে বেণীমাধব চাকী 'সীতানির্বাসন' নামে যে নাটক লিখেছিলেন, তা গিরিশচন্দ্রের ছায়াবলম্বনে রচিত।

দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি।[৭৩] তাতে কোন দুঃখ নেই। সোনার দাম বাজারে বাড়ে কমে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এ গ্রন্থের মূল্যের কোনও দিন কোন তারতম্য হবে না। 'সীতার বনবাস' বাঙালীর মনকে চিরদিন বেদনা-রসে অভিষিক্ত করবে।

'সীতার বনবাস'-এর ভাষা একটু গুরুভার ও সমাসবদ্ধ, জটিল বাক্যের সংখ্যাও বেশী। এখানে এ ধরনের গুটিকয়েক শব্দের উল্লেখ করা যাচ্ছে : অনুরঞ্জনানুরোধে, অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না, আত্মস্বরূপ পরিজ্ঞান, কঙ্কালমাত্রাবশিষ্টা, গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্তী, চিত্রার্পিতপ্রায়, নির্মলসলিল-কণাবাহী, লোকবিরাগসংগ্রহভয়ে, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্র, সকলভুবন-প্রকাশন, সদসৎপরিবেদনা, হরশরাসনভঙ্গবার্তা ইত্যাদি। এ ধরনের সমস্ত-পদের সংখ্যা কিছু বেশী হলেও এর বাক্যরীতি অতি পরিচ্ছন্ন, সংযত এবং ইংরেজীতে যাকে balanced prose বলে, এগদ্য সে ধরনের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এ বিষয়ে বলেছেন, "সীতার বনবাস প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ধারণা হয় যে,তিনি নিশ্চয়ই শক্ত শক্ত সংস্কৃত কথা ভালবাসিতেন, এবং রচনাও সেই প্রকার শব্দে গঠিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার উপরে আপনার style গঠিত করিয়াছিলেন, তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা নহে; সেই সময়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, সেই ভাষাই বিদ্যাসাগরের ভাষার বনিয়াদ" * (পুরাতন প্রসঙ্গ, নতুন সংস্করণ, পৃ, ২৮)।

৮.

১৮৬৯ সালের একেবারে শেষের দিকে শেক্সপীয়রের *The Comedy of Errors* অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের

৭৩. রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৪৬

* পরে সপ্তম অধ্যায়ে তাঁর এ অভিমত আলোচিত হয়েছে।

প্রকাশিত হয়।)এর পূর্বে তিনি অনেকগুলি ইংরেজী স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের অনুবাদ করে ইংরেজী ভাষায় দক্ষতার রীতিমতো প্রমাণ দিয়েছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারের কর্মে নিযুক্ত হয়ে প্রয়োজনের অনুরোধে তিনি উত্তমরূপে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করতে অগ্রসর হন এবং ইংরেজীনবিশ বন্ধু-বান্ধব ও শিক্ষকের সাহায্যে অতি অল্পকালের মধ্যেই ইংরেজী ভাষা অধিগত করেন। ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শন তাঁকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময়ে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে তিনি কিছু কিছু ইংরেজী পড়েছিলেন। পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হয়ে নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ গুপ্ত (হিন্দু কলেজের ছাত্র) এবং শোভাবাজারের রাজবাড়ীর আনন্দকৃষ্ণ বসু (রাধাকান্ত দেববাহাদুরের দৌহিত্র), অমৃতলাল মিত্র (রাধাকান্তের মধ্যম জামাতা) এবং শ্রীনাথ ঘোষের (কনিষ্ঠ জামাতা) কাছে অঙ্ক ও ইংরেজী শিখতে তিনি প্রত্যহ রাত্রে এঁদের কাছে যাতায়াত করতেন সে কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এঁরা সকলেই হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র এবং ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। অঙ্ক শাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের বিশেষ আকর্ষণ ছিল না, অল্প দিনের মধ্যে অঙ্ক শেখায় ইস্তফা দিয়ে তিনি আনন্দকৃষ্ণ বসুর কাছে খুব মনোযোগ দিয়ে শেক্সপীয়র পড়েছিলেন। আনন্দকৃষ্ণ বলেছেন, "মাস পাঁচ ছয় পরে বিদ্যাসাগর অঙ্কবিদ্যা পরিত্যাগ করেন। ইহাতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। অতঃপর তিনি শেক্সপীয়র পড়িতেন। ইহা শীঘ্রই আয়ত্ত করিয়াছিলেন।"[৭৩] তাঁর ইংরেজী রচনা দেখে সিভিলিয়ান সাহেবেরাও প্রশংসা করতেন।[৭৪] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কথাবার্তায় তিনি সর্বদা স্কট, শেক্সপীয়র, মিলটন, টিণ্ডেল, মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি ইংরেজ ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার ও দার্শনিকদের গ্রন্থের প্রসঙ্গ ও তত্ত্বকথা আলোচনা করতেন।[৭৫]

৭৩. বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃ. ১২০-১২৩
৭৪. ঐ, পৃ. ২০১
৭৫. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, পৃ. ১৯১

শেক্সপীয়রের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। কৃতী ছাত্র ছাত্রীকে তিনি শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী পুরস্কার দিতেন।

প্রত্যহ মাত্র পনের মিনিট লেখা ব্যয় করে পনের দিনে মধ্যে *The Comedy of Errors* অবলম্বনে বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্তিবিলাস' রচনা শেষ করেন।[৭৬] পরিহাসমুখর শেক্সপীয়রীয় কমেডিকে বাংলা আখ্যানে রূপান্তরিত করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তাঁর পূর্বে চার্লস ও ম্যারি ল্যাম্ব *Tales from Shakespeare*[৭৭] রচনা করেছিলেন (১৮০৭)। ইংরেজী নাটককে ইংরেজী আখ্যানে পরিবর্তিত করা এমন কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়। কিন্তু বিদেশী ঘটনা, অজানা নাম, অপরিচিত চরিত্র, বিচিত্র আচারব্যবহার যে-নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাকে বাংলা দেশের সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে তোলা বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচায়ক। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শেক্সপীয়রের নাটক অধ্যয়ন না করলে কখনও এমন অবলীলাক্রমে স্ট্রাফোর্ড-বাসী কবিকে ভারতীয় পরিচ্ছদ দিতে পারতেন না। 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' বা 'উত্তরচরিত'-এর বাংলা গদ্যানুবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ গ্রন্থ দুটি প্রাচীন যুগের হলেও মূলতঃ ভারতীয় হিন্দু-সংস্কারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেই বাঙালীর পক্ষে তার রসগ্রহণ করা অনেকটা সহজ। অবশ্য বিদ্যাসাগরের রচনার গুণেই উক্ত গ্রন্থ দুটি বাঙালী সমাজে এত জনপ্রিয় হয়েছিল।

শেক্সপীয়রের উক্ত নাটকের আখ্যানে চিরায়ত মানুষের কথা লেখা থাকলেও তার চারিদিকে, পটভূমিকা, সমাজ আচার ব্যবহার প্রভৃতি ভিনদেশীয় ব্যাপার এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে, বাঙালী পাঠকের পক্ষে সে গল্পকাহিনীকে নিজের বলে ভাবা একটু কঠিন। বিদ্যাসাগর শেক্সপীয়রকে বাঙালীর মনের উপযোগী করে গড়ে তোলবার জন্য

৭৬. বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর, পৃ. ৪৬৫

৭৭. *Tales from Shakespeare*-এর কমেডিগুলির আখ্যান চার্লস ল্যাম্বের দিদি ম্যারির রচনা, ট্র্যাজেডির আখ্যানসমূহ চার্লসের লেখা।

নাটকীয় কাহিনীকে গল্পের আধারে ঢেলে সাজবার সময় আসল নাটকের নামধাম বদলে ভারতীয় নাম দিয়েছেন এবং ঘটনাসংস্থান ও আচারব্যবহারক যথাসম্ভব ভারতীয় মনের অনুকূল করে বদলে নিয়েছেন। কাজেই *The Comedy of Errors* অবলম্বনে রচিত 'ভ্রান্তিবিলাস' অনুবাদমূলক হলেও একপ্রকার মৌলিক সৃষ্টির গৌরব লাভ করেছে। 'ভ্রান্তিবিলাস' শব্দটি এখন বিদগ্ধ মহলে 'ভুল থেকে জাত কৌতুক' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাহিনীর বাংলা আখ্যা (টাইট্‌ল্) নির্বাচনে বিদ্যাসাগর অসাধারণ লিপিকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। কর্মক্ষেত্র ও বিধবাবিবাহ নিয়ে আতি বিব্রতাবস্থায় বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্তিবিলাস' লিখেছিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর মনের সরস ভাব এ আখ্যানে কিছুমাত্র খর্ব হয় নি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পরিহাসপ্রিয় সহজ ভাবের মানুষ ছিলেন। আসর জমাতে তাঁর জুড়ি ছিল না। বস্তুতঃ মার্জিত ধরনের সরস পরিহাসকে শহুরে মজলিশে পেশ করে বিদ্যাসাগর তাঁর কৌতুকপ্রবণ চিত্তের বিচিত্র পরিচয় রেখে গেছেন। দৈনন্দিন জীবনে ও ব্যক্তিগত আলাপে তিনি কদাপি সংস্কৃতঘেঁষা শব্দ ব্যবহার করতেন না। বরং চলতি, আটপৌরে, কখনও কখনও কিছু 'স্ল্যাং' শব্দ ব্যবহারেও তাঁর সঙ্কোচ ছিল না। [৭৮] মানুষের দুঃখবেদনার প্রতি তাঁর যেমন বীরপুরুষসুলভ (যাকে 'শিভ্যাল্‌রি' বলা হয়) একটি কারুণ্যমিশ্রিত দাক্ষিণ্য ও সেবাব্রতের মনোভাব ছিল, তেমন দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট অসঙ্গতি ও উদ্ভট ব্যাপার তাঁকে কৌতুকরসে উচ্ছল

৭৮. "বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধারণ কথাবার্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না ; কিন্তু লোকের সঙ্গে মজলিসে কথা কহিবার সময় এমন কি বাংলা slang শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না"— 'পুরাতন প্রসঙ্গে' কৃষ্ণকমলের উক্তি। দ্রঃ পুরাতন প্রসঙ্গ (নতুন সংস্করণ পৃ. ২৮) পরে সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

করে তুলত। জীবনের শেষপ্রান্তে বহু জনের কাছ থেকে বঞ্চনা লাভ করে তাঁর মনের সরসতা ক্রমেই তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপে পর্যবসিত হয়েছিল। সে যাই হোক, 'ভ্রান্তিবিলাস' থেকেই বোঝা যাবে, গুরুতর কর্মব্যস্ত বিদ্যাসাগর মনের সরসতা কখনও হারান নি। আর একটা কথা, 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর পূর্বে তাঁর যাবতীয় রচনা ছাত্রসমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রস্তুত হয়েছিল। শিক্ষাবিস্তারই ছিল তাঁর সাহিত্য-সেবার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু 'ভ্রান্তিবিলাস' রচনাকালে তিনি শিক্ষাপ্রচার ভুলে নিছক আনন্দকৌতুকে ও জনচিত্তরঞ্জনে মেতে উঠেছিলেন। 'ভ্রান্তিবিলাস' সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যহীন রচনা, এর সঙ্গে প্রয়োজন মেটানর কোন সম্পর্ক নেই। 'বিজ্ঞাপনে' তিনি বলেছেন, "কিছুদিন পূর্ব্বে, ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি শেক্সপীয়রের প্রণীত ভ্রান্তিপ্রহসন পড়িয়া আমার বোধ হইয়াছিল, তদীয় উপাখ্যানভাগ বাঙ্গলা ভাষায় সঙ্কলিত হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে।" এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, 'লোকের চিত্তরঞ্জন' অর্থাৎ সাধারণ পাঠকের মনে সরস কৌতুকভাব সঞ্চারের জন্যই *The Comedy of Errors*-এর বাংলা আখ্যানের রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর অন্যান্য রচনার শিল্পলক্ষণ থাকলেও সেগুলি যে শিক্ষাব্রতী মহাপুরুষের দ্বারা শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্যই রচিত হয়েছিল একথা পাঠক ভুলতে পারে না। বিদ্যাসাগরকে সেখানে লোকশিক্ষক আচার্য বলে শ্রদ্ধা করাই ছিল পাঠকের কর্তব্য। কিন্তু 'ভ্রান্তিবিলাসে' তিনি পাঠকের বন্ধুর পর্যায়ে নেমে এসেছেন, শিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি গুরুতর কর্ম থেকে যেন ক্ষণকালের জন্য অবসর নিয়ে তিনি পাঠকদের সঙ্গে হাস্যপরিহাসে যোগ দিয়েছেন। এখানে তাঁর চিত্ত বিশুদ্ধ শিল্পীর ভূমিকাই গ্রহণ করেছে। তাঁর মতে শেক্সপীয়রের এই প্রহসন "যার পর নাই কৌতুকাবহ। তিনি এই প্রহসনে হাস্যরসোদ্দীপনের নিরতিশয় কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকালে হাস্য করিতে করিতে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়।" সরস নির্মল কৌতুকের প্রতি তাঁর মতো মহাসত্ত্ববান পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল, তাই শেক্সপীয়রের অনেক গভীর

রসের নাটক থাকা সত্ত্বেও তিনি *The Comedy of Errors*-এর মতো ঈষৎ দুর্বল ধরনের নাটক বেছে নিয়েছিলেন।[৭৯]

'বিজ্ঞাপনে' তিনি সংক্ষেপে শেক্সপীয়রের প্রতিভার উল্লেখ করে বলেছেন, "অনেকে বলেন, তিনি যে কেবল ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, এরূপ নহে, এ পর্যন্ত ভূমণ্ডলে যত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বা পক্ষপাতবিবর্জিত কি না, মাদৃশ ব্যক্তির তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন মাত্র।" শেক্সপীয়র বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, বিদ্যাসাগর এ কথা স্বীকার করতেন না। তাঁর মতে কালিদাসই বিশ্বসাহিত্যের রাজাধিরাজ।[৮০] এ বিষয়ে তিনি আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের নিকট অকপটে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।[৮১]

The Comedy of Errors শেক্সপীয়রের প্রথম যুগের রচনা, ১৫৯৩ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি এটি অভিনীত হয়েছিল, মুদ্রিত হয়েছিল ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দে। এ নাটকে বিশেষ কোন প্রতিভার চিহ্ন নেই।[৮২] রোমান

৭৯. *The Comedy of Errors* যে শেক্সপীয়রের সর্বোৎকৃষ্ট নাটক নয়, তা বিদ্যাসাগরের মতো সূক্ষ্ম সমালোচকের সতর্ক দৃষ্টি এড়ায় নি। এ বিষয়ে তিনি যথার্থ বলেছেন, "ভ্রান্তিপ্রহসন কাব্যাংশে, সেক্সপীয়র প্রণীত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট···।"

৮০. তাঁর মতে, "মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা (শকুন্তলা) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল অলৌকিক পদার্থ" ('সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব')। শকুন্তলার বিজ্ঞাপনে তিনি কালিদাসকে "ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান কবি" বলেছিলেন।

৮১. 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (নতুন সংস্করণ), পৃ. ২৯

৮২. এখানে এ বিষয়ে ইংরেজ সমালোচকের মতামত উদ্ধৃত হল—"That *The Comedy of Errors* is, in substance, a mere adaptation of the *Menaechmi* of Plautus would, in itself, have very little to do with probable earliness or lateness ; for it is a point so

নাট্যকার টিটাস ম্যাকিয়াস প্লোটাস (খ্রীঃ পূঃ ২৫৪-১৮৪ অব্দ)-এর ল্যাটিন ভাষায় লেখা *Menaechmi* শীর্ষক হাস্যকৌতুকমুখর নাটকের কাহিনী অবলম্বনে শেক্সপীয়র *The Comedy of Errors* রচনা করেছিলেন। মূল নাটকের আখ্যানটি সংক্ষেপে এই রকম ঃ

সিরাকুাজ ও এফিসাস নামে দুটি শহরের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এমন নির্মম আদেশ প্রচারিত হয়েছিল যে, যদি কোন সিরাজকুাজবাসী এফিসাসে এসে পড়ে তবে হাজার মার্ক জরিমানা না দিতে পারলে এফিসাসের আইনানুসারে তার প্রাণদণ্ড হবে। ইজিয়ন নামে সিরাকুাজবাসী এক বৃদ্ধ বণিক এফিসাসে আসার ফলে ধৃত হন এবং সেই নগরের ডিউকের আদেশ ক্রমে তিনি নিজের দুঃখজনক কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম এমিলিয়া। তাঁদের দুটি যমজ পুত্র হয়েছিল, দুটির আকার-আকৃতি একেবারে এক রকম, তাঁরা ছেলেদের একই নাম রেখেছিলেন—এ্যান্টিফোলাস। ভাগ্যক্রমে একই রকম দেখতে দুটি যমজ বালককে তাঁরা ক্রয় করেন। তাদের দু'জনেরও একই নাম (ড্রোমিও) ছিল। এরা তাঁর দুই যমজ পুত্রের পরিচারকরূপে বহাল হল। একদা জাহাজডুবির ফলে ইজিয়ন তাঁর দুই পুত্র, স্ত্রী ও যমজ ভৃত্যদের সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ সিরাকুাজের এ্যান্টিফোলাস বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ভৃত্য

---

well known as to require no discussion, explanation, apology or even frequent statement, that Shakespeare never gave himself the slightest trouble to be 'original'. Its earliness is shown by the comparative absence of character, by the mixed and rough-hewn quality of the prosody, and, last and most of all, by the inordinate allowance of the poorest, the most irrelevant and occasionally, the most uncomely word-play and foolery".—*The Cambridge History of English Literature* (Cheap Edition), Vol. V. Part one, Pp. 177—178.

ড্রোমিওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল মা ও ভাইয়ের সন্ধানে। তারপর তাদের আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ইজিয়ন তাদের সন্ধান করতে করতে এফিসাসে উপস্থিত হলেন এবং ধৃত হয়ে দারুণ বিপদের সম্মুখীন হলেন। তাঁর এই শোকাবহ কাহিনী শুনে দয়াপরবশ হয়ে ডিউক জরিমানার টাকা সংগ্রহের জন্য তাঁকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় দিলেন। এদিকে ইজিয়নের জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ এফিসাসের এ্যান্টিফোলাস যমজ ভৃত্যের অন্যতম ড্রোমিওর সঙ্গে কোনও প্রকারে জাহাজডুবি থেকে রক্ষা পেয়ে এফিসাসে বাস করছিল, বিয়েও করেছিল।

সিরাক্যুজের এ্যান্টিফোলাস (কনিষ্ঠ পুত্র) এবং যমজ ভৃত্যের আর এক জনকে (তারও নাম ড্রোমিও) সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সেই দিন সকালে এফিসাসে উপস্থিত হয়। দুই যমজ ভাইয়ের চেহারা অবিকল এক রকম, নামও এক, ভৃত্য দুটিও প্রভুর অনুরূপ। এইখান থেকে ভুলের প্রহসন শুরু হল। সিরাক্যুজের এ্যান্টিফোলাস ভৃত্য ড্রোমিওর (এফিসাসের) দ্বারা মধ্যাহ্নভোজনের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এফিসাসের এ্যান্টিফোলাসের বাড়ীতে যেতে বাধ্য হল, এফিসাসের এ্যান্টিফোলাসের স্ত্রী সিরাক্যুজের এ্যান্টিফোলাসকে স্বামী মনে করে তার সঙ্গে স্বামীর মতো ব্যবহার করতে লাগল এবং আসল স্বামী অর্থাৎ এফিসাসের এ্যান্টিফোলাসকে (যে বাড়ীর যথার্থ মালিক) বাইরের কোন দুষ্ট লোক মনে করে বাড়ীতে ঢুকতে দিল না। শেষে এফিসাসের এ্যান্টিফোলাসকে পাগল মনে করে আটক করে রাখা হল, এবং সিরাক্যুজের এ্যান্টিফোলাস অপরের ঈর্ষাতুর স্ত্রীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এক মঠে এসে আশ্রয় গ্রহণ করল।

এদিকে সন্ধ্যা সমাগত হল, ইজিয়ন অজানা শহরে হাজার মার্ক যোগাড় করতে পারলেন না, সুতরাং প্রাণদণ্ডের জন্য তাঁকে বধ্যভূমিতে আনা হল। ডিউক এই ব্যাপারের জন্য যখন বধ্যভূমিতে যাচ্ছিলেন, তখন এফিসাসের এ্যান্টিফোলাস তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন করল, প্রভু,

আমাকে রক্ষা করুন। সেই সময়ে সিরাকুজের এ্যান্টিফোলাস যে-মঠে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই মঠের সন্ন্যাসিনীও ডিউকের কাছে সেই মর্মে আবেদন করলেন। একই স্থানে একই সময়ে দুই ভাইয়ে উপস্থিত হলে রহস্যের সমাধান হল। ইজিয়ন দুই পুত্রকে ফিরে পেলেন, তাঁর প্রাণরক্ষা হল। মঠের সন্ন্যাসিনীই হলেন তাঁর হারিয়ে-যাওয়া স্ত্রী এমিলিয়া। ঘটনার পরিণাম 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হল।

বিদ্যাসাগর শেক্সপীয়রের নাটকের আখ্যানটিকে মোটামুটি অনুসরণ করেছেন, শুধু নামধামগুলি বদলে প্রাচীন পাশ্চাত্য কাহিনীকে ভারতীয় পরিচ্ছদ দিয়েছেন। এখানে শেক্সপীয়রের নাটকের পাত্র-পাত্রী ও স্থানের নাম এবং বিদ্যাসাগরকৃত তার ভারতীয় রূপান্তরের তালিকা দেওয়া যাচ্ছে :

The Comedy of Errors	—	'ভ্রান্তিবিলাস'
Syracuse	—	হেমকূট
Ephesus	—	জয়স্থল
Aegeon	—	সোমদত্ত
Solinus (Dnke of Ephesus)	—	বিজয়বল্লভ (জয়স্থলের অধিরাজ)
Aemilia (Wife of Aegeon)	—	লাবণ্যময়ী
Antipholus of Ephesus Antipholus of Syracuse	—	চিরঞ্জীব
Dromio of Ephesus Dromio of Syracuse	—	কিঙ্কর
Adriana, wife to Antipholus of Ephesus	—	চন্দ্রপ্রভা
Luciana	—	বিলাসিনী
Angelo	—	বসুপ্রিয়
A Courtezan	—	অপরাজিতা
Pinch	—	বিদ্যাধর

এইভাবে বিদেশী চরিত্র ও কাহিনীকে বিদ্যাসাগর যথাসম্ভব দেশীয় পরিচ্ছদ দিয়েছেন। তিনি নাটককে গদ্য-আখ্যানে রূপান্তরিত করার প্রথম সার্থকতা অর্জন করেন শকুন্তলার আখ্যানে। ইংরেজী নীতিগল্প, আখ্যান-আখ্যায়িকা অনুবাদ করে তিনি যে ছাত্রপাঠ্য পুস্তিকা গুলি লিখে-ছিলেন তারও অনুবাদ প্রায় মৌলিক ধরনের হয়েছিল। ফলে যখন তিনি *The Comedy of Errors*-কে বাংলা আখ্যানে রূপান্তরিত করতে প্রস্তুত হলেন তখন ইংরেজী থেকে অনুবাদকর্মে রীতিমতো দক্ষতা অর্জন করেছেন। ইংরেজী নাটকখানিকে তিনি এমন নিপুণভাবে আত্মস্থ করেছিলেন যে, মূল কমেডির হাস্যতরঙ্গ ও লঘু ধরনটি তাঁর হাতে চমৎকার ফুটেছে। বরং 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস,' বিশেষতঃ 'সীতার বনবাস'-এর ভাষা একটু বেশী গুরুভার, স্থানে স্থানে সমাস-সন্ধির বাহুল্য বাক্‌রীতিকে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তাতে সন্দেহ নেই।[৮৩] কিন্তু 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর বর্ণনারীতি হালকা ধরনের হওয়াতে ভাষায় সরসতা সঞ্চারিত হতে পেরেছে। এখানে উভয়ের রচনা থেকে কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে এ-কথার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করা যাচ্ছে ঃ

৮৩. বঙ্কিমচন্দ্র নাকি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের নিকট বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ করে বাঙ্গালা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে গেছেন।" কৃষ্ণকমলও তাই মনে করতেন ("আমারও অনেকটা ঐ রকম মত।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', পৃ. ৪৬)। বিদ্যাসাগরের ভাষা ও সাহিত্য-প্রতিভার প্রতি অন্তরে অন্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের যে ভাবই থাক না কেন, বাইরে তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষাকে শ্রদ্ধাই করতেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় ('লুপ্তরত্নোদ্ধার') তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের চরিতকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট তিনি বলেছিলেন,"বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত ও গঠিত বাঙ্গালা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁহারই উপার্জিত সম্পত্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি।"—চণ্ডীচরণ প্রণীত 'বিদ্যাসাগর', ১৮৯৫ সালের সংস্করণ, পৃ. ১৮৭

১. She is so hot because the meat is cold,
The meat is cold because you come not home,
You come not home because you have no stomach,
You have no stomach, having broke your fast ;
But we, that know what 'tis to fast and pray,
Are penitent for your default to-day.
—*The Comedy of Errors*, Act 1, Scene 2

বিদ্যাসাগরের অনুবাদ :

"আহারসামগ্রী যত শীতল হইতেছে, কর্ত্রী ঠাকুরাণী তত উষ্ণ হইতেছেন। আহার সামগ্রী শীতল হইতেছে, কারণ আপনি গৃহে যান নাই ; আপনি গৃহে যান নাই, কারণ আপনকার ক্ষুধা নাই, কারণ আপনি বিলক্ষণ জলযোগ করিয়াছেন ; কিন্তু আপনকার অনুপস্থিতির জন্য আমরা অনাহারে মারা পড়িতেছি।"—'ভ্রান্তিবিলাস', প্রথম পরিচ্ছেদ

২. Some devils ask but the parings of one's nail,
A rush, a hair, a drop of blood, a pin,
A nut, a cherry-stone ;
But she, more covetous, would have a chain.
(Act 4. Scene 3)

বিদ্যাসাগরের অনুবাদ :

"এই সকল কথা শুনিয়া কিঙ্কর বলিল, অন্য অন্য ডাইন, ছাড়িবার সময় ঝাঁটা, কুলো, শিল-নোড়া বা ছেঁড়া জুতা পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া যায়, এ দিব্যাঙ্গনা ডাইনিটির অধিক লোভ দেখিতেছি, ইনি হয় হার,নয় আঙ্গটি,দুইয়ের একটি না পাইলে যাইবেন না।" (চতুর্থ পরিঃ)

এখানেবিদ্যাসাগর বাংলাদেশে ভূতে-পাওয়াও ভূত-ছাড়ানোর চিত্রকল্প দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু মূলের সঙ্গে কোন বিরোধ নেই।

৩. I am an ass indeed ; you may prove it by my long ears. I have served him from the hour of my nativity to this instant, and have nothing at his hands for my service but blows. When I am cold he heats me with beating ,

when I am warm, he cools me with beating. I am waked with it when I sleep ; raised with it when I sit ; driven out of doors with it when I go from home ; welcom'd home with it when I return ; nay, I bear it on my shoulders as a beggar wont her brat , and I think, when he hath lam'd me, I shall beg with it from door to door." (Act 4, Sc-3)

বিদ্যাসাগরের অনুবাদ :

"আমি যে গর্দভ, তার সন্দেহ কি ; গর্দভ না হইলে আমার কান লম্বা হইবেক কেন। এই বলিয়া রাজপুরুষকে সম্ভাষণ করিয়া কিঙ্কর বলিল, মহাশয়,জন্মাবধি প্রাণপণে ইহার পরিচর্যা করিতেছি ; কিন্তু কখনও প্রহার ভিন্ন অন্য অন্য পুরস্কার পাই নাই। শীত বোধ হইলে প্রহার করিয়া গরম করিয়া দেন ; গরম বোধ হইলে প্রহার করিয়া শীতল করিয়া দেন ; নিদ্রাবেশ হইলে প্রহার করিয়া সজাগর করিয়া দেন ; বসিয়া থাকিলে প্রহার করিয়া উঠাইয়া দেন ; কোনও কাজে পাঠাইতে হইলে প্রহার করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দেন ; কার্য সমাধা করিয়া বাটীতে আসিলে প্রহার করিয়া আমার সংবর্ধনা করেন ; কথায় কথায় কান ধরিয়া টানেন তাহাতেই আমার কান এত লম্বা হইয়াছে।" (চতুর্থ পরিঃ)

৪. Pinch—Give me your hand, and let me feel your pulse.
Anti. Ephesus—There is my hand, and let it feel your ears. (Act 4, Sc-4)

বিদ্যাসাগরের অনুবাদ :

"বিদ্যাধর চিরঞ্জীবকে বলিল, বাবু ! তোমার হাতটা দাও, নাড়ীর গতি কিরূপ দেখিব। চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া বলিলেন, এই আমার হাত, তুমি কানটি বাড়াইয়া দাও।" (চতুর্থ পরিঃ)

এখানে মূলের 'and let it feel your ears'-এর অনুবাদ বাংলা ভাষারীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছে।

৫. O mistress, mistress, shift and save yourself !
My master and his man are both broke loose,

Beaten the maids a-row and bound the doctor,
Whose beard they have singed off with brands of fire ;
And ever, as it blazed, they threw on him
Great pails of puddled mire to quench the hair.

(Act V, Sc-1)

বিদ্যাসাগরের অনুবাদ :

"এই সময়ে এক ভৃত্য আসিয়া অতি আকুল বচনে চন্দ্রপ্রভাকে বলিতে লাগিল, মা ঠাকুরাণি ! যদি প্রাণ বাঁচাইতে চান, অবিলম্বে কোনও স্থানে লুকাইয়া থাকুন। কর্তা মহাশয় ও কিঙ্কর উভয়ে বন্ধনচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং দাসদাসীদিগকে প্রহার করিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন-পূর্বক বিদ্যাধর মহাশয়ের দাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছেন ; পরে আগুন নিবাইবার জন্ত ময়লা জল আনিয়া তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিতেছেন।" (পঞ্চম পরিঃ)

এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাবে বিদ্যাসাগর আখ্যান-অনুবাদে মূল গ্রন্থের ভাষার হালকা চাল অনেকটা বজায় রাখতে পেরেছেন। অবশ্য তিনি নাটকের কোন কোন অনাবশ্যক দীর্ঘ অংশ বাদ দিয়েছেন, কোথাও-বা স্থূল ধরনের বর্ণনার কোন উল্লেখ করেন নি। *The Comedy of Errors*-এর তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সিরাক্যুজের এ্যান্টিফোলাস (কনিষ্ঠ ভাই) তার পরিচারক ড্রোমিওর সঙ্গে পরিচারিকার দৈহিক সৌন্দর্য নিয়ে রসিকতা করতে করতে বক্তব্যকে নিম্নগ্রামে নামাতে দ্বিধা করে নি। উক্ত পরিচারিকার কদাকার বিরাট বপু[৮৪] বর্ণনা করতে করতে এবং তার দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নানা দেশের ভৌগোলিক[৮৫] তুলনা দিতে দিতে সে পরিচারককে

৮৪. ড্রোমিও এই পরিচারিকার স্থূল কলেবর সম্বন্ধে বলেছে, "The mountain of mad flesh" (Act 4, Sc-4)—বিদ্যাসাগর অনুবাদ করেছেন, "পাকশালার হস্তিনী"।

৮৫. একটু 'ভৌগোলিক' দৃষ্টান্ত :
Anti. Syracuse—In what part of her body stands Ireland ?
Drom. Syracuse—Marry Sir, in her buttocks, (Act 4, Sc-4)

জিজ্ঞাসা করল : "Where stood Belgia, the Netherlands ?" এই অশ্লীল ইঙ্গিতকে ড্রোমিও এইভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে, "O, Sir, I did not look so low."—কর্তা, অত নীচের দিকে আমি তাকাই নি। বিদ্যাসাগর আদিরসের বিরোধী না হলেও এ বর্ণনার ব্যঞ্জনা অত্যন্ত স্থূল বলে তিনি এ প্রসঙ্গ একেবারে বাদ দিয়ে গেছেন।

'ভ্রান্তিবিলাস'-এর কাহিনীটি মূল নাটকের পঞ্চাঙ্ক অনুসারে পাঁচটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। ফলে বিবৃতিমূলক ঘটনায় নাটকের ঘটনাসংবেগ ও 'সাসপেন্স্' সঞ্চারিত হতে পেরেছে। শেক্সপীয়রের একখানি মধ্যম শ্রেণীর কমেডির ঘটনাবিবরণে বিদ্যাসাগর যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তিনি মহাকবির কোন গভীর রসের নাটকে হস্তক্ষেপ করলে বাংলা ভাষায় শেক্সপীয়র-সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত খুলে যেত। সে যাই হোক, *The Comedy of Errors*-এর উতরোল হাস্যপরিহাস বিদ্যাসাগরকেও হাস্যমুখর করে তুলেছিল, তার চিহ্ন রয়ে গেছে 'ভ্রান্তিবিলাসে'। তাঁর ভাষা কোন কোন স্থানে একেবারে ঘরোয়া ধরনের হয়ে গেছে। যেমন—

> ১. চন্দ্রপ্রভার স্বর শুনিতে পাইয়া জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, বলি, গিন্নি ! আজিকার একি কাণ্ড ! এই কথা শুনিবামাত্র চন্দ্রপ্রভা কোপে জ্বলিত হইয়া বলিলেন, তুই কোথাকার হতভাগা, দূর হয়ে যা, দরজায় গোল করিস না, লক্ষ্মীছাড়ার আস্পর্ধা দেখ না, রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমায় গিন্নি বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন !"
>
> (তৃতীয় পরিঃ)

> ২. "বলিতে কি, আজ তুমি দিদির সঙ্গে নিতান্ত ইতরের ব্যবহার করিতেছ। যদি মনে অনুরাগ না থাকে, মৌখিক প্রণয় ও সৌজন্য দেখাইবার হানি কি ? তাহা হইলেও দিদির মন অনেক তুষ্ট থাকে। যাহা হউক, ভাই ! আজ তুমি বড় চলাচলি করিলে। স্ত্রীপুরুষে এরূপ চলাচলি করা কেবল লোকহাসান মাত্র।"
>
> (তৃতীয় পরিঃ)

৩. "বলিতে কি, ভাই! তুমি যথার্থই পাগল হয়েছে, নতুবা এমন কথা কেমন করিয়া মুখে আনিলে। ছি ছি! কি লজ্জার কথা; আর যেন কেহ ও কথা শুনে না। দিদি শুনিলে আত্মঘাতিনী হইবেন। আমি দিদিকে ডাকিয়া দিতেছি; অতঃপর তিনি আপনার মামলা আপনি করুন।" (তৃতীয় পরিঃ)

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যাসাগর অনুবাদ করতে গিয়ে মূলের অশ্লীল অংশ বা অযথা দীর্ঘ সংলাপ বাদ দিয়েছেন। কথার মারপ্যাঁচ বা হেঁয়ালিকেও তিনি অনেকটা সরল ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। তবে দু'এক স্থানে তিনি মূলকে ছেড়ে খানিকটা স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন। যেমন, মূল নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের খানিকটা। এফিসাসের এ্যান্টিফোলাস নিজের বাড়ীর রুদ্ধ দ্বার ভাঙতে উদ্যত হলে বণিক বালথাজার তাকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে বলল:

If by strong hand you offer to break in
Now in the stirring passage of the day,
A vulgar comment will be made of it,
And that supposed by the common rout
Against your yet ungalled estimation
That may with foul intrusion enter in
And dwell upon your grave when you are dead;
For slander lives upon succession,
For ever housed where it gets possession.

এইভাবে বিদ্যাসাগর এর অনুবাদ করেছেন:

"এখন আপনি ক্রোধভরে এক কর্ম করিবেন; কিন্তু ক্রোধশান্তি হইলে যার পর নাই অনুতাপগ্রস্ত হইবেন। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কোন কর্ম করা পরামর্শসিদ্ধ নয়। যদি এই দিবাদ্বিপ্রহরের সময়ে আপনি দ্বারভঙ্গে প্রবৃত্ত হন, রাজপথবাহী সমস্ত লোক সমবেত হইয়া কত কুতর্ক উপস্থিত করিবেক। আপনকার কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিবেক না। মানবজাতি নিরতিশয় কুৎসাপ্রিয়; লোকের

কুৎসা করিবার নিমিত্ত কত অমূলক গল্পের কল্পনা করে, এবং কল্পিত গল্পের আকর্ষণীশক্তির সম্পাদনের নিমিত্ত উহাতে কত অলঙ্কার যোজিত করিয়া দেয়। যদি কোনও ব্যক্তির প্রশংসা করিবার সহস্র হেতু থাকে, অধিকাংশ লোকে ভুলিয়াও সে দিকে দৃষ্টিপাত করে না ; কিন্তু কুৎসা করিবার অণুমাত্র সোপান পাইলে মনের আমোদে সেই দিকে ধাবমান হয়। আপনি নিতান্ত অমায়িক ; মনে ভাবেন কখনও কাহারও অপকার করেন নাই, যথাশক্তি সকলের হিতচেষ্টা করিয়া থাকেন ; সুতরাং কেহ আপনকার বিপক্ষ ও বিদ্বেষী নাই ; সকলেই আপনকার আত্মীয় ও হিতৈষী। কিন্তু আপনকার সে সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। আপনি প্রাণপণে যাঁহাদের উপকার করিয়াছেন, এবং যে-সকল ব্যক্তিকে আত্মীয় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আপনকার বিষম বিদ্বেষী। ঐসকল ব্যক্তি আপনকার যার পর নাই কুৎসা করিয়া বেড়ান।"

(তৃতীয় পরিঃ)

এখানে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগর স্বেচ্ছামতো অগ্রসর হয়েছেন, মূলকে ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে গেছেন। এই সময়ে বিধবাবিবাহ ব্যাপারে তাঁকে নানাভাবে বঞ্চিত হতে হয়েছিল, বন্ধুও শত্রু হয়েছিল। সেই তিক্ততার জন্য তিনি এখানে মানুষের অকৃতজ্ঞতার কথা এতটা বাড়িয়ে বলেছেন, যা মূল নাটকে সামান্য মাত্র ছিল।

'ভ্রান্তিবিলাস' একযুগের বাঙালীর কথারসের পিপাসা মিটিয়েছে। এ কাহিনী প্রকাশের পূর্বে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ও 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) প্রায় একই সময়ে মুদ্রিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানি উপন্যাসই দূরাস্তৃত ইতিহাসের পটভূমিকায় স্থাপিত রোমান্টিক কাহিনী। প্যারীচাঁদের 'আলাল' প্রকাশের পর বাঙালী পাঠক বুঝতে পারল, "সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে

হয় না……। যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না……। যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।”[৮৬] বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনখানি উপন্যাসে বাংলা দেশের কথা থাকলেও, তার সঙ্গে তাঁর যুগের বাঙালীর বিশেষ কোন যোগ ছিল না, কারণ বিস্মৃত ইতিহাস ছিল তার পটভূমিকা। তবু শিক্ষিত পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক রোমান্সের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ধরনের কাহিনীর রস প্রথম উপভোগ করেছিল। বিদ্যাসাগরের আখ্যান কাল্পনিক দেশ-কাল-পাত্রের ওপর পরিকল্পিত এবং ঘটনাটি বহুস্থলে বাস্তব প্রতীতিকে লঙ্ঘন করলেও (সে দোষ এই কাহিনীর আদিনাট্যকার প্লোটাসের), সরস ও উদ্ভট কৌতুকরসের জন্য এ কাহিনী সেযুগের পাঠকচিত্তে অনেকটা রোমান্সের রসই সৃষ্টি করেছিল। কেউ কেউ ‘ভ্রান্তিবিলাস’কে উপন্যাস বলেই গ্রহণ করেছেন।[৮৭] সে যাই হোক, একখানি বিদেশী নাটককে (যার ঘটনা আগাগোড়া অবিশ্বাস্য) বাংলাদেশের আধুনিক পাঠকের মনের উপযোগী করে গল্পকাহিনীর রূপ দেওয়া অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই ব্যাপারে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। দুঃখের বিষয়, তিনি সমগ্র জীবন ধরে এত গুরুতর কাজে ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর প্রতিভার সরস দিকটি মাত্র তিনটি রচনা ভিন্ন (‘ভ্রান্তিবিলাস’, ‘বিদ্যাসাগর চরিত’, ‘প্রভাবতী সম্ভাষণ’) আর কোন গ্রন্থে প্রত্যক্ষ-

৮৬. ‘বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান’ (বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিবিধ, পৃ. ১৪৪)

৮৭. “ফলতঃ ভ্রান্তিবিলাস একখানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা উপন্যাস হইয়াছে।… বিদ্যাসাগর ভ্রান্তিবিলাসের আদর্শে শেক্সপিয়রের অন্যান্য নাটক বাঙ্গালা ভাষায় সংকলিত করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল।”—বিহারীলাল সরকার প্রণীত ‘বিদ্যাসাগর’ পৃ. ৪৬৫

ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। বাংলা দেশের শিক্ষা-সংস্কারের জন্য তাঁকে বালকদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক লিখতে হয়েছে, ইংরেজী থেকে নীতিগল্পের অনুবাদ করতে হয়েছে—এতে দেশের শিক্ষা-বিস্তারের বিস্তর সাহায্য হয়েছে বটে, কিন্তু তার ফলে আমরা রস-সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরকে হারিয়েছি। গণ্ডকী শিলার দ্বারা শিল-নোড়ার কাজ চলতে পারে বটে, কিন্তু তাতে শালগ্রামের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষামূলক রচনা

১.

যিনি অক্লেশে মণিহর্ম্য নির্মাণ করতে পারেন, তাঁর সমস্ত দক্ষতা খড়ে-ছাওয়া বাংলাঘর তৈরিতে পর্যবসিত হলে শিল্পকর্মের যে নিদারুণ ক্ষতি হয়, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। বিদ্যাসাগর স্বাভাবিকভাবে ভাষাশিল্পের যাদুকর ছিলেন, বাংলা ভাষাকে প্রয়োজনের পোষাক ছাড়িয়ে তাকে সভাসুন্দর শোভাসৌন্দর্য দিয়েছিলেন। ইচ্ছে করলে, কি শিল্পের ক্ষেত্রে, কি মননের ক্ষেত্রে তিনি বাংলা ভাষাকে নব নব বৈচিত্র্যমণ্ডিত করতে পারতেন। কিন্তু ভাবাকাশসঞ্চারী কল্পস্বর্গপরিক্রমা স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করে তিনি বাঙালীর শিক্ষারীতিকে ফলপ্রসূ করবার জন্য বালপাঠ্য পুস্তক-পুস্তিকা রচনায় অগ্রসর হলেন। 'বর্ণপরিচয়' থেকে 'আখ্যান-মঞ্জরী' পর্যন্ত, শিশু-বালক-কিশোর-পাঠ্য অনেকগুলি পুস্তক লিখে বিদ্যাসাগর জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিয়ে বাঙালী জাতিকে চক্ষুষ্মান্ করতে চেয়েছেন।

বিদ্যাসাগর শিশুদের বর্ণবোধের কথা ভেবেছেন, বালকদের চরিত্র-গঠনোপযোগী চরিতকাহিনী ও জ্ঞানগর্ভ পুস্তক প্রচলন করেছেন, কিশোরদের চিত্তানুকূল আখ্যান রচনা করে নীরস শিক্ষাগ্রন্থেও সরসতা সঞ্চার করেছেন। বিশাল প্রতিভাধর এই মনস্বী বালক-বালিকাদের শিক্ষার কথা যতটা গভীর, আন্তরিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে ভেবেছিলেন, বোধ করি সে যুগে সে বিষয়ে অতটা মনোযোগ দিয়ে আর কেউ চিন্তা করেন নি। শিশুশিক্ষা নিয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কারও যথেষ্ট চিন্তা করেছিলেন, পুস্তকও লিখেছিলেন। তবে তিনিও ছিলেন বিদ্যাসাগরের পার্শ্বচর এবং তাঁরই আলোকে আলোকিত। শতসহস্র

কর্মজালজড়িত হয়েও বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের শিশুশিক্ষা এবং বয়স্ক-শিক্ষা সম্পর্কে সদাসর্বদা অবহিত ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন শিশুশিক্ষার বনিয়াদ সুদৃঢ় না হলে কোন জাতিই মননের ক্ষেত্রে সাবালকত্ব অর্জন করতে পারে না। এইজন্য মণিহর্ম্যে শিল্পসৌকুমার্য ও অলঙ্করণ স্থগিত রেখে শিক্ষার ভিত্তিমূলে হাত লাগিয়েছিলেন। এই অধ্যায়ে আমরা বিদ্যাসাগরের শিক্ষামূলক পুস্তক-পুস্তিকার সামান্য পরিচয় নিয়ে, শিল্পী বিদ্যাসাগর নয়—শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগরের আরেক চারিত্রমূর্তির স্বরূপ লক্ষ্য করব।

২.

১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে (১৭৭১ শকাব্দ) চেম্বার্স প্রণীত *Exemplary Biography*-র কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর জীবনকথা অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের 'জীবনচরিত' প্রকাশিত হয়। এর সবটাই মূলের অনুবাদ। "এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে"—এই মনোভাবের বশে তিনি চেম্বার্সের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ থেকে বেছে নিয়ে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশ্যস, লিনিয়স, ডুবাল, উইলিয়ম জোন্স ও টমাস জেঙ্কিন্স্-এর জীবনচরিত সঙ্কলন করেন। তখন এদেশে ছাত্রদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাবার উপযোগী এবং চরিত্রগঠনের অনুকূল বিশেষ কোন বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রচলিত ছিল না। স্কুলবুক সোসাইটি, ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কয়েকখানি বালপাঠ্য পুস্তক রচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার ভাষা শিক্ষার্থী বালকদের উপযোগী ছিল না, বিষয়গুলিও চরিত্রগঠনের ততটা অনুকূল বলে বিবেচিত হয় নি। বিদ্যাসাগর এইজন্য জনপ্রিয় ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক চেম্বার্সের উক্ত *Biography*-র অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর জীবনচরিতের সরল বঙ্গানুবাদ করেন। এই জীবনচরিতগুলির অধিকাংশই কোন বৈজ্ঞানিকের জীবনকথা। জ্যোতির্বিদ, উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ, ভিষকশাস্ত্রজ্ঞ,

শিক্ষাব্রতী, ভারততত্ত্ববিদ,—বিবিধ পাশ্চাত্ত্য মনীষীর কাহিনী অনুবাদ করে তিনি বালক-বালিকাদের চরিত্রগঠনের উপযোগী পাঠ্যগ্রন্থ সঙ্কলন করেছিলেন। গ্রন্থোক্ত সমস্ত চরিত্রই য়ুরোপীয়। শুধু টমাস জেঙ্কিন্‌স্ আফ্রিকার নিগ্রো রাজকুমার ছিলেন। তিনি কৃষ্ণকায় হয়েও য়ুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে অধ্যাপকরূপে শ্বেতাঙ্গের মতোই সম্মান লাভ করেছিলেন। অবশ্য এই নিগ্রো রাজকুমার য়ুরোপ থেকে বিদ্যা অর্জন করলেও দেশে ফিরে গিয়ে অনুন্নত কাফ্রিসমাজে শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ না করে বিদেশেই রয়ে যান বলে, বিদ্যাসাগর তাঁর চরিতকথা লেখার পর এই মন্তব্য করেন—"বোধ হয় কোন লোক-হিতৈষী সমাজের সাহায্যে জেঙ্কিন্সের স্বদেশে প্রতিপ্রেরিত হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলে তিনি তথায় পৈতৃক প্রজাগণের সভ্যতা-সম্পাদন ও তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে পারিতেন" (বিদ্যা-সাগর রচনাবলী, ১ম, পৃ. ২৩৯)।

এই জীবনচরিতগুলিতে দেখা যাবে, বিদ্যাসাগর মূলতঃ বৈজ্ঞানিক ধরনের চরিত্রই বেছে নিয়েছিলেন এবং যাঁরা অদৃষ্টের ওপর নির্ভর না করে নিজের চেষ্টার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁদের জীবনকথা অতি যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করেছিলেন। এই গ্রন্থে পদার্থবিদ্যা, বলবিজ্ঞান, উদ্ভিদতত্ত্ব ও জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত অনেক শব্দের পরিভাষার প্রয়োজন হয়েছিল। গ্রন্থের শেষে তিনি কয়েকটি ইংরেজী শব্দের বাংলা পরিভাষা তৈরি করে নিয়েছিলেন। যথা—**Heraldry**—কুলাদর্শ, **Museum**—চিত্রশালিকা, **Numismatics**—টঙ্কবিজ্ঞান, **Optics**—দৃষ্টি-বিজ্ঞান, **Mineralogy**—ধাতুবিদ্যা, **Astrology**—নক্ষত্র-বিদ্যা, **Perspective**—পরিপ্রেক্ষিত, **Ticket**—প্রবেশিকা, **Reflecting Telescope**—প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ, **Metaphysics**—মনোবিজ্ঞান, **State**—মণ্ডল, **Revolution**—রাজবিপ্লব, **Index**—শব্দসূচী, **Elasticity**—স্থিতিস্থাপক। এই পরিভাষার অনেকগুলি এখনও ব্যবহৃত হয়। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা-সংক্রান্ত

পরিভাষাগুলি তৈরি করতে গিয়ে তিনি বহু চিন্তা করেছিলেন। তবে "সঙ্কলিত শব্দ সকল বিশুদ্ধ ও অবিসম্বাদিত হইয়াছে কিনা" সে বিষয়ে তিনি কিছু সংশয়যুক্ত ছিলেন।

এ ধরনের জীবনচরিতরচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—পরিশ্রম, অধ্যবসায়, উৎসাহ, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানসিক গুণের সহায়তায় সাধারণ লোকও কতটা অসাধারণত্ব লাভ করতে পারে ছাত্রসমাজের কাছে তার আদর্শ তুলে ধরা। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী মহাপুরুষদের জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে "আনুষঙ্গিক তত্তৎ দেশের রীতি, নীতি, ইতিহাস ও আচার পরিজ্ঞান হয়।" ছাত্রসমাজ বিদেশ সম্বন্ধেও জ্ঞান সংগ্রহ করুক—এও তাঁর অভিপ্রায় ছিল।

অনুবাদ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর দেখলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় ইংরেজী পুস্তকের অনুবাদ করিলে প্রায় সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য হয় না" ('জীবনচরিতে'র ২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন)। তাই তাঁর মনে হয়েছিল, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাযুক্ত ইংরেজী গ্রন্থের সরল বাংলায় অনুবাদ-কর্মের তখনও সময় হয় নি। এইজন্য এই 'জীবনচরিত' অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেন, তিনি আর কোন ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ করবেন না। অবশ্য এর পরেও তিনি একাধিক ইংরেজী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

'জীবনচরিত'-এর চরিত্রগুলি সাধারণ ছাত্রের কাছে কিছু নীরস মনে হবে,) বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গেও সেযুগের অধিকাংশ পাঠার্থীর কিছুমাত্র যোগ ছিল না; উপরন্তু এতে যে সমস্ত স্থান, জনপদ ও ব্যক্তির প্রসঙ্গ ছিল তাও স্কুল-পাঠশালার ছাত্রের নিকট কিছু দুর্জ্ঞেয় মনে হয়েছিল। এই জন্য 'জীবনচরিত'-এর ভাষা ঈষৎ গুরুভার বলে মনে হয় এবং সে সম্বন্ধে স্বয়ং অনুবাদক অতিশয় অবহিত ছিলেন।

আরও একটা কথা—প্রথম সংস্করণের গ্রন্থগুলি ছ' মাসের মধ্যে নিঃশেষিত হলেও তিনি এ গ্রন্থের ভাষাগত অনভ্যস্ততার জন্য এর পুনর্মুদ্রণ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তখন তিনি "বাঙ্গালায়

এক নূতন জীবনচরিত পুস্তক সংকলন" করবার বাসনা ও উদ্যোগ করেছিলেন। এই "নূতন জীবনচরিত" যথার্থতঃ কোন্ কোন্ ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করে লেখবার সংকল্প করেছিলেন তা বোঝা যাচ্ছে না। 'জীবনচরিত' প্রকাশিত হলে কেউ কেউ মনে করেছিলেন, এ গ্রন্থ পাঠ করে আমাদের দেশের বালকেরা বিদেশী মনীষীদের শ্রদ্ধা করতে শিখবে বটে, কিন্তু যাতে তারা স্বদেশের মহাপুরুষদেরও শ্রদ্ধা করতে পারে সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর কিছু লেখেন নি।[১] অবশ্য তিনি দেশীয় ব্যক্তিরও গুণগ্রাহী ছিলেন, কর্মবীর মতিলাল শীল এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনচরিত লিখবেন সিদ্ধান্ত করেছিলেন ; কিন্তু সময়াভাবে তা কার্যে পরিণত করতে পারেন নি।[২] শোনা যায়, তাঁর বন্ধু, শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু বিদ্যাসাগরকে স্বদেশীয় ব্যক্তির জীবনচরিত লিখতে অনুরোধ করেছিলেন (বিহারীলাল সরকার, পৃ. ২৪৩)। বিদ্যাসাগর এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে কিছু কিছু উপাদান, তথ্য ও গ্রন্থ সংগ্রহও করেছিলেন। এটাই কি তাঁর 'নূতন জীবনচরিত'-এর উপাদান? তাঁর বন্ধু ও পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ অমূল্যচরণ বসুও এইজন্য তাঁকে অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নানা ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার জন্য তাঁর এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত

১. বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' (পৃ. ২৩৪) দ্রষ্টব্য। বিহারীলাল ও ও সুবলচন্দ্র মিত্র (*Iswar Chandra Vidyasagar—Story of his Life and Works*) বিশুদ্ধ হিন্দু আদর্শের দ্বারা বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা বিচার করতে গিয়ে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যাসাগর জীবন ও কর্মে হিন্দু আচার-আদর্শের অনুগমন করতেন না। 'জীবনচরিতে'ও তিনি হিন্দুর জীবনাদর্শের অনুকূল কোন আখ্যান সংযোজিত করেন নি। শুধু পাশ্চাত্ত্যের কয়েকজন কর্মে-সফল বিশেষব্যক্তির জীবনী লিখেছিলেন। এঁদের মতে, 'চরিতকথা'র অনেকটা নাকি, "হিন্দু-সন্তানের শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয়" নয়। (বিহারীলাল—পৃ. ২৩৪)

২. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, পৃ. ১৯০

হয় নি। তিনি যদি তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ বাঙালীদের সম্বন্ধে কিছু লিখে যেতেন, তাহলে বাংলার চরিতসাহিত্য যে অধিকতর বলশালী হত তাতে সন্দেহ নেই।[৩]

৩.

১৮৫১ সালে 'বোধোদয়' প্রকাশিত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল 'শিশুশিক্ষা—৪র্থ ভাগ'। তাঁর অভিন্নহৃদয়-বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার তিনভাগ 'শিশুশিক্ষা' রচনা করেছিলেন (১ম—২য়—১৮৪৯, ৩য়—১৮৫০) বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের (তখন নাম ছিল হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়) বালিকাদের জন্য।[৪] তারই আদর্শে ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তিনি প্রথমে 'বোধোদয়'-কে 'শিশুশিক্ষা ৪র্থ ভাগ' রূপেই চিহ্নিত করেছিলেন। মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' বেশ সুললিত ও সরস। একদা এই পুস্তিকাগুলি বালক-বালিকাদের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ ছিল। কিন্তু

৩. বিদ্যাসাগরের তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বোধহয় সেই ক্ষোভ নিবারণেই 'চরিতমালা' (১ম—১৩০০, ২য়—১৩০১) গ্রন্থে বিশিষ্ট বাঙালীর জীবনচরিত লিখেছিলেন। এই চরিত্রের মধ্যে রাধাকান্ত দেব, বিদ্যাসাগর, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ, মদনমোহন, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সমসাময়িক বিখ্যাত বাঙালীর নাম উল্লেখ করা যায়। শম্ভুচন্দ্র এর সঙ্গে আবার মধ্যযুগের বাঙালী এবং দু-একজন অবাঙালীরও (যথা—রামশাস্ত্রী ও কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ) জীবনকথা লিখেছিলেন।

৪. ১৮৫০ সালের ২৯ মার্চ বীঠন সাহেব এই বিদ্যালয় সম্পর্কে গভর্নর জেনারেল ডালহৌসীকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে মদনমোহনের এই পুস্তক সম্বন্ধে বলেছিলেন, "Pundit Madun Mohun Tarkalunkar...has employed his leisure time in the compilation of series of elementary Bengali books expressly for their (অর্থাৎ উক্ত বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্ত) use." (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ১৩ সংখ্যক পুস্তিকা)

'বোধোদয়'-এর ভাব, ভাষা ও বর্ণনার রীতি ঠিক শিশুরউপযোগী নয়। বিদ্যাবুদ্ধি একটু পরিপক্ক না হলে 'বোধোদয়'-এর বিষয়বস্তু বালক-বালিকার ঠিক বোধগম্য হয় না। বলা বাহুল্য এ গ্রন্থও তিনি বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যই রচনা করেছিলেন। কারণ দীর্ঘকাল ধরে তিনি বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। বালিকাদের মনঃপ্রণালী গঠনের প্রয়োজনীয়তা তাঁর চেয়ে কে বেশী বুঝতে পারতেন ?

বাল্যশিক্ষা-সংক্রান্ত গ্রন্থ নির্বাচন ব্যাপারে তিনি উইলিয়ম ও রবার্ট চেম্বার্স ভ্রাতৃদ্বয়ের রচিত ও সংকলিত ইংরেজী গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন। ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে ছোটলাটপদে যোগ দেবার (১৮৫৪) পূর্বে কিছুকাল শিক্ষা-পরিষদের সদস্য ছিলেন। বাংলা ভাষায় কিভাবে অতি দ্রুত শিক্ষা বিস্তার করতে পারা যায় এ বিষয়ে তিনি (১৮৫৪, মার্চ) একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। সেই রিপোর্টের মূল হচ্ছে বিদ্যাসগর প্রদত্ত তথ্য (১৮৫৪, ফেব্রুয়ারি)। বিদ্যাসাগর বাংলা শিক্ষা প্রচার ও বাংলা স্কুল-পাঠশালার ছাত্রদের জন্য পাঁচভাগে শিশু-শিক্ষাবিষয়ক প্রাথমিক পুস্তক প্রচলনের কথা বলেন। 'শিশুশিক্ষা' তিনভাগে আছে—বর্ণপরিচয়, বানান এবং পঠনশিক্ষা ; চতুর্থভাগে জ্ঞানোদয় সম্পর্কিত একখানি ছোট বই—এ খানাই 'বোধোদয়'। পঞ্চমভাগে ছিল 'Chamber's Educational Course'-এর অন্তর্গত কয়েকটি নীতিপাঠের অনুবাদ।

'বোধোদয়' চেম্বার্সের *Rudiments of Knowledge* অবলম্বনে রচিত হলেও বিদ্যাসাগর অন্য গ্রন্থ থেকেও এর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।[৫]

৫. বিহারীলাল বলেছেন "বিদ্যাসাগর মহাশয় চেম্বর সাহেবের 'Rudiments of knowledge' নামক গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করেন" (ঐ গ্রন্থ ; পৃ. ১৪৮)। কিন্তু চণ্ডীচরণ এ বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করে লিখেছিলেন, "১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে চেম্বার্স রুডিমেণ্টস্ অব নলেজ নামক গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে

(এতে পদার্থ, মানবজাতি, ভাষা, কাল, গণনা-অঙ্ক, বর্ণ, বস্তুর আকার-পরিমাণ, ক্রয়বিক্রয় মুদ্রা, নানা ধাতু, নদী-সমুদ্র, উদ্ভিদ, জন্তু, খনিজ-পদার্থ, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি বালকদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বস্তুর সমাবেশ করা হয়েছিল) অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকারা যাতে একখানি প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক থেকেই জগৎ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান সংগ্রহ করতে পারে, এই ছিল বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য। এটি যে কত জনপ্রিয় হয়েছিল—তার প্রমাণ এর অসংখ্য সংস্করণ। তাঁর জীবিতকালের মধ্যেই এর প্রায় এক শ' সংস্করণ হয়েছিল।

এই নিতান্ত বালপাঠ্য স্কুলের পুস্তক সম্বন্ধেও একদা মতভেদের কারণ ঘটেছিল। এতে বিজ্ঞান বিষয়ক যে সমস্ত তথ্য আছে, তাতে নাকি কিছু তথ্যগত ভুলভ্রান্তি ছিল। পাঠকেরা সেই ভুলগুলি বিদ্যাসাগরকে দেখিয়ে দিলে কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি তা সংশোধন করে দিয়েছিলেন। ত্রিপুরা জেলার রূপসা গ্রামের রীডিং ক্লাবের সম্পাদক মহম্মদ রেয়াজ উদ্দিন আহম্মদ, ডাঃ চন্দ্রমোহন ঘোষ, 'শ্রীমন্ত সওদাগর' পত্রিকার সম্পাদক—এঁরা যেখানে যে ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন, বিদ্যাসাগর তার পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি শুদ্ধ করে এঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ গ্রন্থের একটি বিষয় নিয়ে সে যুগে পাঠকমহলে কিঞ্চিৎ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল।

'বোধোদয়'-এর প্রথম সংস্করণে বহির্জগৎ ও মানবজীবনসম্বন্ধে অনেক তথ্য সঙ্কলিত হলেও ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিল না। এতে নাকি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁকে বলেন, "মহাশয়, ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথাই তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কোন কথা নাই কেন?" বিদ্যাসাগর

বালিকাদিগের পাঠোপযোগী করিয়া 'শিশুশিক্ষা চতুর্থভাগ বা 'বোধোদয়' রচনা করেন।" (ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১৮৯) বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়ে'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন, "বোধোদয় ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল। পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে।"

তখন একটু হেসে বললেন, "যাঁহারা তোমার কাছে এরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে বলিও এইবার যে বোধোদয় ছাপা হইবে, তাহাতে ঈশ্বরের কথা থাকিবেক।"[৬] পরবর্তী সংস্করণে তিনি প্রথমে পদার্থের সংজ্ঞাদি বর্ণনা করে দ্বিতীয় প্রস্তাবে 'ঈশ্বর' বিষয়ে লিখলেন, "ইশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।" পরে এর পাঠ আরও সংশোধিত হয়ে এই আকার ধারণ করে: "ঈশ্বর, কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, কি জড়, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্বদা সবত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি তাহা তিনি দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহার-দাতা ও রক্ষাকর্তা" (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, পৃ. ২৫৯)।[৭] 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'—১৮৪১ সালে প্রদত্ত বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথ নাকি এই উক্তি করেছিলেন।[৮] যাঁরা ব্রাহ্মমতানুকূল ছিলেন না (যথা—চরিতকার বিহারীলাল সরকার) তাঁরা এ পংক্তিটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিরূপতা প্রকাশ করেছেন।[৯] বিদ্যাসাগর এই বালপাঠ্য পুস্তকটিতে

৬. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গল্পটি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মুখেই শুনেছিলেন, সুতরাং এ ঘটনার সততায় অবিশ্বাস করবার কারণ নেই।

৭. তাঁর জীবিতকালের ষন্নবতিতম (১২৯৩) সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত। তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর 'বোধোদয়'-এর কিছু পাঠ সংস্কার করেছিলেন। হয়তো তিনিই এই পরিবর্তন করে থাকবেন। দ্রষ্টব্য—বিহারীলালের গ্রন্থ, পৃ. ২৪৮ (পাদটীকা)

৮. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বরচিত জীবনচরিত-'এর সম্পাদক (৩য় সংস্করণ) বলেছেন, "১৮৪১ সালে প্রদত্ত কোন বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথের 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' এই মহাবাক্য কয়েক বৎসর পরে (১৮৫১) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক তাঁহার 'বোধোদয়' পুস্তকে গৃহীত হয়।" (পৃ. ৬৯)

৯. এঁদের মধ্যে বিহারীলাল সরকার ('বিদ্যাসাগর') এবং তাঁর পদাঙ্ক

কোন দার্শনিক ও জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা পরিবেশন করতে চান নি, তর্কের কচকচি অলসের আরাম; কর্মযোগী ও শিক্ষাপ্রচারক বিদ্যাসাগর এ সমস্ত দার্শনিক তর্কাতর্কির ঘোর শত্রু ছিলেন। অনেকটা 'প্র্যাগম্যাটিকে'র মতো বস্তুর উপযোগের দ্বারা তিনি বস্তুর মূল্য নির্ণয় করতেন। তা না হলে সংস্কৃত ঐতিহ্যের কর্ণধার হয়েও তিনি "বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই"[১০]—এ রকম সাংঘাতিক কথা অবলীলাক্রমে বলতে পারতেন না। শিক্ষা-

অনুসরণ করে সুবলচন্দ্র মিত্র ('Iswar Chandra Vidyasagar' etc.) বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার, শিক্ষাবস্তুর ধর্মবোধ প্রভৃতির মধ্যে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সমর্থন দেখতে পান নি বলে তাঁর ক্রিয়াকর্মকে মাঝে মাঝে কিছু তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছিলেন। বিহারীলাল 'বোধোদয়'-এর অনেক ভুলত্রুটি দেখিয়েছিলেন (তাঁর গ্রন্থ, পৃ. ২৪৮-২৪৯)। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঞ্চানন্দ' নাম নিয়ে বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়'-এর তথাকথিত অসঙ্গতির ব্যঙ্গরসাশ্রিত আলোচনা করেছিলেন (দ্রষ্টব্য, বঙ্গবাসী, ১২৯৩, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ)। বিহারীলালের মতে, "বোধোদয় হিন্দুসন্তানের সম্যক্ পাঠোপযোগী নহে। বোধোদয়ে বুদ্ধির অনেক স্থলে বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবনা। 'পদার্থ তিনপ্রকার—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ'—আর 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' ইহা বালক তো বালক, কয়জন বিজ্ঞতম বৃদ্ধের বোধগম্য হয় বল দেখি?" ('বিদ্যাসাগর' পৃ. ২৪৮)

১০. সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাবিষয়ক চিঠিখানি ইংরেজীতে রচিত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'Iswar Chandra Vidyasagar as an Educationist' প্রবন্ধে (*Modern Review*, October 1927) এর উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' পুস্তিকায় (সা-সা-চরিতমালা, পৃ. ৩৫) তার অনুবাদ আছে। সেখানে শিক্ষাসংস্কার প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর হিন্দু ষড়দর্শনের অন্তর্ভুক্ত অলস দার্শনিক চিন্তাকে কার্যোপযোগী শিক্ষার প্রতিকূল মনে করেছিলেন। সেই পত্রে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দুদর্শনে, এমন অনেক অংশ আছে, যাহা ইংরেজীতে সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করা যায় না; তাহার কারণ সে-সব অংশের মধ্যে পদার্থ কিছু নাই।" (ব্রজেন্দ্রনাথ অনূদিত)।

বিভাগের সম্পাদক (কাউন্সিল অব এডুকেশনের সেক্রেটারী) এফ. জে. ময়েট সায়েব সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপ্রকরণকে আধুনিক করবার অভিপ্রায়ে বিদ্যাসাগরকে একটি রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করলে তিনি সেই প্রসঙ্গে (১৮৫০, ১৬ ডিসেম্বর) হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বলেন, "ইহা অতি সত্যকথা যে, হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রের অধিকাংশের সহিত আধুনিক সময়ের উন্নত চিন্তার সেই সাদৃশ্য অল্পই লক্ষিত হয়।....যুবকেরা এই পদ্ধতি অনুসারে (অর্থাৎ ইংরেজী শিখে পাশ্চাত্যদর্শন অধিগত করলে) শিক্ষিত হইলে সহজেই প্রাচীন হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রের ভ্রমপ্রমাদাদি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে।"[১১] এই উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে, আধুনিক বিশ্ববোধের পটভূমিকায় তিনি হিন্দুদর্শনকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর ব্যক্তিগত আচার-আচরণে রক্ষণশীল মতাবলম্বী কেউ কেউ তাঁর ওপর প্রচ্ছন্নভাবে বিরূপ হয়েছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে বন্ধু-মহলে তিনি যে সমস্ত অভিমত প্রকাশ করতেন তার জন্যও কেউ কেউ তাঁকে হিন্দু আচারের কোটর থেকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। সুতরাং 'বোধোদয়'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় পদার্থ সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি লেখার পর স্বল্প কয়েক ছত্রে ঈশ্বরের কথা—তাও আবার পৌরাণিক দেবসঙ্ঘ নয়, একেবারে ব্রাহ্মসমাজঘেঁষা 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ'—সে যুগে ব্রাহ্মবিদ্বেষী রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষে এ উক্তি পরিপাক করাও কিছু আয়াসসাধ্য ছিল। কিন্তু 'বোধোদয়'-এর কয়েক স্থলেই ঈশ্বরের উল্লেখ আছে। যেমন—"ঈশ্বর কেবল প্রাণীদিগকে চেতনা দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কাহারও চেতনা দিবার ক্ষমতা নাই" (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, পৃ. ২৬০)। "ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে কোন বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা তাহা অবগত নহি....বিশ্বকর্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে সকল বস্তুই সমান" (ঐ, পৃ. ২৬২)। আসলকথা, "সুকুমারমতি বালক-বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশায় অতি সরল

১১. বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃ. ২২৫ ২২৬

ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত" বিদ্যাসাগর চেষ্টা করেছিলেন। তাই এতে অনাবশ্যক, জটিল ব্যাপার পরিত্যাগ করেছেন। এতে তিনি "ইতস্ততঃ পরিদৃশ্যমান বস্তু সমুদয়কে" পদার্থ বলেছেন বলে বিহারীলাল সরকার দার্শনিক তত্ত্ব উত্থাপন করে এ কথার বিরুদ্ধে বলেছেন, "পদার্থ শব্দের এরূপ অর্থগ্রহ বড় অর্থহীন। সংস্কৃতদর্শনে যাহা কিছু শব্দবাচ্য, তাহাই পদার্থ জাতি, গুণ অধিক কি—অভাবও পদার্থ।" ভারতীয় দর্শনে অতিশয় অভিজ্ঞ বিদ্যাসাগর পদার্থের দার্শনিক অর্থ যথেষ্ট অবগত ছিলেন। কিন্তু দার্শনিক জ্ঞানের চেয়ে আর একটি জ্ঞান তাঁর আরও বেশী অধিগত হয়েছিল—তার নাম কাণ্ডজ্ঞান। (তাঁর প্রখর কাণ্ডজ্ঞান ছিল বলে তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকার মাথায় 'ঘটত্ব-পটত্বে'র পাষাণভার চাপাতে চান নি, বাস্তব জীবনে চলবার জন্য তাদের যেটুকু সাধারণ জ্ঞান দরকার, তিনি তাদের তাই দিতে চেয়েছিলেন। সেদিক থেকে 'বোধোদয়' আদর্শ বালপাঠ্য গ্রন্থ।)

৪.

সংস্কৃত সাহিত্যের মুকুটমণিস্বরূপ শকুন্তলা অনুবাদের কিছু পূর্ব থেকেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষা, বিশেষতঃ ব্যাকরণ শিক্ষা সুগম করবার জন্য 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' অবলম্বনে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্বে তিনি 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' (১৮৫১) লিখে সংস্কৃত কলেজের প্রথম শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সহজ পথ নির্ধারণ করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য থেকে মূল্যবান দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে 'ঋজুপাঠ' (১ম-১৮৫১, ২য়-১৮৫২, ৩য়-১৮৫৩) সঙ্কলন করেছিলেন এবং প্রত্যেক খণ্ডে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ও গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু 'উপক্রমণিকা' আকারে ক্ষুদ্র এবং নিম্নশ্রেণীর বালকের উপযোগী। অধিকতর অগ্রবর্তী ছাত্র এবং যাঁরা ব্যাকরণের সাহায্যে জটিল সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশ করতে চান, তাঁদের জন্য তিনি চারখণ্ডে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' (১ম-১৮৫৩, ২য়-১৮৫৩, ৩য়-১৮৫৩, ৪র্থ-১৮৬২) প্রণয়ন

করেন। বলা বাহুল্য দীর্ঘকাল ধরে বাংলার স্কুল-কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষার একমাত্র গ্রন্থ হিসেবে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' প্রচলিত আছে, কয়েক পুরুষ ধরেই এই গ্রন্থ প্রতি গৃহে স্থান পেয়ে আসছে। ১৮৫৪ সালে 'শকুন্তলা' রচনার পর বৎসর থেকে বিদ্যাসাগর গুরুতর ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়লেন, বিধবাবিবাহ প্রচলনবিষয়ক পুস্তিকা প্রচার করে অল্পকালের মধ্যে চারিদিকে প্রবল আলোড়ন তুললেন। কিন্তু সেই মানসিক উত্তেজনার সময়েও তিনি শিশুশিক্ষা-সংক্রান্ত বর্ণ-বোধ জাতীয় পুস্তিকা লিখবার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং ১৮৫৫ সালে মাত্র দু-তিন মাসের ব্যবধানে 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ' (১৮৫৫, এপ্রিল) এবং দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৫, জুন) প্রকাশ করে শিশুদের প্রাথমিক স্তরের পুস্তিকা রচনার পথ দেখালেন।

বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের পূর্বেও ছাপার অক্ষরে এই জাতীয় কিছু কিছু পুস্তিকা বাজারে চলত। ১৮২১ সালে প্রকাশিত রাধাকান্ত দেবের 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে' নানা বিষয়ের সঙ্গে বর্ণ ও বানান উল্লিখিত হয়েছিল। অবশ্য তার সঙ্গে ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা পাঠ সংগৃহীত হয়েছিল।[১২] কিন্তু এই বৃহৎ গ্রন্থ (২৮৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) শিশু বা অল্পবয়সী ছাত্রদের আদৌ উপযোগী ছিল না। এর অনেক পরে স্কুল বুক সোসাইটি থেকে 'বর্ণমালা প্রথম ভাগ' মুদ্রিত হয়[১৩] এবং বোধ হয় ১৮৫৩ সালের কিছু পূর্বে প্রকাশিত হয়; তারপর এই প্রতিষ্ঠান থেকেই 'বর্ণমালা দ্বিতীয়ভাগ' (১৮৫৪) মুদ্রিত হয়।[১৪]

১২. পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৬২ (বিনয় ঘোষ—শিক্ষক বিদ্যাসাগর)

১৩. এর আখ্যাপত্র এই রকম—বর্ণমালা / প্রথম ভাগ / Barna-Mala / Part 1 / Calcutta / Printed at the Calcutta School Book Society's Press.

১৪. এর আখ্যাপত্র এই রকম –

শিশু সেবধি—বর্ণমালা প্রথম ভাগ। বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে হিন্দু কালেজান্তর্গত

যদিও এর বর্ণবিন্যাসপ্রণালী বিজ্ঞানসম্মত নয়, তবু এর জনপ্রিয়তা কম ছিল না। কারণ ষষ্ঠ ও সপ্তম সংস্করণে এর দশহাজার করে বিশহাজার কপি মুদ্রিত হয়েছিল। এতে প্রাচীন ধরণের প্রণালীই অনুসৃত হয়েছিল। এতেও স্বর-ব্যঞ্জন বর্ণের শ্রেণীভেদ ভালো করে দেখানো হয় নি। যুক্তাক্ষর ত্র্যক্ষরযুক্ত, স্বরান্ত ত্র্যক্ষর, স্বরান্ত চতুরাক্ষর, স্বরান্ত পঞ্চাক্ষর ইত্যাদি ভেদে পাঠক্রম সজ্জিত হওয়ার জন্য প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে তাতে বিশেষ অসুবিধা হবার কথা। এরপর হিন্দু কলেজের বাংলা পাঠশালার সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন দত্ত ১৮৫৪ সালে প্রথম ভাগ বর্ণমালা ('শিশুসেবধি') এবং আরও দু'ভাগ, মোট তিনভাগে প্রকাশ করেন।[১৫] অবশ্য এতেও শিশুশিক্ষাপ্রণালী বিশেষ উন্নত হয় নি। বিদ্যাসাগরের বান্ধব মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৪৯-৫০ সালের মধ্যে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য 'শিশুশিক্ষা' রচনা করেন। কিন্তু বর্ণমালা-সংক্রান্ত এতগুলি পুস্তিকা প্রচলিত থাকলেও বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের বিশেষ মূল্য স্বীকার করতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে পুস্তিকা দু'খানি (বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ ও বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ) সারা বাংলাদেশের শিশুসমাজে চলে আসছে। শোনা যায়, প্যারীচরণ সরকার এবং বিদ্যাসাগর একদা সিদ্ধান্ত করেন যে, দু'জনে ইংরেজী ও বাংলায় বর্ণশিক্ষা বিষয়ক প্রাথমিক পুস্তিকা লিখবেন। তদনুসারে প্যারীচরণ *First Book of Reading* এবং বিদ্যাসাগর 'বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ' প্রকাশ করেন। ১৮৫৫ সালে কয়েক মাসের ব্যবধানে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হয়। বিদ্যাসাগর মফঃস্বলে স্কুল পরিদর্শনের সময় পথিমধ্যে পালকীতে বসে বর্ণপরিচয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন।[১৫] বিহারীলাল সরকারের

বাঙ্গালা পাঠশালার নির্বাহক শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বারা সংগৃহীত হইয়া নবমবার মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১৫. বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃ. ৩৩৪ (৪র্থ সং)

মতে, "প্রথম প্রকাশে বর্ণপরিচয়ের আদর হয় নাই। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরাশ হন ; কিন্তু ক্রমে ইহার আদর বাড়িতে থাকে।"[১৬] বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে বিদ্যাসাগর স্বর-ব্যঞ্জন হিসেবে বাংলা বর্ণমালাকে সাজাতে গিয়ে পূর্বপ্রচলিত ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জনের মধ্যে দীর্ঘ ৯কার ও দীর্ঘ ৡকার বাংলায় ব্যবহৃত হয় না বলে এ দুটি স্বরকে বাদ দিয়েছিলেন।[১৭] অনুস্বর-বিসর্গকেও তিনি স্বরবর্ণমালা থেকে বহিষ্কৃত করে ব্যঞ্জনের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং চন্দ্রবিন্দুকে স্বতন্ত্র অক্ষরের (ঁ) মর্যাদা দেন। ক্ষ-কে (ক + ষ) তিনি ব্যঞ্জন বর্ণমালা থেকে বাদ দিয়েছেন, কারণ এ দুটি হচ্ছে যুক্তব্যঞ্জন, অযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথমভাগে তার ঠাঁই হওয়া উচিত নয়। ড, ঢ ও য ব্যঞ্জন তিনটি পদের মধ্যে বা অন্তে থাকলে যথাক্রমে ড়, ঢ় ও য় হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগর এদের উচ্চারণ-পার্থক্য ও গঠন-পার্থক্যের জন্য স্বতন্ত্র হরফের মর্যাদা দিয়েছেন। এই পুস্তিকার ষষ্ঠিতম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি অক্ষরের উচ্চারণরীতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছিলেন। বর্ণসংযোগের সঙ্গে তিনি অর্থবহ কিছু কিছু পাঠও দিয়েছিলেন। চতুর্দশ থেকে বিংশ পাঠ পর্যন্ত তিনি সর্বত্র কোন-না-কোন প্রকার কাহিনীর উদাহরণ দিয়েছেন। সেকালের শিশুচিত্তে সর্বপ্রথম কাহিনীর রস সঞ্চারিত হয় 'বর্ণপরিচয় প্রথম-

---

১৬. ঐ

১৭. অবশ্য এদেশে কোনকালেই খুঁত ধরার লোকের অভাব হয় না। বিদ্যাসাগর কেন ৯ ও ৡ স্বরবর্ণ থেকে তুলে দিলেন তার জন্য ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ ('বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক), ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্ন—এঁরা তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছিলেন, দীর্ঘ ৯-কারযুক্ত দুটি-একটি শব্দ বাংলাতেও ব্যবহৃত হয়, যেমন—'পিতৄণ'। কিন্তু দীর্ঘ ৡ কারযুক্ত কোন শব্দই বাংলায় নেই, সংস্কৃতেই বা কটা আছে ? বিদ্যাসাগর বাস্তব প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে বাংলা ভাষার পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন বর্ণ দুটিকে তুলে দিয়েছিলেন।

ভাগ' থেকে। এখনকার বালক-বালিকারা 'কিণ্ডার গার্টেন' পদ্ধতি অনুযায়ী নানাধরনের রংবেরঙের বানান-বই পড়ে, কিন্তু এক শতাব্দীর আগের শিশুরা যখন নিরাভরণ বর্ণপরিচয়ের পর বর্ণযুক্ত শব্দ শিখত, সুর করে পড়ত—"কর খল ঘট জল...অচল অধম অপর অলস...পথ ছাড়....জল খাও....হাত ধর...বাড়ী যাও", তখন নতুন অর্থ আবিষ্কারে তারা নিশ্চয়ই খুশি হত। শিশু রবীন্দ্রনাথ 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান পার হয়ে যেদিন 'জল পড়ে পাতা নড়ে'-র কূল পেলেন সেদিন ঐ পংক্তিটি তাঁর জীবনে আদি কবির প্রথম কবিতা হয়ে দেখা দিল।[১৮] বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়ে অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে বর্ণসংযোগের দৃষ্টান্ত নির্বাচন করেছিলেন। প্রথম দিকের পাঠে স্বর-ব্যঞ্জনের সংযোগে শব্দ-গুলিকে শুধু স্বর ও ব্যঞ্জনের সংযোগ ও ক্রম-অনুসারে সাজিয়েছিলেন, অর্থের দিকে সঙ্গতি রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি। যথা—অধিকার—পরিহাস—পুরাতন—অনুধাবন—অকুতোভয়—নিরভিমান। কিন্তু প্রথম পাঠ (বি. র. ২, ১৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য) থেকে বর্ণসংযোগ ও সঙ্গতি আনবার চেষ্টা করলেন। যথা—প্রথম পাঠের ঃ বড় গাছ—ভাল জল—লাল ফুল—ছোট পাতা—বা অষ্টম পাঠের ঃ কাক ডাকিতেছে—গরু চরিতেছে—পাখী উড়িতেছে—জল পড়িতেছে—পাতা নড়িতেছে ফল ঝুলিতেছে। অর্থাৎ প্রথমে শুধু শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে পরে এক

১৮. 'জীবনস্মৃতি'-তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমারও শিক্ষা সেই সময় শুরু হইল কিন্তু সে কথা আমার মনেও নাই। কেবল মনে পড়ে "জল পড়ে পাতা নড়ে"। তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান পার হইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি 'জল পড়ে পাতা নড়ে'—আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা।" অবশ্য আমরা বর্ণপরিচয়ে পুরাতন যে মুদ্রণ দেখেছি তাতে শব্দগুলি এইভাবে আছে—"কথা কয়। জল পড়ে। মেঘ ডাকে। হাত নাড়ে। খেলা করে।" একেবারে প্রথম দিকের সংস্করণে "জল পড়ে। পাতা নড়ে" ছিল কি না জানা যাচ্ছে না। তবে অষ্টম পাঠের অনুশীলনে 'পাতা নড়িতেছে' বাক্যটি আছে।

শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সংযোগে অর্থোপপত্তির দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। ক্রমে শিশু যত অগ্রসর হবে, ততই সে একাধিক শব্দের সংযোগে বাক্যের মধ্যে অনাস্বাদিত অর্থের রস খুঁজে পাবে। দ্বাদশ পাঠ থেকেই বর্ণের সংযোগে পরস্পর-অর্থ-বিশিষ্ট অনুচ্ছেদ রচনার দিকে তিনি আকৃষ্ট হলেন। যথা—চতুর্দশ পাঠ। "আর রাত্তি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া কাপড় পরি। কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি। ভাল করিয়া না পড়িলে পড়া বলিতে পারিব না। পড়া বলিতে না পারিলে, গুরু মহাশয় রাগ করিবেন; নূতন পড়া দিবেন না।" লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই পাঠগুলির সবই লেখাপড়া, পাঠশালায় যাওয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত। এর মধ্যে কয়েকটি পাঠে অমনোযোগী শিথিলপ্রকৃতির দুষ্ট বালকের কথাও আছে। ষোড়শ ("দেখ রাম, কাল তুমি, পড়িবার সময়, বড় গোল করিয়াছিলে।") সপ্তদশ ("নবীন, কাল তুমি বাড়ী যাইবার সময়, পথে ভুবনকে গালি দিয়াছিলে।") অষ্টাদশ ("গিরিশ, কাল তুমি পড়িতে এস নাই কেন?") পাঠে অমনোযোগী এবং একটু দুষ্ট প্রকৃতির বালকের কথা আছে এবং উদাহরণগুলি সবই শিক্ষক মহাশয়ের জবানীতে বলা হয়েছে। গুরুমহাশয় দুষ্ট ও অমনোযোগী ছাত্রকে পাঠে অবহেলার জন্য কোথাও শারীরিক নিগ্রহ করেন নি। স্বয়ং বিদ্যাসাগর পিতার কাছে বাল্যকালে প্রচুর শারীরিক নিগ্রহ ভোগ করেছিলেন, কিন্তু নিজে শিক্ষক এবং শিক্ষাবিভাগের অন্যতম কর্ণধার হয়ে বালকশিক্ষায় শারীরিক নিগ্রহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। শিক্ষক মহাশয়েরা অপরাধী বা অমনযোগী ছাত্রকে বেত্রাঘাত করলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হতেন। তাই বলে দুর্বিনীত ছাত্রের অশিষ্টতাকে তিনি সহ্য করতেন না, উচিত শাস্তি বিধান করতেন। একবার দলবাঁধা ছাত্রদের অশিষ্টতা দূর করার জন্য তিনি মেট্রোপলিটান ও সংস্কৃত কলেজের অনেক ছাত্রকে সরাসরি তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু

পরে তারা অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাদের সব অপরাধ ভুলে যান।

ঊনবিংশ ও বিংশ পাঠে তিনি গোপাল ও রাখালের কথা লিখেছিলেন। সুশীল-সুবোধ-গোপাল পাঠে সব সময় আন্তরিক যত্নবান, সকলের সঙ্গে তাদের ব্যবহারও চমৎকার। তাই "গোপালকে যে দেখে, সেই ভালবাসে।" কিন্তু বিংশ পাঠের রাখাল একেবারে গোপালের বিপরীত —পাঠে অমনোযোগী, দুর্দান্ত ও খলপ্রকৃতির 'প্রব্লেম চাইল্ড'। তাই "রাখালকে কেহ ভালবাসে না।" বিদ্যাসাগর বালকদের উপদেশ দিয়েছেন, "সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত।....কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়।" এখানে তিনি শিশুমনে নীতি-উপদেশ মুদ্রিত করবার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু সকলের ভালোবাসা লাভ করাই সে উপদেশের লক্ষ্য এ কথাও স্বীকার করতে হবে। যাই হোক আজ এক শতাব্দী ধরে অজস্র সংস্করণের মধ্য দিয়ে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ প্রচারিত রয়েছে। শিশুমনের, উপযোগী বর্ণশিক্ষা, বানান ও শব্দশিক্ষা, একাধিক শব্দের দ্বারা সরলবাক্য তৈরি, সরলবাক্য থেকে মিশ্র ও যৌগিক বাক্য এবং বাক্য থেকে অনুচ্ছেদ রচনা করে তিনি শিশুশিক্ষার এক নতুন পদ্ধতি তৈরী করেন। অধুনা শিশুমনোরঞ্জক অনেক পুস্তিকা বাজার ছেয়ে ফেললেও এখনও বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের প্রয়োজন ফুরোয় নি।

বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের প্রকাশের অল্প কয়েকমাস পরে 'বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ' প্রকাশিত হয় (১লা আষাঢ়, ১৯১২ সংবৎ)। এতে প্রধানতঃ যুক্তব্যঞ্জনের দৃষ্টান্তগুলি শেখান হয়েছে। যাকে সেকালে ফলা-বানান বলত, দ্বিতীয়ভাগে সেই সমস্ত দুরূহ যুক্তব্যঞ্জনাত্মক শব্দ চমৎকার বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিন্যস্ত হয়েছে। কিভাবে দ্বিতীয় ভাগে বানান পড়াতে হবে, তিনি 'বিজ্ঞাপনে' শিক্ষকমহাশয়দের তার নির্দেশ দিয়ে লিখেছেন, "বালকদিগের সংযুক্ত বর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সংযুক্তবর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে,

শিক্ষকমহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগমাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণবিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরু শিষ্য উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষাবিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।" এখানে তিনি যুক্তব্যঞ্জন শেখাবার যথার্থ রীতি নির্দেশ করেছেন। যুক্ত-ব্যঞ্জন আয়ত্ত করা বালকের পক্ষে[১৯] এমনিতেই কষ্টসাধ্য, স্মৃতি ছাড়া পথ নেই। এর ওপর যদি "ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য,মুখ্য, অখ্যাতি, উপাখ্যান"-এর অর্থ শেখাতে হয়; তা হলে শিশুপাল বধ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাই তিনি শুধু বানান শেখাতে নির্দেশ দিয়েছেন, শব্দার্থ নয়।

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগে দশটি পাঠ সংযোজিত হয়েছে। প্রথমে তিনি যুক্তব্যঞ্জনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তারপর একটি পাঠ সংযুক্ত করে তাতে উক্ত যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার করেছেন। কারণ "ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক এক পাঠ দেওয়া হইয়াছে" (বিজ্ঞাপন)। শিক্ষকমহাশয় উক্ত পাঠগুলির "অর্থ ও তাৎপর্য স্ব স্ব ছাত্রদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন।" ঐ পাঠসংযোজনার এই ছিল তাৎপর্য। এতে দশটি উপচ্ছেদে বর্ণ-সংযোগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। বর্ণ-সংযোগের যত রকম permutation-combination ব্যাকরণ ও অভিধানে স্বীকৃত হয়েছে, বিদ্যাসাগর অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বস্তুতঃ সে যুগের লোকেরা যে আধুনিক কালের মতো হাস্যকর বানান ভুল করত না, তার প্রধান কারণ বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ। এর বানান-বিন্যাসের রীতিও চিত্তাকর্ষক।

১৯. বানানশিক্ষাকারী বালকদের বয়স ৮-৯ বৎসর হবে। কারণ বিদ্যাসাগর দ্বিতীয়ভাগের চতুর্থ পাঠে যাদবের বয়স আট এবং পঞ্চম পাঠের নবীনের বয়স নয় বৎসর বলেছেন।

প্রথমে ছোট-ছোট শব্দ দিয়ে শুরু করে ক্রমে ক্রমে তিনি জটিল শব্দের বহর বাড়িয়েছেন। প্রথমে 'যাজ্ঞা' থেকে শুরু করলেন, 'যাজ্ঞা, কজ্জল, লজ্জা, লজ্জিত'....। শেষ হল—'অভিসন্ধি, আস্পদ, পরস্পর, স্ফটিক, আস্ফালন'-এ। শব্দগুলির বিন্যাসে এমনভাবে শ্রুতিমধুর শব্দের সাহায্য নেওয়া হয়েছে যে, শিশুমন স্বতঃই তার ধ্বনিরসে মুগ্ধ হয়ে বারবার আবৃত্তি করতে উৎসাহিত হয়। ফলে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির ফলে বিশুদ্ধ বানান যেমন কণ্ঠস্থ হয়ে যায়, তেমনই তার ধ্বনিটিও মনে গেঁথে যায়। 'আম্র, তাম্র, নম্র, সম্রাট'—এর মধ্যে ছন্দের দোলা আছে—যা সহজেই ধ্বনিরূপের মধ্য দিয়ে স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা হয়; পরবর্তী কালেও অভ্যস্ত চোখ-কান ও হাতের গুণে বানান ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না। 'আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী'—অন্ততঃ বানান শিখতে গেলে এ-কথা না মেনে উপায় নেই। ইদানীং বর্ণ-বানান শিখবার জন্য অজস্র রংদার পুস্তিকা প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু তবু অধুনা শিক্ষিত ব্যক্তিরও এত বানান ভুল হয় কেন, সর্বোচ্চ সাহিত্য-পরীক্ষার্থীও হাস্যকর বানান ভুল করেন কেন, এ-কথা ভেবে দেখলে মনে হয়—আমরা যতই বানান সংস্কার করি না কেন, এখনও এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরকে অতিক্রম করতে পারি নি। বানান আবৃত্তি করা, স্মৃতিজাত করা, চোখে দেখা, কানে শোনা এবং হাতে লেখা—এই পদ্ধতিতেই সে-যুগের পাঠশালায় বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ বালকদের পড়ানো হত; 'ঊর্দ্ধ, জিহ্মগ, আঘ্রাত, উদ্গম, আকাঙ্ক্ষা' প্রভৃতি বিচিত্র বানানগুলি যুগপৎ চোখে দেখে এবং কণ্ঠস্থ করে, তার রূপ ও ধ্বনি দুই-ই শিখতে হত। এর ফলে কি কারণে কোন্ বানান হয়েছে, তার বৈয়াকরণ ও ও ভাষাতাত্ত্বিক কারণ না জেনেও কেউ সহসা বানান ভুল করত না। বিদ্যাসাগর অতিশয় বিচক্ষণতার সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জন-যুক্ত শব্দ বিন্যাস করেছিলেন বলেই আজ এক শতাব্দী ধরে যুক্তব্যঞ্জনের জটিল বানানপদ্ধতি আট-নয় বৎসরের বালকের পক্ষে আয়ত্ত করা সহজ হয়েছে।

দ্বিতীয়ভাগ-পাঠার্থী ছেলেদের বয়স একটু বেড়েছে। সুতরাং তাদের পাঠ বা উদাহরণগুলি একটু জটিল ও দীর্ঘ হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠে ('য'-ফলা ও 'র'-ফলার দৃষ্টান্ত) শুধু সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পাঠে সুশীল বালকের দৃষ্টান্ত, চতুর্থ পাঠে দুষ্ট ও অমনোযোগী বালকের কথা, পঞ্চম পাঠে নবীন নামে অমনোযোগী বালকের পাঠে মনোনিবেশ করার কাহিনী উপদেশের রীতিতে বিবৃত হয়েছে। অষ্টম পাঠে পিতামাতার প্রতি সন্তানের ব্যবহারের বিষয় বলা হয়েছে। নবম পাঠে সুরেন্দ্র নামে একটি বালকের বর্ণনায় দেখানো হয়েছে, সে না জেনে বালকবুদ্ধিবশতঃ ঢেলা ছুঁড়ে পাখী মারতে গিয়ে এক বালকের মাথায় রক্তপাত করে। শিক্ষক তাকে এর জন্য মৃদু ভর্ৎসনা করলে সে নিজ অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইল, তখন শিক্ষক সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সদুপদেশ দিলেন। দশম পাঠের সর্বশেষে গল্পটিতে ('চুরি করা কদাচ উচিত নয়') চৌর্যবৃত্তির শেষ পরিণাম, বাল্যকাল থেকে এই কদাচার দূর করে না দিলে সরল বালকেরও কতদূর অধঃপতন হয় এবং তার শেষফল কী নিদারুণভাবে অভিভাবক-অভিভাবিকাকে ভোগ করতে হয় তার এক নাটকীয় বৃত্তান্ত এই উপাখ্যানে বিবৃত হয়েছে। বস্তুতঃ এটিকে আমরা যথার্থ ছোটগল্পও বলতে পারি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভুবনের এই গল্প বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা নয়। এটি টমাস জেম্‌স্‌ অনূদিত *Æsop's Fables*-এর অন্তর্গত 'The Thief and His Mother'-গল্পের প্রায় স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।

ভুবনকে শৈশব থেকেই তার মাসী তাকে লালন-পালন করেছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই ভুবনের কিছু হাতটান অভ্যাস হয়ে গেল। সে পাঠশালার সহপাঠীদের দু-একখানি বই চুরি করে আনতে লাগল। তার মাসী জানতে পেরেও স্নেহাধিক্যের জন্য তাকে কিছু বলতেন না। এই হানিকর প্রশ্রয় পেয়ে ক্রমে সে পাকা চোর হয়ে উঠল এবং প্রচুর

চৌর্যাপরাধে বিচারকর্তা ভুবনের ফাঁসীর আদেশ দিলেন।[২০] ফাঁসীর আসামীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়। ভুবন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ভোগ করার আগে মাসীকে দেখতে চাইলে মাসী এসে খুব কান্নাকাটি করতে লাগলেন। "ভুবন কহিল, মাসী! এখন আর কাঁদিলে কি হইবে? নিকটে এস, কানে কানে তোমায় একটা কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার কানের নিকট মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া দাঁত দিয়া তাঁহার একটি কান কাটিয়া লইল। পরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, মাসী! তুমিই আমার এই ফাঁসীর কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এই পুরস্কার।" এই গল্পটি যেমন চমকপ্রদ, তেমনি নাটকীয়। অভিভাবক-অভিভাবিকার স্নেহাতিশয্যের ফলে অনেক সময় ভুবনের দল বিপথে যায়। ক্রমে গুরুজনের উদাসীনতার সুযোগে তারা ধাপে ধাপে নেমে যায়। দুর্বিনীত উদ্ধত চোর ভুবন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বুঝতে পারল, তার নিদারুণ পরিণামের জন্য তার মাসীর অন্ধ স্নেহই প্রধানতঃ দায়ী। তাই মৃত্যুর আগে সে মাসীর প্রতি চরম নির্মমতা প্রকাশ করে চূড়ান্ত অকৃতজ্ঞের ব্যবহার করল। সে যে-চরিত্রের ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে, এবং সামনে ফাঁসীর দড়ি দেখে যেভাবে বিচলিত হয়েছে, তাতে তার সমস্ত দুষ্কর্মের মূল কারণ মাসীর অন্ধ স্নেহ—তার এইরকম ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। এই রচনাটি বালক-বালিকাদের প্রতি উদ্দিষ্ট নয়, এ হচ্ছে অভিভাবক-দের প্রতি সাবধানবাণী। 'Spare the rod and spoil the child'

২০. বলা বাহুল্য চুরির অপরাধে ফাঁসির আদেশ অনেককাল পূর্বে (মধ্যযুগের য়ুরোপে এবং মুসলমানযুগের ভারতবর্ষে) প্রচলিত থাকলেও আধুনিকযুগে লঘুপাপে গুরুদণ্ডের প্রথা রহিত হয়ে গিয়েছে। এখানে চুরির চূড়ান্ত পরিণাম দেখাবার জন্য বিদ্যাসাগর ভুবনের চৌর্যবৃত্তির পরিণাম ভয়াবহরূপে এঁকেছেন *Aesop's Fables*-এর অনুসরণে।

এবং 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ'—সে যুগের বালশিক্ষায় এই নীতিই অনুসৃত হত। য়ুরোপেও অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে বালক-বালিকাদের শিক্ষার সঙ্গে কায়িক দণ্ডের ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা তার কিছু পূর্ব থেকে ওদেশের বালশিক্ষায় চণ্ডনীতি ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। প্রসিদ্ধ সুইডিশ শিক্ষাবিদ্ জোহান হাইনরিখ পেস্তালোৎজি (১৭৪৬-১৮২৭) এবং জার্মান শিশুশিক্ষাবিদ্ ফ্রেড্রিখ উইলহেল্ম্ অগাস্ট ফ্রোয়েব্ল্ (১৭৮২-১৮৫২) শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে মনোরম নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। শিশুমনের তলে সুপ্ত বৃত্তিগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে এবং শিক্ষাপ্রণালী থেকে সকলপ্রকার শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন তুলে দিয়ে তাঁরা যে পদ্ধতিতে বালক-বালিকার শিক্ষার পথ দেখিয়েছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই সেই শিক্ষানীতি ব্যাপকভাবে শিশুশিক্ষায় গৃহীত হতে থাকে। কারও কারও মতে [২১] বিদ্যাসাগর সম্ভবতঃ এই পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। কারণ তখন য়ুরোপে এই পদ্ধতি নিয়ে তুমুল বাদপ্রতিবাদ চলছিল। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সংগ্রহেও প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক ইংরেজী পুস্তিকা পাওয়া গেছে। এই সংগ্রহে রেভাঃ বোম্ওয়েচ নামে এক পাদ্রী লেখক প্রণীত শিশুশিক্ষা সংক্রান্ত দু'খানি পুস্তিকা আছে—(১) 'পাঠনা প্রণালীর প্রদর্শিকা' (১৮৬৩) এবং (২) 'শিশুর প্রথম পাঠনা পুস্তক' (১৮৬২)। এতে রেভারেণ্ড মহাশয় পেস্তালোৎজি-র আদর্শে চণ্ডনীতি পরিহার করে প্রীতির মাধ্যমে শিশুশিক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর মন্তব্যটি আজ শতাধিক বৎসর পরেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়—"শিশুরা ত কিছু পাথর নয়, শাল কাষ্ঠও নয় যে, তাহাদিগকে লইয়া বড় কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা চারাগাছ, সহজে নোয়ান যায়।........ অতি অল্প বাদে প্রায় সকল শিশুরা শিখিতে ভালবাসে। শিখিতে না

---

২১. পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৬২ (বিনয় ঘোষ—শিক্ষক বিদ্যাসাগর)

ভালবাসিবার কারণ প্রথমে অনুচিত সময়ে আরম্ভ করা; দ্বিতীয় বিপরীত প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দেওয়া।" বিদ্যাসাগর ঠিক এই মতাবলম্বী হয়ে প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ রচনায় প্রস্তুত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হব্যর কয়েকবছর পরে পাদ্রী বোম্‌ওয়েচ উক্ত পুস্তিকাদ্বয় প্রকাশ করেছিলেন।

বর্ণপরিচয় দু'খানির মধ্যেই অমনোযোগী বালকের বেশী উল্লেখ আছে; শিক্ষকের সদুপদেশে কি করে দুষ্ট ও পাঠে-নিঃস্পৃহ বালক সুপথে ফিরে এল, এ-রকম উদাহরণের দৃষ্টান্তই বেশি। অপরাধের জন্য বালককে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করা হয়েছে, সদুপদেশও দেওয়া হয়েছে। তার ফলে অধিকাংশ বালকই বালসুলভ চপলতা পরিহার করে পাঠে মনোযোগী হবে এই ছিল তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। কিন্তু যাদের সে রকম উন্নতি হয় নি, বরং উত্তরোত্তর অধোগতি হয়েছে, বিদ্যাসাগর তাদের দুর্দশা বর্ণনায় কুণ্ঠিত হন নি। যাদব (দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ পাঠ) অত্যন্ত অমনোযোগী দুর্দান্ত ও অশিষ্ট হয়ে উঠেছিল—যদিও তার বয়স ছিল আট। তার পিতা তাকে নানাভাবে শাসন করলেন, কিন্তু কিছুতেই যখন তার আচার-আচরণ বদলালো না, তখন ক্রুদ্ধ পিতা "সেই অবধি, তিনি যাদবকে ভালবাসিতেন না, কাছে আসিতে দিতেন না, সম্মুখে আসিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন।" মাধব নামে আর একটি দুষ্ট বালক বাল্যবয়স থেকে চুরি অভ্যাস করেছিল। তার চুরির অভ্যাস যখন কিছুতেই দূর হল না, তখন, "এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, তাহার পিতার মনে ঘৃণা জন্মিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বাটী হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।........মাধবের দুঃখের সীমা ছিল না। সে না খাইতে পাইয়া, পেটের জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইত, তথাপি তাহার প্রতি কাহারও স্নেহ বা দয়া হইত না।" যে-বিদ্যাসাগর ছেলেদের এত ভালোবাসতেন, তিনিই আবার রাখাল, যাদব, মাধব ও ভুবনের চরিত্র বর্ণনার সময় ঈষৎ নির্মমতা প্রকাশ করেছেন। মাধব অনাহারে পথে পথে ঘুরে বেড়াত, তবু কারও দয়া হত না—বাস্তব

জীবনে এমন ব্যাপার ঘটলে বিদ্যাসাগর কখনই তা সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ লিখতে বসে বালক-মনে সুনীতি ও চরিত্রাদর্শ সঞ্চার করে দেবার জন্য তিনি এই রকম চরিত্র সন্নিবেশ করে তার বিপরীত সংস্বভাবের বালকের চরিত্র এঁকেছিলেন। সুতরাং তিনি পেস্তালোৎজি বা ফ্রোয়েব্‌ল্‌-এর পদ্ধতির দ্বারা কতটুকু উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাতে গভীর সন্দেহ আছে। সে যাই হোক, বালক-শিক্ষার্থীদের মন উপবন বটে (Kinder Garten = Children's Garden)। কিন্তু তাতে কাঁটাগাছ জন্মালে তাকে তো তুলে ফেলতে হবেই—এই ছিল তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। তাঁর বর্ণ-পরিচয় দু'খণ্ড যে শতাব্দী কাল ধরে শিশুর প্রাথমিক বর্ণবোধ সম্বন্ধে প্রভূত সাহায্য করে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমালোচক যথার্থ বলেছেন, "একশ বছর পরে আজও পর্যন্ত, তার চেয়ে উন্নততর কোন প্রাথমিক পাঠপ্রণালী কেউ উদ্ভাবন করেছেন বলে তো মনে হয় না।" (পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৬২, বিনয় ঘোষের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

৫.

১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগরের 'কথামালা' প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ দিন ধরে এই আখ্যানগ্রন্থ ছাত্রসমাজের পাঠ্যপুস্তক রূপে চলে আসছে। য়ুরোপের ক্লাসিক আখ্যানগ্রন্থ ঈসপের গল্প (*Æsop's Fables*) অবলম্বনে একখানি ছাত্রপাঠ্য আখ্যানগ্রন্থ লিখবার প্রয়োজন তিনি অনেকদিন থেকেই উপলব্ধি করছিলেন। তিনি মনে মনে পরিকল্পনা করেছিলেন, এমন আখ্যানগ্রন্থ লিখবেন যাতে আখ্যানের রসও থাকবে, আবার বালকচরিত্র গঠনোপযোগী নীতি-উপদেশও থাকবে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র এই প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে বটে, কিন্তু এই গ্রন্থ দু'খানিতে উগ্র আদিরসের গল্পও নির্বিবাদে গৃহীত হয়েছে এবং এমন সমস্ত হানিকর বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, ছাত্রদের পক্ষে এ গ্রন্থ আদৌ উপযোগী নয়। ইতিপূর্বে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে' তিনি এই গ্রন্থদ্বয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে

যোগ্যতার নিন্দা করেছিলেন। তাই তিনি ছাত্রপাঠ্য এমন আখ্যান-গ্রন্থের সন্ধান করছিলেন যে, যাতে চরিত্রগঠন ও জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের উপযোগী নীতি উপদেশপূর্ণ গল্প থাকবে। য়ুরোপের 'বিষ্ণুশর্মা' ঈসপের গল্পের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হলেন স্বাভাবিক কারণে। তিনি দেখলেন, এই আখ্যানগুলিতে আদিরসের দূষিত স্পর্শ নেই, বরং চরিত্রগঠনের উপযোগী অনেক সুনীতিপূর্ণ অথচ চিত্তাকর্ষক আখ্যান ঈসপের গল্পকে কালজয়ী করেছে। শিক্ষাবিভাগের কর্ণধার গর্ডন ইয়ং-এর অনুরোধে বিদ্যাসাগর রেভাঃ টমাস জেমস্ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত ঈসপের অনেকগুলি গল্পের সরল বঙ্গানুবাদ করেন। প্রথম সংস্করণে মোট ৬৮টি গল্পের অনুবাদ গৃহীত হয়। কিন্তু সপ্তত্রিংশ সংস্করণে আরও কয়েকটি গল্প সংযোজিত হয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৭৪টি। পরে তাঁর জীবিতকালের সর্বশেষ সংস্করণে গল্পের সংখ্যা হল ৮৪টি। টমাস জেমস অনূদিত *Æsop's Fables* (1848)-এরএকটি বর্ধিতায়তন ও মার্জিত সংস্করণ ১৮৭৪ সালে ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত হয়। এটি বহু সংস্করণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। ১৯২৮ সালের পুনর্মুদ্রিত যে সংস্করণটি বাজারে চলে তাতে উপাখ্যানের সংখ্যা ২০৩। বিদ্যাসাগর মোট ৮৪টি আখ্যান অনুবাদ করেছিলেন।

'কথামালা'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর ঈসপের কাহিনী সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখেছিলেন, "রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, গ্রীস-দেশে ঈসপ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি, কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্পের রচনা করিয়া, আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গল্প ইংরেজী প্রভৃতি নানা য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, এবং য়ুরোপের সর্ব্ব প্রদেশেই, অদ্যাপি, আদর পূর্ব্বক পঠিত হইয়া থাকে। গল্পগুলি অতি মনোহর; পাঠ করিলে বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়।" ঈসপের গল্প য়ুরোপে নানা ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, আধুনিক যুগে প্রাচ্য দেশের ভাষাতেও এর অনেক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

উপন্যাস, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ এবং ঈসপের গল্প অনেককাল থেকেই গল্পবুভুক্ষু পাঠকসমাজে প্রচলিত ছিল। আরব্য-উপন্যাস পরিণত মনের প্রেম-রোমান্স-ষড়যন্ত্রের কাহিনী; অনেক পরবর্তী কালে এগুলি সংগৃহীত হতে থাকে। দশম শতাব্দীর দিকে 'আলফ লায়লা'র (আরব্য উপন্যাস) ২৬৪টি গল্প প্রচলিত ছিল, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, এখন সেই বর্ধিত আকারটিই পৃথিবীর সর্বত্র চলছে। সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র খ্রীঃ ৩০০-৫০০ অব্দের মধ্যে সঙ্কলিত হয় বলে অনুমান করা হয়। খ্রীঃ ৫৭৯ অব্দে প্রাচীন ইরাণীয় ভাষায় এর এক অনুবাদ পাওয়া গেছে বলে মনে হয়, মূল সংস্কৃত গ্রন্থ এর অনেক পূর্বেই রচিত হয়েছিল।

খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দে প্রসিদ্ধ গ্রীক লেখক ঈসপ গ্রীক ভাষায় অনেকগুলি আখ্যান রচনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। এ বিষয়ে নানা পরস্পর-বিরোধী কাহিনী প্রচলিত আছে। এমন কি কেউ কেউ ঈসপ নামে কোন লেখকের অস্তিত্ব পর্যন্ত মানতে চান না। তাঁরা মনে করেন, লোক-সমাজে প্রচলিত গল্প-আখ্যান ঈসপ নামে কোন কল্পিত ব্যক্তির নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হেরোডেটাসের (আনুঃ ৪৮৪-৪২৮ খ্রীঃ পূঃ) মতে আয়ডমন নামে এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ঈসপ অনেক গল্প রচনা করেছিলেন। জনশ্রুতি মতে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাঁর শোচনীয় মৃত্যু হয়েছিল। এ গল্প সত্য-মিথ্যা যাই হোক না কেন, ক্লাসিকাল যুগের অন্যান্য গ্রীক সাহিত্যিকের যাবতীয় নীতিগল্পকেই ঈসপের গল্প বলে প্রচার করা হয়েছিল। মনে হয়, তথা-কথিত ঈসপের গল্পগুলি গোড়ার দিকে মৌখিকভাবে লোকসাহিত্য-রূপেই গড়ে উঠেছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে আখ্যানগুলি এই রীতিতে এক মুখ থেকে আরেক মুখে ছড়িয়েপড়েছিল। প্লেটোর মতে, সক্রেটিস নাকি এই ধরনের গল্পকে ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। এর সব চেয়ে পুরাতন পাণ্ডুলিপির উল্লেখ পাওয়া গেছে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে। ডিমিট্রিয়াস নামে এক ব্যক্তি এই গল্পগুলিকে সর্বপ্রথম

লিখে রাখেন। কিন্তু এর উল্লেখ পাওয়া গেলেও সন্ধান পাওয়া যায় নি। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে গল্পগুলির গ্রীক-গদ্যে লেখা চেহারা কি রকম ছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। এর কিছু ছন্দোময় রূপও পাওয়া যায়। ল্যাটিন ভাষায় ফিড্রাস ও এ্যাভিয়েনাস ঈসপের গল্পের কাব্যানুবাদ করেন, গ্রীক ভাষায় অনুরূপ আকার দেন ব্যাব্রিয়াস। মধ্যযুগে ম্যাক্সিমাস প্ল্যানুডেস্ট্ নামে এক খ্রীস্টান সন্ন্যাসী (চতুর্দশ শতক) পূর্ববর্তী দু'খানি গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে নতুনভাবে ঈসপের গল্প লেখেন। প্রসিদ্ধ গল্প লেখক জঁা দে লা ফোঁতেঁই (১৬২১-১৬৯৫) এরই ওপর ভিত্তি করে পশুপাখী-সংক্রান্ত সরস আখ্যান রচনা করেন। ঈসপের গল্পগুলি সংক্ষেপে চমৎকার গদ্যে লেখা হয়েছে। অবশ্য জীবজন্তুগুলির ভাষা-ভঙ্গিমা, আচার ব্যবহার—সবই মানুষের মতো। বোধ হয় জীবজন্তুর রূপকের মধ্য দিয়ে মানব-সমাজের কথাই প্রকারান্তরে বর্ণিত হয়েছে।[২২] অবশ্য জীবজন্তুর স্বভাব-চরিত্রও গল্পগুলিতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। যেমন—গাধাকে আগাগোড়াই বুদ্ধিহীন গর্দভ করে আঁকা হয়েছে। যেমন—'সিংহ, গর্দ্দভ ও শৃগালের শিকার' (বি. র. ২, পৃ. ৩১৯), 'সিংহচর্মাবৃত গর্দ্দভ' (ঐ পৃ. ৩৩৭), 'গর্দ্দভ, কুক্কুট ও সিংহ' (পৃ. ৩৪১)। এই আখ্যানগুলিতে ভারবাহী গর্দভের মূঢ়তাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মানুষকে গর্দভ বলে গালি দেওয়া তা হলে বহুকাল থেকেই চলে আসছে। ঈসপ তাঁর আখ্যানে শৃগালকে করেছেন অতিশয় ধূর্ত। 'কুকুর, কুক্কুট ও শৃগালে' (পৃ. ৩১৩) ধূর্ততা প্রকাশের জন্য অবশ্য শৃগাল যথেষ্ট শাস্তিও পেয়েছে। 'শৃগাল ও কৃষকে' (পৃ. ৩১৭) শৃগালকে অতি বুদ্ধিমান ও চতুর বলে মনে হয়, সে কৃষকের চাতুরী ঠিক ধরতে পেরেছিল। 'সিংহ, গর্দভ ও শৃগালের শিকার' (পৃ. ৩১৯)

২২. ঈসপের অনেকগুলি আখ্যানেই সমসাময়িক মানবসমাজ ও রাজনৈতিক আবহাওয়ার সাঙ্কেতিক উল্লেখ আছে। জীবজন্তুর আখ্যানের মধ্য দিয়ে তিনি মানবসমাজের কথাই বলতে চেয়েছেন। টমাস জেমস-এর *Aesop's Fables*-এর ভূমিকায় এ বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

গর্দভ বোকামি করে সিংহের কাছে মারা পড়ল, চতুর শিয়াল কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করল। 'লাঙ্গুলহীন শৃগাল'-(পৃ. ৩১১) এর চাতুরী তার জ্ঞাতভাইয়ের কাছে সহজেই ধরা পড়ে গিয়েছিল। 'সিংহ, ভালুক ও শৃগাল'-এর গল্পে (পৃ. ৩৩৫) শৃগালের সুযোগসন্ধানী চাতুরী চমৎকার ফুটেছে। পীড়িত সিংহের (পৃ. ৩৩৬) বিবর থেকে অসাধারণ বুদ্ধি-বলেই শিয়াল বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। 'শৃগাল ও সারসে' (পৃ. ৩৩৭) সারসের সঙ্গে চাতুরী করতে গিয়ে সে নিজেও সে চাতুরীর ফলভোগ করেছে। 'কাক ও শৃগালে' (পৃ. ৩৪৪) 'শঠে শাঠ্যং' বেশ ভালই ফুটেছে। চতুর কাককেও শৃগাল চাতুরীপূর্ণ চাটুবাদিতায় মুগ্ধ করে মাংস খণ্ড কেড়ে নিয়েছিল। 'শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলে' (পৃ. ৩৪৭) চতুর শৃগালের ব্যর্থতাই বলা হয়েছে। 'ভল্লুক ও শৃগালে' (পৃ. ৩৪৮) ভল্লুকের বিদ্রূপের উত্তরে শৃগালের উত্তর যথোপযুক্তই হয়েছে। 'শৃগাল ও ছাগল' (পৃ. ৩৫০)-এর আখ্যানে নির্বুদ্ধি ছাগলকে কূপে ফেলে শৃগাল তাকে ভর করে অতি সহজেই কূপ থেকে উঠে পড়েছে। শুধু শৃগাল নয়, শৃগালীও বুদ্ধি-চাতুরীতে কিছু কম যায় না। ('ঈগল ও শৃগালী', পৃ. ৩৫২)। ঈসপের গল্পে শৃগাল অতি ধূর্ত, কিন্তু তার ধূর্ততার জন্য মাঝে মাঝে প্রতিফলও পেতে হয়েছে। এতে সিংহকে পশুরাজ করেই আঁকা হয়েছে, মেষশাবক হয়েছে ভীত সন্ত্রস্ত। এই সমস্ত গল্পে যে ধরনের নীতি ও ভূয়োদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়, তা অনেক পূর্বকাল থেকেই মানুষ ঠেকে শিখেছে।

আধুনিক যুগে দেখা যাচ্ছে ঈসপের গল্পে ভারতবর্ষের পঞ্চতন্ত্রের কোন কোন আখ্যানের প্রভাব পড়েছে। মধ্যযুগে পঞ্চতন্ত্রের আখ্যান য়ুরোপে প্রবেশ করে বিভিন্ন দেশের গল্পকাহিনীতে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু গ্রীকভাষায় রচিত ঈসপের প্রাচীনতম গল্পগুলিতে কি ভারতীয় নীতিগল্পের ছায়া পড়েছিল ? সে রকম প্রভাব সঞ্চারিত হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। কারণ পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের পশুকাহিনীর সঙ্গে ঈসপের গল্পের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই ঈসপের গল্প বেছে নিয়েছিলেন, কারণ তরুণ মনের উপযোগী নীতি-উপদেশপূর্ণ ঈসপ-কাহিনীর অনেকগুলিই ছাত্রদের উপযোগী। বিশেষতঃ তখন ইংরেজী বিদ্যালয়ে রেভাঃ টমাস জেম্‌স্‌-এর অনূদিত ঈসপের গল্প পড়ান হত। বিদ্যাসাগর সেই আদর্শে এই অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। অবশ্য অনুবাদের সময়ে, তিনি পাশ্চাত্য স্বাদগন্ধ যথাসম্ভব মুছে ফেলে আখ্যানগুলিকে ভারতীয় জীবন ও সমাজের উপযোগী করে তুলেছিলেন। যে সমস্ত গল্পে জীবন ধারণ ও পোষণের উপযোগী নীতি স্বীকৃত হয়েছে, বিদ্যা-সাগর অধিকাংশ স্থলেই সেই কাহিনীগুলিকে অনুবাদ করেছিলেন। অবশ্য তিনি বেছে বেছে শুধু পশুর আখ্যানগুলিকেই যে নিয়েছিলেন তা নয়, অনেকগুলি আখ্যানে মানবজীবনের গল্পও প্রাধান্য পেয়েছে। যথা—'বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক' (বি. র. ২.পৃ. ৩২১)। এখানে মানুষই প্রধান চরিত্র। এক অসাধু চিকিৎসককে এক বৃদ্ধা চক্ষুরোগিণী কি করে শায়েস্তা করেছিলেন, এ কাহিনীতে তারই কৌতুককর বিবরণ আছে। 'গৃহস্থ ও তাঁহার পুত্রগণে' (ঐ পৃ. ৩২৩) ঐক্যই যে উন্নতির মূল তা চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'অশ্ব ও অশ্বারোহী' (পৃ. ৩২৪) আখ্যানে মানুষের চতুর বুদ্ধি, 'পথিকগণ ও বটবৃক্ষে' (পৃ. ৩২৫) মানুষের অকৃতজ্ঞতা, 'কুঠার ও জলদেবতা'য় (পৃ. ৩২৬) মানুষের লোভের পরিণাম এবং 'রোগী ও চিকিৎসকে' পৃ, ৩২৮) চিকিৎ-সকের বৃথা সদুপদেশের আখ্যান আছে। 'দুঃখী বৃদ্ধ ও যমে' (পৃ. ৩৩২) দেখান হয়েছে যে, মানুষ শত দুঃখে পড়ে মৃত্যু কামনা করলেও অন্তরে কখনও মৃত্যু চায় না। 'কৃপণে' (পৃ. ৩৩৪) কার্পণ্য-দোষের পরিণাম, 'জ্যোতির্বেত্তা'য় (পৃ. ৩৪০) আকাশচারী কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতের দুর্দশা এবং 'বিধবা ও কুক্কুটি'তে (পৃ. ৩৪৮) অতিলোভের দণ্ড বেশ তির্যকভাবেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি আখ্যানের একটু বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। গল্পটি সুপরিচিত 'অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক'

(পৃ. ৩৪৬)।[২৩] এই গল্পটি প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর একদা নিজের জীবনের কাহিনী—সক্ষোভে এ-কথা বলেছিলেন।

একদা এক বৃদ্ধ কৃষক ও তার পুত্র হাটে বিক্রয় করবার জন্য তাদের ঘোড়াটিকে সঙ্গে নিয়ে নিজেরা হেঁটে যাচ্ছিল। লোকে বলতে লাগল, "তোমরা ইহাদের মত নির্বোধ কখনও দেখ নাই। অনায়াসে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারে; না যাইয়া আপনারা ঘোড়ার সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতেছেন।" তখন বৃদ্ধ ছেলেকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যেতে লাগল। একদল বৃদ্ধ এই দৃশ্য দেখে তরুণদের চারিত্রিক অধোগতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তারা বলল, "এ কালে বৃদ্ধের সম্মান নাই; ঐ দেখ, বেটা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর বুড়া বাপ সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতেছে।" এতে কৃষকের ছেলেটি লজ্জিত হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল, সে বৃদ্ধ পিতাকেই ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে নিজে হেঁটে যেতে লাগল। কিছু দূর যাবার পর একদল স্ত্রীলোক এই দৃশ্য দেখে বৃদ্ধকেই নিন্দা করে বলতে লাগল, "কে জানে এ মিন্সের আক্কেল। আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর ছোট ছেলেটিকে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছে।" এতে লজ্জিত বৃদ্ধ ছেলেকেও ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে দুজনেই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বসল। এ দৃশ্য দেখে আর একজন বলল, "কোন্ বিবেচনায় এমন ছোট ঘোড়ার উপর দুই জনে চড়িয়া বসিয়াছ? ঘোড়াকে এতক্ষণ যে কষ্ট দিয়াছ, অতঃপর উহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত।" তখন পিতাপুত্র দুজনে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘোড়াটির পা বেঁধে বাঁশ গলিয়ে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলল। ঘোড়ায় না চড়ে জীবন্ত ঘোড়াকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে দেখে লোকে এত হাসাহাসি করতে লাগল যে, ভয় পেয়ে পা-বাঁধা ঘোড়া দড়ি ছিঁড়ে খালের জলে পড়ে গেল এবং পঞ্চত্ব পেল। মনের কষ্টে ক্ষতিগ্রস্ত বৃদ্ধ এই কথা ভাবতে ভাবতে গেল, "আমি সকলকে

২৩. টমাস জেম্স-এর *Aesop's Fables*-এর সর্বশেষ আখ্যান 'The Miller, His Son and Their Ass'-এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।

সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়া, কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না। লাভের মধ্যে ঘোড়াটি গেল।" গল্পটির নীতি হল, জগতে সকলকে খুশি করা যায় না, তা করতে গেলে নিজেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। এ-কথা বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত জীবনে নির্মমভাবে বুঝেছিলেন। একদা সক্ষোভে তিনি বলেছিলেন, "সন্তুষ্ট কাহাকেও করিতে পারিলাম না। আমার কথামালায় যে বৃদ্ধ ও ঘোটকের গল্প আছে, আমি সেই বৃদ্ধ।[২৪]

য়ুরোপীয় সাহিত্যে ঈসপের গল্পের মতোই 'কথামালা' বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক গ্রন্থরূপে পরিগণিত হয়েছে। ছাত্রপাঠ্য এবং মূলতঃ অনুবাদ-মূলক হলেও এর ভাষারীতি অতি পরিচ্ছন্ন, সংযত এবং সরস। গ্রন্থটিকে কোথাও অনুবাদ বলে মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক হিসেবে বিদ্যাসাগর এখনও অনতিক্রমণীয়। অন্য-দেশের সমাজ ও মনের উপযোগী বিষয়কে ভাষান্তরের মধ্য দিয়ে আরেকদেশের সামগ্রী করে তোলা অতি দুরূহ ব্যাপার, বিদ্যাসাগর সেই দুরূহ ব্যাপার সহজ করে তুলেছেন স্বাভাবিক শিল্পবোধের দ্বারা। এখানে ইংরেজীতে অনূদিত ঈসপের একটি গল্প এবং সেই ইংরেজী থেকে বিদ্যাসাগরের বাংলা অনুবাদ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হচ্ছে :

The Dog in the Manger

"A dog made his bed in a manger, and lay snarling and growling to keep the horses from their provender. "See", said one of them, "What a miserable cur ! who neither can eat corn himself, nor will allow those to eat it who can."[২৫]

---

২৪. বিহারীলালের গ্রন্থে উদ্ধৃত।

২৫. *Aesop's Fables* : : A new version, chiefly from the original sources by Thomas James, (1928), p. 69

কুকুর ও অশ্বগণ

"এক কুকুর অশ্বগণের আহারস্থানে শয়ন করিয়া থাকিত। অশ্বগণ আহার করিতে গেলে, সে ভয়ানক চীৎকার করিত, এবং দংশন করিতে উদ্যত হইয়া, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিত। একদিন, এক অশ্ব কহিল, দেখ, এই হতভাগা কুকুর কেমন দুর্বৃত্ত! আহারের দ্রব্যের উপর শয়ন করিয়া থাকিবেক, আপনিও আহার করিবেক না, এবং যাহারা ঐ আহার করিয়া প্রাণধারণ করিবেক, তাহাদিগকেও আহার করিতে দিবেক না।" (বি. র. ২. পৃ. ৩২৭)

এই উদাহরণ থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগর ইংরেজীতে অনূদিত ঈসপের গল্পের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদই করেছেন, অথচ এই রচনাকে কিছুতেই কৃত্রিম বা অনুবাদমূলক বলা যাবে না। 'কথামালা'র প্রায় সমস্ত আখ্যানেই মূলের বক্তব্য যথাসম্ভব বজায় রেখে তিনি বিদেশী আখ্যানকে বাঙালী জাতি ও বাংলাভাষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। দীর্ঘকাল এই গ্রন্থ ছাত্রপাঠ্য ছিল বলে অনেকেই এর মধ্যে তাঁদের বাল্যস্মৃতিকেই খুঁজে পাবেন। এই সমস্ত গল্প মূলতঃ নীতিঘেঁষা। মানুষকে নীতি-উপদেশ দেবার জন্য এই ধরনের পশু-গল্প সব দেশে আপনা-আপনি গড়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগর ছাত্রদের চরিত্র গঠনের উপযোগী অনেকগুলি গল্পকে অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু একটু নীরস ও নীতিমূলক হলেও তাঁর সুচারু অনুবাদের ফলে অনেকগুলি গল্পে রীতিমতো ছোটগল্পের রস সঞ্চারিত হয়েছে। 'ব্যাঘ্র ও মেষশাবক,' 'বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক', 'গৃহস্থ ও তাঁহার পুত্রগণ', 'কুঠার ও জলদেবতা', 'সারসী ও তাহার শিশুসন্তান', 'দুঃখী বৃদ্ধ ও যম', 'কৃপণ', 'জ্যোতির্বেত্তা', 'অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক' প্রভৃতি আখ্যানে প্রকৃতই ছোটগল্পের লক্ষণ আছে। একদা পাঠার্থী বালকেরা নীরস পাঠ্য থেকেও খানিকটা 'কথা'র রস পেত শুধু 'কথামালা'র সরস অনুবাদের জন্য।

৬.

১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে (১লা জুলাই, সংবৎ ১৯১৩) বিদ্যাসাগর কতকগুলি বিদেশী ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বনে 'চরিতাবলী' প্রকাশ করেন। কোন্ উদ্দেশ্যে তিনি এ গ্রন্থ লিখেছিলেন বিজ্ঞাপনে তিনি সংক্ষেপে সে কথা বলেছেন: "যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে বালকদিগের লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে, এই পুস্তকে তদ্রূপ বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।" ভারতীয় ছাত্রদের মনের উপযুক্ত হতে পারে তিনি এমন সমস্ত য়ুরোপীয় প্রধান ব্যক্তিদের কাহিনী নির্বাচিত করেছিলেন। এতে যে ব্যক্তিদের জীবন-কথা সঙ্কলিত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়—ডুবাল, উইলিয়ম রস্কো, হীন, জিরম স্টোন, সিমসন, হটন, ফ্রগল্‌বি, লীডন, জেংকিনস, উইলিয়ম গিফোর্ড, উইস্কল মন, উইলিয়ম পস্টেলস্, এড্রিয়ন, প্রিডো, ডাক্তার এডাম, লসনসফ, মেডক্স্, লঙ্গোমণ্টেনস্। এই চরিতকথাগুলির মূল তাৎপর্য হল, সাধারণ অবস্থা, এমন কি সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থা থেকেও কি করে বিদ্যা লাভ করা যায়, তারই কাহিনী বর্ণনা করা। বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত ঐকান্তিক প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষ কীভাবে নিজের ভাগ্য নিজেই নির্মাণ করে নিতে পারে। এতে প্রায় অধিকাংশ চরিত্রই দারিদ্র্য ও দুঃখের জীবনে অভিভূত হয়ে শুধু স্বকৃত চেষ্টার দ্বারাই বিদ্যার্জন করে দেশমান্য হয়েছিলেন। ছাত্রদের জন্য সঙ্কলিত বলে এই চরিতকথায় শুধু বিদ্যার্জনের কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, এই চরিত্রগুলিতে প্রায় কোথাও ঈশ্বরের কথা বা প্রভাব বা প্রসঙ্গ নেই। কর্মযোগী বিদ্যাসাগর পুরুষকারের ওপর সমধিক গুরুত্ব দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? সুকুমারমতি বালকবালিকাদের চরিত্রগঠনের জন্য তিনি এই ধরনের মহানুভব ব্যক্তির জীবনকথার অধিকতর অনুরাগী হয়েছিলেন। তাঁর বন্ধু ও ইংরেজী শিক্ষক আনন্দকৃষ্ণ বসু তাঁকে ভারতীয় চরিত্র নিয়ে

জীবনচরিত্র লিখবার অনুরোধ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাতে সম্মতও হয়েছিলেন। কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য সে বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হতে পারেন নি। অবশ্য একথাও ঠিক, বিদ্যাসাগর তাঁর সমসাময়িক কালের এমন কোন উপযুক্ত ভারতীয় ব্যক্তির সন্ধান পান নি যাঁর চরিত্র ছাত্রসমাজের অনুকরণের যোগ্য হতে পারে। তাই তিনি বিদেশী আদর্শ চরিত্র অবলম্বন করেছিলেন। যে যাই হোক, অত্যন্ত সহজ অথচ সংযত গম্ভীর ভাষায় তিনি কয়েকজন য়ুরোপীয় ব্যক্তির জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের কথা বলেছেন। তখন তিনি শারীরিক অসুস্থতায় বিশেষ পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি সসঙ্কোচে নিবেদন করেছিলেন, "সুতরাং এই পুস্তকে, অনেক অংশে, অনেক দোষ ও অনেক ন্যূনতা লক্ষিত হইবেক।" পরবর্তী সংস্করণে এর ভাষার কিছু কিছু সংস্কার করেছিলেন। কিন্তু এর ভাষা যে অত্যন্ত পরিমিত ও বাহুল্যবর্জিত হয়ে ছাত্রপাঠের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রের পরিচয় দিয়ে পরিশেষে তিনি ছাত্রদের সম্বোধন করে সেই চরিত্রটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন ঃ "দেখ! হণ্টর কেমন আশ্চর্য্য লোক। বাল্যকালে পিতামাতার আদরের ছেলে ছিলেন, অত্যন্ত আদর পাইয়া, একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন, কিছুই লেখাপড়া শিখেন নাই। লেখাপড়া জানিতেন না, এজন্য, উদরের অন্নের নিমিত্ত অবশেষে তিনি ছুতরের কর্ম্ম করিয়াছিলেন।....ঐ সময়ে, তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর। কুড়ি বৎসর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া, তিনি বিশ্ববিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।" (বি. র. ২. পৃ. ৩৭০)

এই সময়ে তিনি শিক্ষা প্রচার নিয়ে অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং ছাত্রদের উপকারে লাগে, পাঠে সাহায্য হয়, এই দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়েছিলেন। বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক-পুস্তিকার দিকে বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন বলে বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত পুস্তিকা দু'খানি ছাড়া আর বিশেষ কোন মৌলিক গ্রন্থরচনার অবকাশ পান নি। কিন্তু তা হলেও

অনুবাদকর্মে তাঁর দক্ষতা অতিশয় প্রশংসনীয়, অনুবাদে তিনি প্রায় মৌলিক রস সৃষ্টি করতে পেরেছেন, এও তাঁর অল্প কৃতিত্ব নয়।

৭.

সুকুমারমতি বালকবালিকাদের শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের জন্য বিদ্যাসাগর বহু চিন্তা করেছিলেন, নানা বিদেশী গ্রন্থ সন্ধান করেছিলেন (কারণ তাঁর ব্যক্তিগত পুস্তকসংগ্রহে বালশিক্ষাবিষয়ক বিস্তর ইংরেজী পুস্তক পাওয়া গেছে), বাংলা দেশের ছাত্রসমাজের উপযোগী নানা গ্রন্থ লিখেছিলেন—সেকথা সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'বর্ণপরিচয়'-এর সঙ্গে শিশুর প্রথম পরিচয় হয়, তারপর সাধারণ জ্ঞানবর্ধনের জন্য 'বোধোদয়' এবং তারপর 'কথা-মালা', 'চরিতাবলী', 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে শিশু বালক হয়, বালক কিশোর হয়। তখন সে 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' পড়তে আরম্ভ করে। ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তার মনেরও প্রসার হয়, কিছু কিছু সাহিত্যরসের স্বাদগন্ধও তার ভাগ্যে জোটে। কিন্তু বিদ্যাসাগর নিছক সাহিত্যসৃষ্টির জন্য বড় একটা উৎসাহ বোধ করেন নি, লোকশিক্ষা প্রচারই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। সেইজন্য ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকের নীতিমূলক গল্প-কাহিনীকে অবলম্বন করে, কোথাও-বা পুরোপুরি অনুবাদের আশ্রয় নিয়ে তিনি ছাত্রপাঠ্য রচনার প্রয়োজন বোধ কর-ছিলেন। অবশ্য তাঁর সহকর্মী ও সুহৃৎ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের তিনভাগ 'শিশুশিক্ষা'র (১ম ও ২য় ভাগ—১৮৪৯, ৩য় ভাগ—১৮৫০) দ্বারা অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া মোটামুটি ভালই চলত। 'শিশুশিক্ষা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে শুধু অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণের দ্বারা রচিত কবিতা ও ছোট ছোট আখ্যান ছিল। তৃতীয় ভাগেই গোটাকাহিনী স্থান পেয়েছিল। ঈসপের গল্পের অন্তর্ভুক্ত জীবজন্তুর কাহিনীকে মদনমোহন ছাত্রশিক্ষার প্রতিকূল মনে করেছিলেন। 'শিশু-শিক্ষা'র তৃতীয় ভাগের মুখবন্ধে "অতি ঋজুভাষায় নীতিগর্ভ নানা

বিষয়ক প্রস্তাব" সঙ্কলন করতে গিয়ে তিনি বালক-বালিকাদের চরিত্র-গঠনের উপযোগী আখ্যান সম্বন্ধে বলেছেন, "কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ চিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। এ নিমিত্ত হংসীর স্বর্ণডিম্ব প্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস-নিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গৃহদ্বারে বৃহৎ পাকস্থালী ও কাষ্ঠভার দর্শনে ভয়ে বলীবর্দ্দের পলায়ন, পুরস্কারের লোভে বক কর্ত্তৃক বৃকের কণ্ঠবিদ্ধ অস্থিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত্ত শৃগালের কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়া কাকের স্বীয় মধুর স্বর পরিচয় দান প্রভৃতি অসম্বন্ধ অবাস্তবিক বিষয়সকল প্রস্তাবিত না করিয়া সুসম্বন্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বদ্ধ করা গেল।" তৃতীয় ভাগের গল্পগুলি "সুসম্বন্ধ" ও "নীতিগর্ভ" হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু লেখক শিশুদের মনোরঞ্জনের দিকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে শুধু নীতিকথাকে আখ্যানের মারফতে শিশুমনে মুদ্রিত করতে চেয়েছিলেন।

মদনমোহন ঈসপের গল্প ছাত্রশিক্ষার অনুপযোগী মনে করলেও বিদ্যাসাগর ঈসপের গল্প অবলম্বনেই 'কথামালা' (১৮৫৬) রচনা করে শিশুশিক্ষার পথ প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। কারণ ঈসপ-বিষ্ণুশর্মার মতো তিনিও বুঝেছিলেন—জীবজন্তু-সংক্রান্ত আখ্যান শিশুদের দ্রুত মনোরঞ্জন করতে পারে এবং শিক্ষার সঙ্গে মনোরঞ্জনের যোগ না থাকলে শিশুর কাছে শিক্ষণীয় গ্রন্থ অপ্রীতিকর হয়ে পড়ে। মদনমোহন যে-সব জীবজন্তুর কাল্পনিক গল্পকে 'অসম্বন্ধ' ও 'অবাস্তব' বলে পরিহার করতে চেয়েছেন, সেইগুলিই শিশুর পরম লোভনীয় সামগ্রী। বিদ্যাসাগর শিশু-শিক্ষাপ্রসারে উৎসাহী হয়ে শিশু-মনোরঞ্জনের কথা ভোলেন নি। অক্ষয়কুমার দত্তও বালকদের জন্য নানা বিষয় অবলম্বনে তিনখণ্ড 'চারুপাঠ' (১ম—১৮৫৩, ২য়—১৮৫৪, ৩য়—১৮৫৯) লিখে-ছিলেন। সে যুগে 'চারুপাঠ'-এর বিচিত্র বিষয়গুলি অল্পবয়সী বালকদের কাছে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হয়েছিল সন্দেহ নেই। সেই বিচিত্র জীব 'পুরুভুজে'র কথা কার না মনে আছে ? কিন্তু রচনাগুলি যতটা জ্ঞানবহ

হয়েছিল, ততটা চিত্তাকর্ষক হতে পারে নি, ভাষাও কিছু শুষ্ককাঠ্য। বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও নিবন্ধগুলি "ইংরেজি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত" (১ম ভাগের বিজ্ঞাপন) করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকগুলিকে ছাত্রশিক্ষার অধিকতর উপযোগী মনে করতেন। হিতোপদেশের চেয়ে ঈসপের গল্পই তাঁর কাছে অনেক বেশী শিক্ষোপযোগী মনে হয়েছিল।[২৬] ছেলেদের বয়স বাড়লে তারা আর জীবজন্তুর গল্পে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তাদের চরিত্রগঠনের জন্য পরিণত মনের উপযোগী আখ্যান আবশ্যক। এর পূর্বে বিদ্যাসাগর 'জীবনচরিত' (১৮৩৯) ও 'চরিতাবলীতে (১৮৫৬) য়ুরোপের বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনকথা সঙ্কলন করেছিলেন। 'আখ্যানমঞ্জরী'তে তিনি ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক থেকে সদুপদেশপূর্ণ নানা গল্প-আখ্যান অনুবাদ করে মুদ্রিত করেন। এগুলি ছাত্রপাঠ্য আখ্যানের আকারেই প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি যে তাঁর মৌলিক রচনা নয় তা তিনি 'আখ্যানমঞ্জরী'র বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছেন।[২৭]

১৮৬৩ সালে 'আখ্যানমঞ্জরী প্রকাশিত হয়। তখন এতে কোন ভাগ বা খণ্ডের উল্লেখ ছিল না। একাধিক খণ্ডে 'আখ্যানমঞ্জরী' রচিত হবে এমন কোন ইচ্ছা বোধ হয় তাঁর প্রথমে ছিল না। কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর "কলিকাতাস্থ কোন বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, আখ্যানমঞ্জরী যেরূপ ভাষায়

২৬. হিতোপদেশকে তিনি খুব প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখতেন না। এর মধ্যে কিছু কিছু অশ্লীল ব্যাপারের বর্ণনা থাকার জন্য এ গ্রন্থকে তিনি ছাত্রশিক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযোগী মনে করতেন। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে' (১৮৫৩) এবং 'ঋজুপাঠ' তৃতীয় ভাগের (১৮৫১) বিজ্ঞাপনে তিনি এ বিষয়ে খোলাখুলিভাবে প্রতিকূল মত প্রকাশ করেছিলেন।

২৭. তৃতীয় ভাগের (১৯২০ সংবৎ, অগ্রহায়ণ) প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে তিনি সেকথা বলে নিয়েছেন, "আখ্যানমঞ্জরী পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে, কতিপয় ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনপূর্বক সঙ্কলিত হইল।"

লিখিত হইয়াছে, তদপেক্ষা সরল ভাষায় পুস্তকান্তর প্রস্তুত হইলে, অল্পবয়স্ক বালকদিগের অনেক উপকার দর্শে।"[২৮]. বাস্তবিক 'আখ্যানমঞ্জরী'র গল্পকাহিনী ও ভাষার পরিপক্কতা নিতান্ত বালকদের উপযোগী নয়। জনৈক প্রধানশিক্ষকের উক্ত মন্তব্য বিদ্যাসাগরের কাছে যুক্তিসঙ্গত বোধ হওয়ায় ১৮৬৮ সালে তিনি প্রথম বারের সংস্করণ থেকে ছ'টি আখ্যান নিয়ে এবং কতকগুলি নতুন আখ্যান যোগ করে 'আখ্যানমঞ্জরী প্রথম ভাগ' প্রকাশ করেন এবং ঘোষণা করেন, "অতঃপর, পূর্ব্বপ্রচারিত পুস্তক আখ্যানমঞ্জরীর দ্বিতীয়ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবে" (১৯২৪ সংবৎ সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন')। ১৮৮৮ সালে 'আখ্যানমঞ্জরী'র যে দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয় তার 'বিজ্ঞাপনে' আছে, "এই পুস্তকের যে ভাগ ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয়ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয়ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবেক।"

বিদ্যাসাগরের জীবিতকালের মধ্যে প্রকাশিত 'আখ্যানমঞ্জরী'র তিনটি খণ্ডের আখ্যানের পুনর্বিন্যাসের পর মোট আখ্যানের সংখ্যা দাঁড়ায় আটাত্তর (প্রথম ভাগে তেইশ, দ্বিতীয় ভাগে চৌত্রিশ এবং তৃতীয় ভাগে একুশটি আখ্যান) (গল্পগুলির অধিকাংশই চরিত্রগঠনের উপযোগী এবং পারিবারিক কর্তব্য সম্বন্ধীয়।) যেমন, প্রথম ভাগে—মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, গুরুভক্তি অপত্যস্নেহ, পিতৃবৎসলতা ইত্যাদি। দ্বিতীয় ভাগে—মাতৃভক্তির পুরস্কার, পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবাৎসল্য; তৃতীয় ভাগে—সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি ও পতিপরায়ণতা, অপত্যস্নেহের একশেষ প্রভৃতি। এই তিনখণ্ডের আখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রথম ভাগে তিনি পারিবারিক কর্তব্য-সংক্রান্ত আখ্যানের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন—কারণ এইখণ্ডে এই ধরণের আখ্যানের সংখ্যাই বেশী। অন্য দু'খণ্ডে এই শ্রেণীর আখ্যানের সংখ্যা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। সজ্জীবন-যাপন এবং অপরের প্রতি কর্তব্যের আখ্যান

২৮. ১৯২৪ সংবতে প্রকাশিত 'আখ্যানমঞ্জরী'র প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপন।

হিসেবে প্রথমভাগের ধর্মভীরুতা, ধর্মপরায়ণতা, আতিথেয়তা, সাধুতার পুরস্কার, পরের প্রাণরক্ষার্থে প্রাণ দান, এবং দ্বিতীয় ভাগের দয়া ও দানশীলতা, দয়ালুতা ও পরোপকারিতা, দয়া ও সদ্বিবেচনা, অদ্ভুত আতিথেয়তা (দুইটি আখ্যান), প্রত্যুপকার, ধর্মশীলতার পুরস্কার প্রভৃতি আখ্যান উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত আখ্যানের অধিকাংশেই পাশ্চাত্য জীবনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সদুপদেশপূর্ণ ও বালকদের চরিত্রগঠনোপযোগী গল্প আছে বলে বিদ্যাসাগর এগুলির অনুবাদ প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য দু'একটি গল্পে আরব-দেশীয় মুসলমান সমাজের অদ্ভুত আতিথেয়তার কথা বলা হয়েছে। একটি গল্পে (দ্বিতীয় ভাগ, 'দয়া ও সদ্বিবেচনা') চীনসম্রাটের কাহিনীও আছে। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ওপর সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতির অত্যাচারের বর্ণনা (দ্বিতীয় ভাগ—'উপকারের স্মরণ'),[২৮] আদিমজাতির উচ্চতর চরিত্রের কাহিনী ('আখ্যানমঞ্জরী', ২য়, 'বর্ব্বর জাতির সৌজন্য') এবং য়ুরোপীয় ধর্মযাজক কর্তৃক আদিম অধিবাসিনীর সন্তান অপহরণ এবং অত্যাচারে পীড়নে সেই হত-ভাগিনীর মৃত্যু বর্ণনা করতে গিয়ে ('অপত্যস্নেহের একশেষ')

২৮. "ইংরেজেরা, ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত আমেরিকার আদিমনিবাসীদের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেন; এজন্য তাঁহাদের উপর তাহাদের (আদিম-নিবাসীদের) ভয়ানক বিদ্বেষ হইয়াছিল।" (তৃতীয়ভাগ, বি. রচনাবলী, ৩য়, পৃ. ২৫৬) একটি আখ্যায়িকার (প্রথমভাগের অন্তর্ভুক্ত বর্বরজাতির সৌজন্য') আমেরিকার এক আদিম অধিবাসী সুসভ্য য়ুরোপীয়কে যা বলেছিল, বিদ্যাসাগরের নিজের মতও তাই ছিল,"তখন সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি গর্ব্বিত-বাক্যে বলিল, মহাশয়, আমরা বহুকালের অসভ্যজাতি; আপনারা সভ্যজাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখুন, সৌজন্য সদ্ব্যবহার বিষয়ে অসভ্যজাতি সভ্যজাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট।" 'নৃশংসতার চূড়ান্ত' গল্পে (আখ্যানমঞ্জরী, ৩য় ভাগ, বি. র. ৩য়, পৃ. ২৯৮) আমেরিকার আদিম অধি-বাসীদের রাণী ও তাঁর অনুচরদের প্রতি স্প্যানিয়ার্ডদের অমানুষিক অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর সুসভ্য আমেরিকানদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন এবং আদিম অধিবাসীদের মহত্ত্বের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। দু'একটি আখ্যানে তিনি জীবনের নির্মম দিকের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যেমন—'কৃতঘ্নতা'র আখ্যান ('আখ্যানমঞ্জরী', ২য় ভাগ)। মাসিডনের এক সৈনিক নিজপ্রাণরক্ষাকারী উপকারকের দারুণ ক্ষতি করতে প্রস্তুত হয়েছিল বলে তার ললাটে রাজা—"কৃতঘ্ন নরাধম, এই দুটি শব্দ লেখাইয়া আপন অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।"

'আখ্যানমঞ্জরী'র প্রথম দু' ভাগে নীতিকথার বাড়াবাড়ি থাকলেও (একটি গল্পে ঈশ্বর-ভক্তিরও উল্লেখ আছে)[২৯] তৃতীয় ভাগের কাহিনীগুলির একটু স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হবে। এই তৃতীয় ভাগটিও ছাত্রদের জন্যই রচিত হয়। তিনি এই ভাগ রচনাতেও "বালকদিগের ভাষাজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক নীতিজ্ঞান"-এর দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিলেন।[৩০] এই ভাগে মোট একুশটি আখ্যান সংযোজিত হয়েছে। অন্য দু' ভাগের চেয়ে তৃতীয় ভাগের আখ্যানের সংখ্যা কিছু কম। কিন্তু আকারে এগুলি বৃহত্তর, অনেকটা ছোটগল্পের মতো। এর বিষয়-বৈচিত্র্যও বেশ চিত্তাকর্ষক। আখ্যানগুলি বিদ্যাসাগরের মৌলিক

২৯. ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত মনোভাব যাই থাক না কেন, তিনি 'আখ্যানমঞ্জরী'র (২য় ভাগ) একটি আখ্যানে ('ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস') একটি বালকের মুখে ঈশ্বরের আস্থা বিষয়ে এই উক্তিটি দিয়েছেন, "এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড স্থান। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থানে অবশ্যই আমার জন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি কেবল সেই ব্যবস্থার অন্বেষণ করিয়াছি।"

৩০ তৃতীয় ভাগের প্রথম বারের বিজ্ঞাপন—"যদি আখ্যানগুলি বালকদিগের ভাষাজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক নীতিজ্ঞান বিষয়ে কিঞ্চিৎ অংশেও ফলোপধায়ক হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।"

রচনা নয় বলে তাঁকে বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টার গৌরব দেওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর নির্বাচনশক্তির প্রশংসা করতে হবে।

তৃতীয়ভাগের আখ্যানগুলি অপেক্ষাকৃত পরিণতবয়স্ক কিশোরদের জন্য রচিত বলে এতে পরিণত মনের প্রভাব সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। 'দস্যু ও দিগ্বিজয়ী', 'স্বপ্নসঞ্চরণ', 'অকুতোভয়তা' প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে নীতি ও চরিত্রাদর্শের ইঙ্গিত সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে এতে ছোটগল্পের আমেজও পাওয়া যায়। 'স্বপ্নসঞ্চরণ' ও 'অকুতোভয়তা' আখ্যান দু'টিতে সম্ভবতঃ তিনি কোন নীতি-উপদেশ প্রচার করতে চান নি, শুধু গল্পরস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কৌতুকরস গল্প দু'টির কেন্দ্রীয় বিষয়—যদিও মাঝে মাঝে ভৌতিক রহস্যময়তা গল্প দু'টিকে পরম উপভোগ্য করে তুলেছে।

'স্বপ্নসঞ্চরণ'-এর নায়ক ইটালির পেডুয়া নগরের অধিবাসী সাইরিলোর কাহিনীটি বড়ই কৌতূহলজনক। সাইরিলো নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নের ঘোরে অনেক দুরূহ প্রশ্নের উত্তর লিখে ফেলতে পারতেন—জাগ্রতাবস্থায় যা তিনি পারতেন না। কিন্তু ঘুম ভাঙলে সে কথা তাঁর আর মনে থাকত না। পরে তিনি ধর্মযাজক হলেন। এবার তাঁর স্বপ্নাচ্ছ দাওয়াই বিপরীত ও উৎকট পথ নিল। দিনের বেলায় তিনি দিব্যি ধর্মোপদেশ দিতেন, নিষ্ঠাপূর্ণ সাত্ত্বিক জীবন যাপন করতেন, কিন্তু রাত্রিতে নিদ্রা গেলে স্বপ্নের ঘোরে "শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য গৃহে প্রবেশ করিতেন, এবং পরুষ ও অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করিতে থাকিতেন।" ঘুমন্ত অবস্থায় যেন কার নির্দেশে উচ্চস্বরে হাসতেন, সেখানে কেউ উপস্থিত থাকলে হাঁ করে তাকে ভেঙচি কাটতেন, শূন্য স্থানকে নস্যির ডিপে মনে করে তা থেকে নস্যি নেবার ভঙ্গি করতেন, এই সমস্ত কৌতূকজনক ব্যাপার দেখে তাঁর গুরুভাইয়েরা হাসতেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্নসঞ্চরণ ক্রমে উৎকট আকার ধারণ করল। ঘুমন্ত অবস্থাতেই তিনি হেঁটে-চলে এর-ওর ঘরে গিয়ে এটা-সেটা চুরি করে নিজের বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখতেন, কিন্তু দিনের বেলায় এসব

কথা তাঁর আদৌ মনে থাকত না। বিছানার তলা থেকে সে সব জিনিষ বার করে তিনি লজ্জায় মরে যেতেন। তাঁর অবস্থা দেখে তাঁর গুরু-ভাইয়েরা চিন্তিত হলেন। এর পর তিনি যে আচরণ করলেন তা যেমন বীভৎস, তেমনই বিস্ময়কর। উক্ত আশ্রমের শুভানুধ্যায়িনী ও সহায়িকা এক ধনী মহিলার মৃত্যু হলে আশ্রম-প্রাঙ্গণে তাঁর শবদেহ সমাহিত হল। কিন্তু পরদিন সকালে সকলে দেখল, "সেই নারীর সমাধিস্থান উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তদীয় কলেবর সর্বাংশে বিকলিত হইয়াছে, যে-সকল অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় ছিল তৎসমুদায় ছিন্ন ও মহামূল্য পরিচ্ছদ অপহৃত হইয়াছে।" সে-সব জিনিষ তাঁর বিছানার তলা থেকেই পাওয়া গেল। বলাই বাহুল্য, somnambulist সাইরিলোই স্বপ্নের ঘোরে এই জঘন্য কাজ করেছেন। তিনি যথার্থই অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর তো কোন দোষ নেই। স্বপ্নাবিষ্ট সাইরিলো এবং ধর্ম-যাজক সাইরিলো একব্যক্তি নন। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ তখন তাঁকে অন্য এক মঠে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানকার ব্যবস্থা বড় কঠোর। সেখানে রাত্রিকালে তিনি ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হত। ফলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর কোন দুষ্কর্ম করতে পারতেন না, তবে তাঁর এই অদ্ভুত ব্যাধি নিরাময় হয় নি। আজকাল অবশ্য মনোবিজ্ঞান ও মনোবিকলন তত্ত্বের সাহায্যে এ-রকম অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় এবং এ রোগের প্রতিষেধকও আছে। সে-যুগের বালক ও কিশোরেরা নিশ্চয়ই এই গল্প থেকে কৌতুকরসের প্রচুর উপাদান পেত। বিদ্যাসাগর এ আখ্যানে কোন নীতিকথা প্রচার করতে চান নি, গল্পরস সৃষ্টিই এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

আর একটি আখ্যান—এটির নাম 'অকুতোভয়তা' (বি. র. ৩য়, পৃ. ৩১৬-১৯)। ফরাসী দেশের এক কাউন্টের প্রাসাদের একটি কক্ষে রাত্রিতে ভূতের উপদ্রব হত বলে কেউ সেই কক্ষে শুতে চাইত না। দেগুলিয়র নামে এক সাহসিকা মহিলা সেই খবর পেয়ে কৌতূহলী হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সেই কক্ষে রাত্রিবাসের অভিলাষ প্রকাশ

করলেন। কাউন্ট ও কাউন্ট-পত্নী দেশুলিয়রকে অনেক বোঝালেন, এ রকম ঝুঁকি নিতে নিষেধ করলেন। কিন্তু সেই সাহসিকা মহিলা ভূত দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য ছাড়তে কিছুতেই সম্মত হলেন না, সকলের উপরোধ ও সাবধান-বাণী উপেক্ষা করে রাত্রিতে সেই ভীতিকর ঘরেই শয্যা আশ্রয় করলেন। গভীর রাত্রিতে সত্যই ঘরের মধ্যে অদ্ভুত শব্দ হতে লাগল। কিন্তু দেশুলিয়র তাতে কিছুমাত্র ভয় পেলেন না, বরং শব্দকারী ভূতের সঙ্গে খোসগল্প জুড়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর জিজ্ঞাসাবাদের কোন জবাব না দিয়ে ভূত মশারির বাইরে দুপদাপ শব্দ করতে লাগল। মহিলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে, কি জন্য এখানে আসিয়াছ বল ; তুমি কখনই, এরূপে ভয় প্রদর্শন করিয়া আমায় ব্যাকুল বা বিচলিত করিতে পারিবে না।" ভূত তাঁর কথায় দৃকপাত না করে "প্রশান্তভাবে গৃহমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, উহা জ্বলন্ত বাতীর নিকট উপস্থিত হইল। অবিলম্বে বৃহৎ বাতী ও বাতীর প্রকাণ্ড আধার উলটিয়া পড়িল। ভয়ানক শব্দ ও গৃহ অন্ধকারময় হইল।" এ রকম পরিস্থিতিতেও সে মহিলা কিছুমাত্র ভয় পেলেন না, বরং মশারির ভিতর থেকে হাত বার করে ভূতকে পাকড়াও করবার চেষ্টা করলেন এবং তাঁর হাতে "মখমলের ন্যায় কোমল দুই কর্ণ" ঠেকল। তিনি সজোরে ভূতের কোমল কান দুটি ধরে রাখলেন, যাতে ভূত পালাতে না পারে। ক্রমে প্রভাত হল, ভূতের ভৌতিক চেহারা বেমালুম উবে গেল, পড়ে রইল একটি বৃহৎ সারমেয়। "দেশুলিয়র দেখিলেন, ঐ কুকুরের কর্ণ ধরিয়া আছেন। ভয়ঙ্কর ভৌতিক ব্যাপারের এইরূপ পর্যবসান হওয়াতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।" বেলা হলে সন্ত্রস্ত কাউন্ট ও তাঁর পত্নী যখন অতিথির সংবাদ নিতে এলেন, তখন সহাস্যে দেশুলিয়র বললেন, "আপনারা যাহাকে ভূত বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, ঐ দেখুন, সে শুইয়া রহিয়াছে।" সেই বাড়ীতে একটি পোষা কুকুর ছিল। রাত্রিতে সে সেই খালিঘরে গিয়ে দ্বার ঠেলে ঢুকে (দরজার খিল ভাঙা ছিল) বিছানায়

শুয়ে থাকত। তাতেই শব্দ হত। গল্পটিতে ভয়ানকরস ও কৌতুক-রসের অদ্ভুত মিলন হয়েছে এবং এটিকে স্বচ্ছন্দে একটি সার্থক 'ভৌতিক' গল্প বলা যেতে পারে। আখ্যানটির শেষে বিদ্যাসাগর একটি নীতিকথা ("ফলতঃ, তিনি স্ত্রীলোক হইয়া সাহস ও অকুতোভয়তার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, পুরুষজাতির মধ্যেও, সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।") সংযুক্ত করেছেন বটে, কিন্তু কৌতুকরসের গল্পটিতে কোন নীতি-উপদেশের প্রয়োজন ছিল না।

আরও দু-একটি আখ্যানে পরিণত মন ও পরিপক্ক হাতের লক্ষণ আছে। উদাহরণ স্বরূপ 'আশ্চর্য দস্যুদমন' আখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে। টেলর নামে এক দুর্বৃত্ত হাঁচেন নাম্নী এক পরিচারিকাকে বিয়ে করবার স্তোকবাক্যে মুগ্ধ করে কিভাবে পরিচারিকার প্রভুর সর্বস্ব হরণ করবার মতলব করেছিল এবং কিভাবে পরিচারিকার বুদ্ধিকৌশলে সে ধরা পড়ল এ আখ্যানে তার বিবরণী আছে।

'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' গল্পটিও কিয়দংশে ছোটগল্পের আকার লাভ করেছে। জার্মান সাগরের উপকূলে সাবিনস নামে এক সুদর্শন যুবা প্রতিবেশিনী অলিন্দা নাম্নী এক রূপসী ও গুণবতী যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়; তার পরে দুজনের বিবাহ হয়। এরপর ত্রিভুজের গল্প শুরু হল। সাবিনসের এক আত্মীয়-কন্যা এরিয়ানা রূপসী ও ধনশালিনী ছিল, সেও সাবিনসের প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করত। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে সাবিনস ও অলিন্দার ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করতে লাগল। শেষে তার কৌশলে সাবিনস নিঃস্ব হয়ে পড়ল। কিন্তু এরিয়ানা এমন কৌশল ও গোপনীয়তা অবলম্বন করল যে, সাবিনস বুঝতেই পারল না তার দুর্ভাগ্যের মূলে রয়েছে ঈর্ষাতুরা এরিয়ানার চক্রান্ত। বরং তাকে সে নিজের হিতৈষিণী বলেই মনে করল। এমন কি, বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সে এরিয়ানার কাছেই অর্থসাহায্যের জন্য উপস্থিত হল। এইটাই এরিয়ানা চাইছিল। এবার সে নিজমূর্তি ধরে বলল, অলিন্দাকে পরিত্যাগ করে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলে সে সাবিনসকে সর্ববিধ

সাহায্য করবে। সাবিনস ঘৃণার সঙ্গে এ কুৎসিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। এবার এরিয়ানার আর কোন সঙ্কোচ বা গোপনীয়তা রইল না, সে দারুণ চক্রান্ত করে মিথ্যা ঋণের দায়ে সাবিনসকে কারাগারে নিক্ষেপ করল। সাধ্বী অলিন্দা স্বামীর সমদুঃখভাগিনী হবার জন্য তার সঙ্গে কারাগারে গেল। নিদারুণ দুঃখে কয়েদখানায় স্বামী-স্ত্রীর দিন কাটতে লাগল। এই ব্যাপার দেখে ক্রমে ক্রমে এরিয়ানার নির্মম হৃদয় কিছুটা নরম হল। তবু তাদের সততার পরীক্ষার জন্য সে নিজের মৃত্যু-সংবাদ রটিয়ে দেখতে চাইল, সাবিনস সে খবরে পুলকিত হয় কি না। কিন্তু এরিয়ানার মৃত্যুসংবাদে স্বামী-স্ত্রী যথার্থই দুঃখিত হল, এরিয়ানার প্রতি তাদের কোন ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিল না। তখন এরিয়ানার বিষাক্ত মনে শুচিতার স্পর্শ সঞ্চারিত হল। আদর্শ দম্পতীকে অনর্থক দুঃখ ভোগ করাবার জন্য সে অনুতপ্ত হয়ে কারাগার থেকে তাদের ফিরিয়ে আনল এবং তাদের অভাব ও দুঃখ দূর করবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করল। এই ভাবে কিছুকাল গেল। মৃত্যুর পূর্বে সে এই দম্পতীকে তার যথাসর্বস্ব দান করে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল। গল্পটিতে নীতি ও সত্যের জয় দেখান হলেও এটি পরিণত একটি ছোট-গল্পের রূপ ধরেছে।

'পুরুষজাতির নৃশংসতা' গল্পটিতে বিদ্যাসাগর পুরুষের স্বার্থপরতা ও নির্মমতার যে মর্মন্তুদ বিবরণ দিয়েছেন, তার কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে এযুগেও চমৎকার ছোটগল্প লেখা যেতে পারে। ইংলণ্ডের অধিবাসী টমাস ইঙ্কল সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির সন্তান হলেও অত্যন্ত অর্থ-লোলুপ ছিল। প্রচুর অর্থোপার্জনের লোভে সে আমেরিকা যাত্রা করল। জাহাজের যাত্রী ও কর্মচারীরা আমেরিকার ভূখণ্ডে নোঙর করে খাদ্য-বস্তুর সন্ধানে ডাঙায় নামল। এমন সময় আদিম অধিবাসীরা শ্বেতাঙ্গ-দের দেখতে পেয়ে দলবেঁধে তাদের আক্রমণ করল। অনেক যাত্রী মারা পড়ল, অল্প কয়েকজন প্রাণ নিয়ে জাহাজে পালিয়ে গেল, টমাস ইঙ্কল কোনও প্রকারে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে প্রাণে বাঁচল। সেটা ছিল

আদিম জাতির এক রাজার অধিকারভুক্ত অঞ্চল। রাজকন্যার নাম ইয়ারিকো। সে সেই অরণ্যে বিচরণ করতে করতে অসুস্থ, দুর্বল, মূর্চ্ছিতপ্রায় ইঙ্কলের দেখা পেল এবং নারীসুলভ মমতার বশে তাকে নিরাপদ পাহাড়ের গুহায় নিয়ে গিয়ে বহু পরিশ্রম করে তাকে সুস্থ-সবল করে তুলল, ক্রমে দু'জনে দু'জনের ভাষা বুঝতে শিখল এবং উভয়ের মনে প্রণয় সঞ্চারিত হল। তারা স্বামী-স্ত্রীভাবেই সেখানে গোপনে রইল। ইতিমধ্যে সমুদ্রে ইংরেজদের জাহাজ যেতে দেখে ইঙ্কল নানা সংকেত করে জাহাজটিকে কূলে নিয়ে এল এবং ইয়ারিকো ও সে সেই জাহাজে কোনও প্রকারে ঠাঁই করে নিল। ইতিমধ্যে জাহাজ দাস-ব্যবসার কেন্দ্র একটি বন্দরে ভিড়ল। দাসব্যবসায়ীরা সেই জাহাজে কোন আদিম অধিবাসী আছে কিনা দেখতে এল। তখন এই ধরণের জাহাজে দাসব্যবসার জন্য আমেরিকা থেকে আদিম অধিবাসী ধরে আনা হত। দাসব্যবসায়ীরা সে জাহাজে ইয়ারিকো ছাড়া আর কোন স্ত্রী বা পুরুষ আদিম অধিবাসী খুঁজে পেল না। ইয়ারিকোকে ইঙ্কলের সম্পত্তি মনে করে তারা চড়া দামে তাকে কিনতে চাইল, কিন্তু এতে ইঙ্কল ঘোরতর অসম্মতি জানাল। তারা আরও দর চড়িয়ে দিল, কিন্তু ইঙ্কল সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। এই তথাকথিত অসভ্য সমাজের নারী তাকে বাঁচিয়েছে, সেবা করেছে, রক্ষা করেছে, তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করে আত্মীয়স্বজন স্বদেশ ছেড়ে তার সঙ্গে চলেছে। ইঙ্কল মনে মনে চিন্তা করতে লাগল, ইয়ারিকোর সঙ্গে তার দেখা না হলে সে কোনওক্রমে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজে উপস্থিত হয়ে কত অর্থ উপার্জন করতে পারত। এবার তার মনের মধ্যে সুপ্ত অর্থলালসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে ভাবতে লাগল, এখন একে বেশী দামে বিক্রয় করি না কেন? "বিবেচনা করিতে গেলে, উহার জন্যই আমার এত ক্ষতি হইয়াছে।" তখন সে অধিক মূল্যে দাসব্যবসায়ীর কাছে ইয়ারিকোকে বেচে দেবার সঙ্কল্প করল। "ইয়ারিকো, এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, বারংবার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইতে লাগিল। ইঙ্কল

তাহাতে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে, "তোমার সহযোগে আমার গর্ভ হইয়াছে, অন্ততঃ প্রসবকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর; এমন অবস্থায় আমার প্রতি এরূপ নৃশংস আচরণ করা তোমার কদাচ উচিত নয়; কাতর বচনে গলদশ্রু লোচনে এই সকল কথা বলিয়া, তাহার অন্তঃকরণে করুণা জন্মাইবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইল।" কিন্তু নরাধম ইঙ্কলের দয়া হল না। বরং ইয়ারিকোকে গর্ভবতী জেনে সে খুশী হল, দাসব্যসায়ীর কাছ থেকে তা হলে আরও বেশী দাম আদায় করা যাবে। তাই-ই হল। "ক্রেতা, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া, ক্রীতদাসী লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল।"

এ-রকম নির্মম 'সিনিক' গল্প সচরাচর চোখে পড়ে না। শেষ জীবনে বিদ্যাসাগর লোকের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে নিন্দাবঞ্চনা পেয়ে সভ্যতাভিমানী শহুরে বাবুর প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা বোধ করতেন। এই বিদেশী গল্পে যে ভয়ঙ্কর পুরুষ-বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে, শেষ জীবনে বিদ্যাসাগরের মনে পুরুষের নির্মমতা সম্বন্ধে ঐ ধরনেরই ধারণা হয়ে গিয়েছিল। 'আখ্যানমঞ্জরী'র (৩য় ভাগ) আর একটি গল্পে ("পতিব্রতা কামিনী") তিনি বলেছেন,"মনুষ্যের ন্যায় নির্দ্দয় নির্ব্বিবেক জন্তু ভূমণ্ডলে আর নাই; দুর্ভর অর্থলালসার বশীভূত হইয়া, দুর্ব্বলদিগের প্রতি কি ভয়ানক অত্যাচার করিয়া থাকে।" এ-ও যেন বঞ্চিত বিদ্যাসাগরের তিক্ত আর্তনাদ। সে যাই হোক, 'আখ্যানমঞ্জরী'-র তৃতীয় ভাগের আখ্যানগুলি নীতি-উপদেশের জন্য অনূদিত হলেও এর অনেকগুলিতে ছোটগল্পের রস ও রীতি ফুটে উঠেছে।

'আখ্যানমঞ্জরী'র তিন খণ্ডের ভাষাই বালক-কিশোরদের শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী। সমাস-সন্ধির ঘনঘটা বা উৎকট শব্দপ্রয়োগ এতে অনেক হ্রাস পেয়েছে। যথার্থ ক্লাসিক সাধু বাংলা শিখবার জন্য এ গ্রন্থত্রয়ের ভাষা আদর্শরূপে গণ্য হতে পারে। এখানে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে:

"পুরাবৃত্তে বর্ণিত আছে, পারস্তদেশের কোনও রাজা, যার পর নাই স্তায়পরায়ণ বলিয়া, সর্ব্বত্র সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে কদাচ অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইতেন না; এবং কাহাকেও অন্যায়াচরণে উদ্যত দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার নিবারণ করিতেন। একদা, তিনি, রাজধানীর অতি দূরবর্ত্তী কোনও অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগের অন্বেষণে ও অনুসরণে, অবিশ্রান্ত পর্য্যটন করিয়া, রাজা নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইলেন; এবং স্বীয় অনুযায়ীদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া, পরিচারকদিগকে সত্বর আহার প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তদনুসারে তাহারা আহার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা দেখিল, রাজধানী হইতে প্রস্থান কালে, রাজার আহারোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য আনীত হইয়াছে, কেবল লবণ আনিতে ভুল হইয়া গিয়াছে।"—আখ্যানমঞ্জরী, ২য় ভাগ (বি. র ৩য়, পৃ. ২৬৮)

একেই যথার্থ সাধুগদ্য বলে, এবং এখনও পর্যন্ত বাংলা গদ্য এই কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একদা 'আখ্যানমঞ্জরী' ছাত্রসমাজে বহুল প্রচারিত ছিল, এখন নেই। থাকলে কিশোর বয়সের মধ্যেই ছাত্রসম্প্রদায় নির্ভুল ও প্রয়োগবিধিসঙ্গত বাংলা গদ্য রচনার অধিকারী হতে পারত। এই গ্রন্থগুলি নিতান্তই স্কুলপাঠ্য পুস্তক, তবু এদের একটা বিশেষ মূল্য স্বীকার করতে হবে। বিদ্যাসাগর বিশুদ্ধ রসসাহিত্যের চেয়ে শিক্ষোপযোগী গ্রন্থ রচনার অধিকতর প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। কিন্তু শুধু ছাত্রপাঠ্য কেতাবের আদর্শে 'আখ্যানমঞ্জরী' বিচার্য নয়। তিনি অত্যন্ত সতর্কতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে টেক্স্ট বুক লিখেছিলেন, এর বিষয়বস্তু ও ভাষাকে যথাসম্ভব শিক্ষার উপযোগী করেছিলেন। এ-যুগে যাঁরা স্কুল-বই লেখেন, তাঁরা অবহেলা ভরে লেখেন, আর যারা পড়ে, তারা উদাসীনভাবে পড়ে। এদিক থেকে বিদ্যাসাগর অতিশয় সজাগ ছিলেন। কোন্ আখ্যান ও বিষয় কোন্ বয়সী বালকের উপযোগী, তা তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। 'আখ্যানমঞ্জরী'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একটু অল্পবয়সী বালকের জন্য,

তাই এতে সাধারণ ধরনের নীতি-উপদেশপূর্ণ গল্প অনূদিত হয়েছে, কিন্তু তৃতীয় ভাগ কিশোরদের জন্য রচিত বলে এর কাহিনী সুগঠিত, নীতি-উপদেশের ছড়াছড়িও কম। এমন কি, এর কোন কোন আখ্যানে জীবনের নির্মমতা ও বীভৎসতার চিত্র আছে, প্রেম-প্রণয়ের ইঙ্গিতও আছে।[৩১] সে যাই হোক, টেক্স্ট বুক হিসেবে 'আখ্যানমঞ্জরী'র প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরিয়ে যায় নি। ইদানীং বাজারে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ বলে যে সমস্ত শিশুপালবধকারী কেতাব পাওয়া যাচ্ছে, তাদের চেয়ে বিদ্যাসাগরের অনুবাদমূলক গ্রন্থ তিনটি যে অনেক বেশী মূল্যবান তা অস্বীকার করা যায় না।

৫.

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষা সুগম করার জন্য যে পন্থা নিয়েছিলেন এখানে তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। বাঙালী ছাত্রকে সহজে সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখাবার জন্য বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে আসীন থাকা-কালে 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' (সংক্ষেপে 'উপক্রমণিকা') রচনা ও সঙ্কলন করেন (১৮৫১)। উক্ত পুস্তিকার বিজ্ঞাপনে তিনি বিস্তারিতভাবে এই ব্যাকরণ রচনার কারণ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখে গেছেন। সংস্কৃত কলেজের বালকদের মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ ও অমরকোষ পড়তে হত। তারা অর্থ না বুঝে গ্রন্থগুলির পাঠ্যাংশ কণ্ঠস্থ করার চেষ্টা করত। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করা বড় দুঃসাধ্য, আয়ত্ত করলেও এর দ্বারা খুব বেশী উপকৃত হওয়া যায় না। তাই ছাত্র-সমাজের সুবিধার জন্য তিনি জটিল সংস্কৃত ব্যাকরণকে এমনভাবে সরল

৩১. 'নৃশংসতার চূড়ান্ত' ও 'পুরুষজাতির নৃশংসতা' গল্পে নির্মম চিত্র এবং 'স্বপ্নসঞ্চরণ'-এর কোন কোন অংশে বীভৎস বর্ণনা আছে। 'আশ্চর্য দস্যু দমনে' পরিচারিকা ও এক ব্যক্তির গুপ্তপ্রণয়ের ইঙ্গিত, 'যতোধর্মস্ততো জয়ঃ'-আখ্যানে নায়ক-নায়িকার প্রণয় সঞ্চার এবং প্রতিনায়িকার প্রতিহিংসার কাহিনী আছে।

করলেন যাতে অতি সাধারণ স্তরের বালকও দেবভাষা শিখতে কিছুমাত্র আয়াস বোধ না করে। এই 'উপক্রমণিকা' প্রকাশিত হবার পর শুধু সংস্কৃত কলেজে নয়, সারা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ প্রাথমিক সংস্কৃত শিখবার জন্য একমাত্র এই বইখানাকে অবলম্বন করেছিল। 'উপক্রমণিকা'র রচনাসম্পর্কে একটি কাহিনী তাঁর কোন কোন জীবনচরিতে পাওয়া যায়। তাঁর বন্ধুস্থানীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটু বেশী বয়সে তাঁর কাছে সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। "রাজকৃষ্ণবাবুর বয়োধিক্য নিবন্ধন প্রচলিত প্রথায় ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনা ভয়ে তিনি এই দুর্বোধ্য ও বহুকালব্যাপী মুগ্ধবোধ শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে অল্প আয়াসসাধ্য কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন" করার জন্য চিন্তিত হলেন এবং "বাঙ্গালা অক্ষরের বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া" সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলী সরলভাবে উপস্থাপিত করলেন। "পরিশেষে ইহাকেই মূল ভিত্তি করিয়া 'উপক্রমণিকা'র সৃষ্টি হইয়াছিল।"[৩২] বোধ হয় গোড়ার দিকে তিনি এইভাবে স্বহস্তে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের নিয়মাবলী লিখে তার সাহায্যে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংস্কৃত শিক্ষাদানে অগ্রসর হয়েছিলেন। কারণ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের দ্বারা সেকাজ সম্ভব নয়, তা তিনি আগেই বুঝেছিলেন।

ছাত্রজীবনে তিনি ন' বৎসর বয়সে (১৮২৯, জুন মাস) সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তার দেড় বৎসর পরে (১৮৩১, মার্চ) পাঁচ টাকা করে বৃত্তি পান এবং ১৮৩৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত—মোট তিন বৎসর ছ' মাস তিনি ব্যাকরণের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন (দ্রষ্টব্য: 'শ্লোকমঞ্জরী'র বিজ্ঞাপন)। নয় থেকে বারো বছর পর্যন্ত মোট তিন বৎসরে তাঁকে গোটা 'মুগ্ধবোধ' পড়তে হয়েছিল, শেষ ছ' মাসে 'অমরকোষ' (মনুষ্যবর্গ) এবং 'ভট্টিকাব্য'-এর পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত অধ্যয়ন করতে হয়েছিল। এই তিন বৎসর ব্যাকরণ পড়তে গিয়ে বালক বিদ্যাসাগরকে 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ নিয়ে

৩২. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, পৃ. ৭৭-৭৮

যে হিমসিম খেতে হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য কুমারহট্ট নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের শিক্ষাগুণে তিনি 'মুগ্ধবোধ' আয়ত্ত করেছিলেন ভালই। কিন্তু এ ব্যাকরণ বালকের পক্ষে যে কত দুরূহ তা তিনি নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ১৮৫১ সালে যখন তাঁর নেতৃত্বে সংস্কৃত কলেজের পাঠসংস্কার শুরু হল, তখন অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর জন্য 'উপক্রমণিকা' এবং বয়স্ক ছাত্রের জন্য 'ব্যাকরণ কৌমুদী' নির্দিষ্ট হল। তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন যে, মুগ্ধবোধ-অমরকোষাদি কিছু অধিগত করতে গেলেও ন্যূনপক্ষে পাঁচ বৎসর সময় লাগে। কিন্তু যতটা পরিশ্রম ব্যয় করতে হয় সেই পরিমাণে লাভ হয় নামমাত্র। তাই সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকা থেকে মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ ও অমরকোষ তুলে দিয়ে সেখানে 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' নির্দিষ্ট হল। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের প্রথম পাঠার্থীরা "নিতান্ত শিশু; শিশুগণের পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণপাঠ কোনক্রমেই সহজ ও সুসাধ্য নয়" ('উপ-ক্রমণিকা'র বিজ্ঞাপন)। উপরন্তু "যাঁহারা ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে অত্যন্ত উৎসুক ও অত্যন্ত অভিলাষী হইয়া থাকেন। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ অত্যন্ত দুরূহ ও অত্যন্ত নীরস বলিয়া সাহস করিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না" (ঐ)।[৩৩] তাই তিনি বাংলাভাষায় সংস্কৃতভাষার মোটামুটি শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সঙ্কলন করেন। "ছাত্রেরা প্রথমতঃ অতি সরল বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অতি সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিবেক; তৎপরে সংস্কৃতভাষায় কিঞ্চিৎ বোধাধিকার জন্মিলে সিদ্ধান্ত কৌমুদী ও রঘুবংশাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেক" (ঐ)।

এরপর অধিক-অগ্রসর ছাত্রদের জন্য তিনি 'মুগ্ধবোধ' ও 'লঘুকৌমুদী' অবলম্বনে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের

৩৩. এখানে বোধহয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্কৃত শিখবার কথা বলা হচ্ছে।

ব্যাকরণ শ্রেণীকে তিনি এমনভাবে ঢেলে সেজেছিলেন যে, ছাত্রদের "চারি পাঁচ বৎসরে ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃত ভাষাতেও বিলক্ষণ বোধাধিকার জন্মিতে পারিবে" (ঐ)। দ্বাদশ বৎসরের চেষ্টা ব্যতিরেকে ব্যাকরণ অধিগত হয় না—রক্ষণশীল পণ্ডিতসমাজ এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু "সংস্কৃত ব্যাকরণ বড় খল শাস্ত্র, চিরকাল উপাসনা করিলেও, প্রসন্ন হন না ('আবার অতি অল্প হইল')।" তাই কাব্যের শর্করামণ্ডন দিয়ে ব্যাকরণ শেখাবার প্রচেষ্টা (ভট্টিকাব্য), আদ্যবন্তে চ হরিধ্বনি করে 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ' (জীবগোস্বামী) লিখে একই সঙ্গে ব্যাকরণ শিক্ষা ও পুণ্যার্জনের সুলভ উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তবু এর মন পাওয়া ভার। বিদ্যাসাগর সে দুঃসাধ্য কর্ম সহজ করলেন। বাংলাদেশে আধুনিক কালে ব্যাকরণ শিক্ষাকে সহজ করবার জন্য এবং ইংরেজীশিক্ষিত সমাজের সংস্কৃত ব্যাকরণভীতি দূর করবার জন্য বিদ্যাসাগরের 'উপক্রমণিকা' বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

সর্বশেষে বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত 'শব্দমঞ্জরী' (১৮৬৪) নামে প্রয়োগার্থ অভিধানের কথা উল্লেখ করি। বাংলা শব্দের সাধারণ অর্থ, পদনির্ণয় ও কোন কোন স্থলে শব্দকে বাক্যে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি একটি সরল শব্দকোষ সঙ্কলন করতে চেয়েছিলেন। এটি তিনি সমাপ্ত করতে পারেন নি, স্বরবর্ণ থেকে শুরু করে ব্যঞ্জনবর্ণের ন-কারের অন্তর্গত 'নিবৃত্তি' পর্যন্ত এসে মধ্যপথেই তাঁর মূল্যবান প্রচেষ্টা নিবৃত্তি লাভ করে। বাংলা শব্দের যথার্থ ব্যবহার এবং তার অর্থসম্প্রসারণ অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আজও আয়ত্ত করতে পারেন নি। আমরা ইংরেজী বাগ্‌বৈশিষ্ট্য কণ্ঠস্থ করে রাজ-ভাষার রাজকীয় মহিমা সংরক্ষণে অতিশয় সতর্ক। কোন বঙ্গজ দৈবাৎ ইংরেজী phrase-idiom ভুল করলে তার চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয় (অন্ততঃ ইংরেজ আমলে হত); কিন্তু বাংলা শব্দ ও শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে ইংরেজী শিক্ষার জোয়ারের যুগে আমরা উদাসীন ছিলাম, এখন ভাঁটার টানে সে উদাসীনতা মূঢ় জাড্যে

পরিণত হয়েছে। এখনও প্রবীণ শিক্ষিত ব্যক্তি বা নবীন পড়ুয়া ছাত্র সাধুভাষা ও চলিতভাষার পার্থক্য সম্বন্ধে সব সময়ে অবহিত থাকেন না। বাংলা 'ইডিয়মে'র যথাযথ প্রয়োগ অনেক শিক্ষিত বাঙালী জানেন না—এ অতি সাধারণ ব্যাপার। শতাব্দীকাল পূর্বে বিদ্যাসাগর বাঙালীর মাতৃভাষা শিক্ষার এই দিকটির গুরুত্ব বুঝেছিলেন এবং ছাত্র-জীবনের বনিয়াদ থেকে যাতে শিক্ষার্থীরা বাংলা শব্দের অর্থ-বৈশিষ্ট্য এবং তার প্রয়োগ-বৈচিত্র্য ধরতে পারে, এইজন্য 'শব্দমঞ্জরী' সঙ্কলন করতে ব্রতী হয়েছিলেন। ধরা যাক 'অগাধ' শব্দটি। বিদ্যাসাগর এইভাবে শব্দটির অর্থ, পদপরিচয় ও ব্যবহার দেখিয়েছেন—"অগাধ যার তল স্পর্শ করা যায়—বিং, অতলস্পর্শ, এত গভীর যে তার তল-স্পর্শ করিতে পারা যায় না, যথা—অগাধ সমুদ্র। গভীর, যথা এই সরোবরে অগাধ জল। প্রসার, অসাধারণ, যথা—অগাধ বুদ্ধি, অগাধ বিদ্যা।" এইভাবে তিনি স্বরবর্ণ শেষ করে ব্যঞ্জনের 'নিবৃত্তি' পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। (অভিধানটি সমাপ্ত হলে বাঙ্গলা কোষগ্রন্থের একটি দুর্লভ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে পারত)

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজসংস্কারমূলক রচনা

১.

আধুনিক শিক্ষারীতি প্রসারের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী অনেক অদ্ভুত সমাজসংস্কার প্রত্যক্ষ করেছিল। ডিরোজীওপন্থী হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ যাঁরা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে অভিহিত হতেন, রামমোহন-দেবেন্দ্র-নাথ-কেশবপন্থী ব্রাহ্মসম্প্রদায়, রাধাকান্ত দেববাহাদুর-ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্মসভা'র দল, স্থিতধী ভূদেব, সমন্বয়কামী বঙ্কিমচন্দ্র, বিশুদ্ধ সমাজসংস্কারে আসক্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—এঁরা নানা দিক থেকে বাংলাদেশের জীর্ণ সমাজব্যবস্থাকে নতুন যুগের আলোকে ভেঙেচুরে গড়তে চেয়েছিলেন, কেউ-বা রক্ষণশীলতার শেষ খুঁটি আঁকড়ে ধরে বিগতকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীলতার বাধা এলেও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ প্রগতিশীল সংস্কারের দিকেই অগ্রসর হয়েছে—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষা, বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং আধুনিক জীবন-চেতনাই তার প্রধান কারণ।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজসংস্কার ও সমাজপুনর্গঠনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা মূলতঃ সমাজবিপ্লবীর ভূমিকা। টুলো পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করে এবং সংস্কৃত কলেজের পুরাতন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় লালিত হয়েও বিদ্যাসাগর প্রথম শ্রেণীর সমাজসংস্কারক হিসেবেই এদেশে পরিচিত হয়েছেন। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন এবং বহুবিবাহ নিরোধের চেষ্টায় এই ব্রাহ্মণসন্তান ক্ষত্রিয়োচিত মানসিক বলবীর্যের যে পরিচয় দিয়েছেন, সারা ভারতবর্ষেই তার জুড়ি মেলে না,—না সেযুগে, না-এযুগে। সর্বনাশের শেষসীমায় দাঁড়িয়ে, ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতিকে তুচ্ছ করে তিনি সৎকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে নিজ মত স্থাপন এবং

প্রতিবাদীদের মত খণ্ডনের জন্য যে কয়খানি পুস্তিকা লিখেছিলেন, এখানে আমরা তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। বিতর্কমূলক সাহিত্য, মননশীল নিবন্ধ এবং চিন্তাশীল মৌলিক রচনাশক্তির দিক থেকে এই পুস্তক-পুস্তিকাগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

২

গোড়া থেকেই নানা পত্রপত্রিকার সঙ্গে বিদ্যাসাগর জড়িত ছিলেন, রীতিমতো প্রবন্ধাদি দিয়ে সাহায্য করতেন, বিশেষতঃ প্রগতিশীল ব্যাপারে তিনি ছিলেন সহযোগিতায় উদারহস্ত। 'সর্বশুভকরী' (১৮৫০, ভাদ্র) নামে একটি মাসিকপত্রের সঙ্গে তাঁর কিছু যোগাযোগ ছিল। ঠনঠনের কয়েকজন যুবকে মিলে 'সর্বশুভকরী' নামে একটি সভা এবং তার মুখপত্রস্বরূপ 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' প্রতিমাসে প্রকাশ করবার সংকল্প করে বিদ্যাসাগরের দ্বারস্থ হন। এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বান্ধব মদনমোহন তর্কালঙ্কারেরও খুব যোগাযোগ ছিল। এর সম্পাদক হিসেবে নাম ছিল মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের। প্রতি সংখ্যায় একটি করে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশই এর বৈশিষ্ট্য। এর প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—অবশ্য এতে লেখকের কোন নাম থাকত না। কিন্তু এই প্রবন্ধটি যে বিদ্যাসাগরেরই রচনা তার নানা প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ এর বিষয়বস্তু, ভাবাদর্শ ও যুক্তির উপস্থাপনা বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ('বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস'—সনৎকুমার গুপ্ত সম্পাদিত নতুন সংস্করণ, পৃ. ৮০-৮১) এই তথ্যটি বিবৃত করেছেন।[১] এই প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর অতি সরল ভাষায় এবং অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করে যেভাবে বাল্যবিবাহের দোষোদ্‌ঘাটন

১. রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' এবং বিহারীলাল সরকার 'বিদ্যাসাগরে' এর উল্লেখ করেছেন।

করে বয়স্ক বিবাহের সমর্থন করেছেন, তাতেই তাঁর বিপ্লবী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। নৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য, বংশানুগতি—সব দিক থেকে বিচার করেই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, "অতএব যে বাল্য-বিবাহ দ্বারা আমাদিগের এতাদৃশী দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে, সমূলে তাহার উচ্ছেদ করা কি সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর নহে?" এই প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি দেখিয়েছেন, বাল্যবিবাহের আর একটি কুফল বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি। তখনও তিনি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হন নি বটে, কিন্তু বিধবাদের দুঃখদুর্দশা সম্বন্ধে তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে বলেছিলেন, "বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়।....যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ পরিণত শরীর দ্বারাও নির্ব্বাহকরণ দুষ্কর হয়, সেই দুশ্চর ব্রতে কোমলাঙ্গী বালিকাকে বাল্যাবধি ব্রতী হইতে হইলে তাহার সেই দুঃখদগ্ধ জীবন যে কত দুঃখেতে যাপিত হয়, বর্ণনার দ্বারা তাহার কি জানাইব।" এখানে দেখা যাচ্ছে এই বেদনাবোধ থেকেই পরবর্তীকালে তিনি বিধবাবিবাহকে বৈধীকরণ এবং এর সামাজিক স্বীকৃতির জন্য সর্বস্ব পণ করেছিলেন। আর একটা কথা—এই প্রবন্ধে নর-নারীর বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি যে কথা বলেছেন, প্রাচীন স্মার্ত আচার-আচরণে তার সমর্থন পাওয়া যাবে না, তার সমর্থন পাওয়া যাবে আধুনিক মানুষের জীবন-প্রতীতির মধ্যে। শাস্ত্র বলছেন, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।" পুন্নামক নরক থেকে পুত্র ত্রাণ করবে—এই হলো শাস্ত্রের নির্দেশ। আর শাস্ত্রই বলছেন "অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা দান করিলে পিতামাতার গৌরীদান জন্য পুণ্যোদয় হয়; নবম বর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথিবী দানের ফললাভ হয়; দশম বর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্র লোকপ্রাপ্তি হয়।" বিদ্যাসাগর স্মৃতিশাস্ত্র-প্রতিপাদিত এই সমস্ত নির্দেশকে অবহেলাভরে উপেক্ষা করেছেন। স্মৃতির বিধান ও লোকাচার প্রবল হয়ে বাল্যবিবাহের কুফল সম্বন্ধে সাধারণকে

"কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ" করে রেখেছে। কিন্তু বিবাহের মূল উদ্দেশ্য "সুমধুর পরস্পর প্রণয়"—তা বাল্যবিবাহের ফলে পদে পদে ব্যাহত হয়। বাল্যবিবাহের ফলে এবং অপরিণামদর্শী পিতামাতা কর্তৃক ঝটিতি পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়ার ফলে দাম্পত্য প্রেমের সুমধুর আস্বাদন থেকে অনেকেই বঞ্চিত হয়। বিদ্যাসাগর বলছেন, "মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল।........অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ-পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্র-পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, একবার অন্যোন্য নয়ন-সঙ্ঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেমন অভিরুচি হয়, কন্যাপুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখ দুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িণী গৃহপরিচারিকা স্বরূপ হইয়া সংসাযাত্রা নির্বাহ করে।" (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ১ম, পৃ. ২৪৯)

বিবাহবন্ধনকে শাস্ত্রসংহিতার অষ্টপাশ থেকে এবং প্রজাসৃষ্টির যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি পরস্পরের মনের মিল ও প্রণয়কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর সেযুগের পক্ষে কতটা অগ্রসর হয়েছিলেন তা বোঝা যাবে এই ইঙ্গিতে—প্রাগ্‌বিবাহের কালেও নর-নারী যদি পরস্পরে আশয় জানতে চায়, অভিপ্রায়ে অবগাহন করতে চায়, "আলাপ-পরিচয় দ্বারা" "নয়নসঙ্ঘটনে"ও উদ্যত হয়, তাতেও বিদ্যাসাগরের আপত্তি নেই, বরং তাই-ই তাঁর মনোগত অভিলাষ। এর থেকে তাঁকে সেযুগের পক্ষে যেন গ্রহান্তরের জীব বলে মনে হচ্ছে। যে সমস্ত ব্যাপারে এখনও কারও কারও চক্ষু ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, এক শতাব্দী পূর্বে মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর তাকেই বরমাল্য দিয়েছিলেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ('বাল্যবিবাহের দোষ') তাঁর যে যুক্তিবাদ, কাণ্ডজ্ঞান ও ভাবাবেগ দেশাচারকে উপেক্ষা করেছে'

পরবর্তীকালে বিধবাবিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহ-নিরোধ বিষয়ক পুস্তিকাগুলিতে ও তার আরপরিপক্ক প্রকাশ দেখা যাবে।

৩.

এর পর আমরা বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-বিষয়ক দু'খানি পুস্তিকা সম্বন্ধে আলোচনা করব। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামে একখানি পুস্তিকা বিদ্যাসাগরের স্বনামে প্রকাশিত হয়, যাতে তিনি পরাশরের স্মৃতিগ্রন্থের শ্লোক ("নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥") উদ্ধৃত করে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত ও বৈধ প্রমাণ করেন। এটি অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ-বিষয়ে, পক্ষে ও বিপক্ষে, বহু পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, বিপক্ষেই জনমত প্রবল হয়ে ওঠে। এর কয়েক মাস পরেই ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে অধিকতর বিস্তারিতভাবে ও বিশ্লেষণ করে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব —দ্বিতীয় পুস্তক' প্রকাশিত হয়। যাঁরা বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং সেই কারণে শত্রুতা করার জন্য তাঁকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন, তাঁরাই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ এনেছিলেন। তাঁদের অযৌক্তিক ও হীন আক্রমণের যথোপযুক্ত জবাব দেবার জন্য বিদ্যাসাগর নানা শাস্ত্র-সংহিতা-স্মৃতি থেকে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করে অসাধারণ যুক্তিবুদ্ধির ব্যূহ রচনা করে দ্বিতীয় প্রস্তাব রচনা করেন।

বিদ্যাসাগর বহুকাল-প্রচলিত দেশাচার ও সমাজ সংস্কারের অন্যথাচরণ করেছিলেন বলে বহুজনে মূঢ়ের মতো তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের অনেকেই কৃতবিদ্য ও সমাজের গণ্যমান্য ছিলেন। তবু তাঁরা দেশাচারের ওপরে উঠতে পারেন নি। অমিতবিক্রম ও অকুতোভয় বিদ্যাসাগরকে বন্ধু, শত্রু, আত্মীয়,

সংবাদপত্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত—সকলের সঙ্গেই লিপিযুদ্ধ করতে হয়েছে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়েছেন, আত্মীয়দেরও স্নেহ ও আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, অনেক ধূর্তব্যক্তি তাঁকে প্রতারণা করে নিঃশেষ করেছে। শেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে ছোটলাট সিসিল বিডন সায়েবের কাছে প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপকের পদের প্রার্থী হতে হয়েছিল।[২] কিন্তু তবু তিনি মনে করতেন,"বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি, এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্‌মুখ নই।"[৩]

বিধবাবিবাহের প্রথম প্রেরণা তিনি কোথা থেকে পেলেন, এ বিষয়ে অনেক গল্পকাহিনী গড়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেছেন যে, একদা বীরসিংহে নিজেদের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বসে বিদ্যাসাগর যখন পিতার সঙ্গে কথোপকথন করছিলেন, "এমন সময় জননীদেবী রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া, একটি বালিকার বৈধব্য সংঘটনের কথা উল্লেখ করতঃ দাদাকে বলিলেন, "তুই এতদিন যে শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবাদের কোনও উপায় আছে কিনা?" এ ব্যাপারে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাকি ঠাকুরদাসও বললেন, "বিধবাদিগের পক্ষে বিবাহই একমাত্র উপায়।" বিদ্যাসাগর তদুত্তরে বলিলেন যে, শাস্ত্রাদি পড়ে তাঁরও তাই ধারণা হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে পুস্তকাদি লিখলে বাদপ্রতিবাদে পাছে পিতা রুষ্ট হন, এই জন্য তিনি এ কাজে হাত দিতে সাহস

২. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগরে' (পৃ. ২১৪-২১৫) এই সংক্রান্ত চিঠিপত্র মুদ্রিত হয়েছে।

৩. সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে লেখা পত্রাংশ (বিহারীলালের 'বিদ্যাসাগরে'র ৪৮০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

করছেন না। পিতা কিন্তু পুত্রকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, "এ বিষয়ে যাহা কিছু সহ্য করিতে হয়, তাহা করিব এবং আমাদিগকে যখন যাহা করিতে হইবে, তাহা সাধ্যমতে ক্রটি করিব না। কিন্তু তুমি পুস্তক প্রচার করিবার অগ্রে আর একবার ধর্ম্মশাস্ত্র ভাল করিয়া দেখিয়া প্রবৃত্ত হইবে। প্রবৃত্ত হইবার পর কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবে না; এমন কি, আমরা তোমার পিতামাতা, আমরা নিবারণ করিলেও ক্ষান্ত থাকিবে না।"[৪] বালবিধবাদের দুঃখে যে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত দুঃখিত হবেন তাতে আর সন্দেহ কি? তাঁর পূজনীয় অধ্যাপক বৃদ্ধ শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় মৃতদার হয়ে বৃদ্ধ বয়সে পুনর্বার এক বালিকাকে বিবাহ করেন। এতে বিদ্যাসাগর ভক্তিভাজন অধ্যাপকের ওপর হাড়ে হাড়ে চটে যান, এবং বালিকাবধূর অকালবৈধব্য স্মরণ করে অশ্রুপাতকরতে থাকেন। এরপর তিনি কোনও দিন আর অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করেন নি বা তাঁর বাসায় পদার্পণ করেন নি।

এ বিষয়ে আরও অনেক কাহিনী আছে। বিদ্যাসাগরের স্বগ্রাম-বাসী ও স্নেহভাজন শশিভূষণ সিংহ বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকারকে বলেছিলেন যে, তাঁর (বিদ্যাসাগরের) এক বাল্যসঙ্গিনী বিবাহের অল্পকাল পরেই বিধবা হয়। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। একবার ছুটিতে বাড়ী গিয়ে তিনি এই দুঃসংবাদ শুনলেন। "একথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল, বিধবার এ দুঃখ মোচন করিব; যদি বাঁচি, তবে যাহা হয়, একটা করিব। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ১৩।১৪ বৎসর মাত্র হইবে।"[৫]
বিহারীলাল এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

৪. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (সনৎ গুপ্ত সম্পাদিত শম্ভুচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস', পৃ. ১০৭-১০৮)

৫. শম্ভুচন্দ্রের উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪০

বিদ্যাসাগরের বান্ধব এবং রাধাকান্ত দেববাহাদুরের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু বলেছিলেন, কোন বালিকা বিধবা হয়েছে শুনলে বিদ্যাসাগর কেঁদে আকুল হতেন। আনন্দকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে এর প্রতিবিধান করতে বললে তিনি বললেন, "শাস্ত্রপ্রমাণ ভিন্ন বিধবাবিবাহের প্রচলন করা দুষ্কর। আমি শাস্ত্রপ্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"[৬]
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "১২৬০ সালের বা ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দের শেষ ভাগে একদিন রাত্রিকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও আমি একত্র বাসায় ছিলাম। আমি পড়িতেছিলাম। তিনি একখানি পুঁথির পাতা উল্টাইতেছিলেন। এই পুঁথিখানি পরাশর সংহিতা। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ তিনি আনন্দবেগে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "পাইয়াছি, পাইয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি পাইয়াছ? তিনি তখনই পরাশর সংহিতার সেই শ্লোকটি আওড়াইলেন—"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ইত্যাদি ইত্যাদি।"[৭] কেউ কেউ বলেন, স্কুল পরিদর্শনে কৃষ্ণনগরে গিয়ে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রসঙ্গে তিনি নাকি পরাশরের শ্লোকের কথা শোনেন।[৮] অবশ্য শেষোক্ত তথ্যটি বোধ হয় প্রামাণিক নয়। আরও কতকগুলি তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগরের পূর্বেও কেউ কেউ বিধবাবিবাহের প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। এ বিষয়ে শম্ভুচন্দ্রের মন্তব্য ঠিক : 'কোন কোন ধনশালী লোকের প্রাণসমা কন্যা বিধবা হইলে প্রচার করিতেন যে, বিধবাবিবাহ

৬. বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃ. ২১৯
৭. ঐ, পৃ. ২১৯
৮. ঐ, পৃ. ২১৯ (পাদটীকা)। দেওয়ান কার্তিকচন্দ্র রায় সঙ্কলিত 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে' বলা হয়েছে, "পরাশরোক্ত যে বচন মূল করিয়া মহামতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধবাবিবাহের অখণ্ড ব্যবস্থা দেন, রাজা (শ্রীশচন্দ্র) অনেকদিন পূর্বে সেই বচনসহায়ে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং যখন বিদ্যাসাগরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ, তখন তিনি বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গে এই বচনের উল্লেখ করেন।"

যিনি প্রচলিত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ব্যয়নির্ব্বাহার্থ লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করিব।"[৯]

প্রায় পঁচিশ হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত বিধবাবিবাহপ্রচলন বিষয়ে একাধিক আবেদনপত্র ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হলে ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই নভেম্বর বিল উত্থাপিত হয় এবং আইন-প্রস্তাবক জে. পি. গ্র্যান্ট সায়েব এই বিল সমর্থন করতে উঠে পূর্বেও যে বিধবাবিবাহ হয়েছিল, বা চেষ্টা চলেছিল তার উল্লেখ করে বলেন যে, প্রসিদ্ধ সংহিতাকার রঘুনন্দন, যিনি তিন শত বৎসর পূর্বে বাংলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি তাঁর বিধবা কন্যার বিবাহে সচেষ্ট হলেও সমর্থ হন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ঢাকার রাজবল্লভ পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং অনেকদূর এগিয়েছিলেন, কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন। প্রায় একই সময়ে কোটার রাজাও[১০] অনুরূপ চেষ্টা করতে গিয়ে বিফল হন। স্যর টমাস স্ট্রেঞ্জ, যিনি হিন্দু আইনের উপর বই লিখেছিলেন, তিনি বলেছেন যে, পুনার একদল পণ্ডিত এক অভিজাত হিন্দুকে বিধবা-বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং সেই অনুমতি অনুসারে নাকি বিবাহ অনুষ্ঠিতও হয়েছিল। কিছুকাল পূর্বে মান্দ্রাজের এক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ অনুরূপ বিধান পাসের জন্য একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রায় একই সময়ে নাগপুরের এক মারাঠা ব্রাহ্মণও অনুরূপ একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। যাই হোক বিদ্যাসাগরের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পূর্বে বিধবাবিবাহের একাধিক চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু বহুকাল-প্রচলিত লোকাচারের জন্য এ সমস্ত ব্যাপার বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি। নানা শাস্ত্র ও পুঁথিপত্র ঘেঁটে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের

---

৯. সনৎ গুপ্ত সম্পাদিত শম্ভুচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত', পৃ. ১০৮

১০ শোনা যায় কোটার রাজা বিধবাবিবাহ প্রচলিত করার জন্য চৌদ্দহাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন। ('সংবাদ প্রভাকর' থেকে বিহারীলালের 'বিদ্যাসাগরে' উল্লিখিত হয়েছে। পৃ. ৩২৩)

শাস্ত্রীয় প্রমাণ খুঁজে পেলেন। তিনি মনে করেছিলেন, শাস্ত্রে আছে প্রমাণ করতে পারলেই যুক্তিবাদী ও শাস্ত্র-আচারী বাঙালী-সমাজ বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার করে নেবে। তাই তিনি ১৮৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' এবং অক্টোবরে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করলেন। এর পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ হতে লাগল, নানা দলাদলি শুরু হয়ে গেল। প্রথম পুস্তিকায় তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর উক্ত পুস্তিকা প্রকাশিত হবার কিছু পূর্বে পটলডাঙা নিবাসী শ্যামাচরণ দাস নিজ বালবিধবা কন্যার পুনর্বিবাহের জন্য শাস্ত্রযাজী পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, তাঁদের কাছে শাস্ত্রের ব্যবস্থা চেয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ স্মার্ত-পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত, স্বহস্তে তার প্রমাণ বিষয়ক পত্রী লিখে দেন। এতে আরও অনেক শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিত (কাশীনাথ শর্মা, ভবশঙ্কর শর্মা, রামতনু দেবশর্মা, ঠাকুর-দাস দেবশর্মা, হরিনারায়ণ দেবশর্মা, মধুসূদন শর্মা এবং হরনাথ শর্মা) স্বাক্ষর দিয়ে একবাক্যে সিদ্ধান্ত করেন, "মন্বাদিশাস্ত্রেষু নারীণাং পতিমরণান্তরং ব্রহ্মচর্য-সহমরণ-পুনর্ভবণানামুত্তরোত্তরাপকর্ষেণ বিধবা-ধর্মতয়া বিহিতত্বাৎ"—অর্থাৎ মনু প্রভৃতি শাস্ত্রে নারীর পতিবিয়োগের পর ব্রহ্মচর্য, সহমরণ ও পুনর্বিবাহ বিধবাদের ধর্ম বলে বিহিত হয়েছে। এর পর এই ব্যবস্থাপত্র নিয়ে এক বিবাদ উপস্থিত হয়। ভবশঙ্কর বিদ্যা-রত্ন (যিনি এই পত্রীর অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন) বিধবাবিবাহের বিরোধী নবদ্বীপের স্মার্তপণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিষম বিতর্কে জয়ী হন। কিন্তু পরে যখন বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে পুস্তিকা লিখলেন ও আন্দোলন আরম্ভ করলেন, তখন এঁরা সহসা বিধবা-বিবাহের ঘোর প্রতিবাদী হয়ে পড়লেন।

বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল, অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করে দিলেন। কিন্তু এই নিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ বিপুল বিক্রমে এগিয়ে

চললেন। ক্রমে দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশিত হল। অতঃপর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আইন পাস করাবার জন্য বিখ্যাত ব্যক্তিরা আবেদন করলেন। বিদ্যাসাগরের পক্ষে প্রায় পঁচিশ হাজার ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে একাধিক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, সেই আবেদনপত্র-গুলি ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হয়েছিল।[১১] প্রথম আবেদনটিতে কলকাতার সহস্রাধিক অতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্বাক্ষর ছিল। এখানে প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে: উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি দ্বারকনাথ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ('তত্ত্ববোধিনী'), ঈশ্বর গুপ্ত ('সংবাদ প্রভাকর') ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা (বিদ্যাসাগর), ভোলানাথ চন্দ, দুর্গাচরণ লাহা, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্যামাচরণ দে, গৌরদাস বাসক, বিচারপতি হরচন্দ্র ঘোষ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রাম-গোপাল ঘোষ, রাজনারায়ণ বসু, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ইত্যাদি। অবশ্য রাধাকান্ত দেববাহাদুরের নেতৃত্বে পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর-যুক্ত প্রতিবাদপত্রও ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হয়েছিল।[১২] কিন্তু

---

১১. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, পৃ. ২৫৬

১২. এ বিষয়ে বিশেষ পক্ষের ব্যক্তিরা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন ও বিধবাবিবাহের সমর্থক চণ্ডীচরণের মতে, ব্যবস্থাপকসভায় এই বিলের অনুকূলে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত আবেদনপত্র প্রেরিত হয়েছিল তাতে প্রায় ২৫,০০০ স্বাক্ষর ছিল। প্রথম আবেদনে হাজারখানেক গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। তাঁর মতে বিরোধী-পক্ষীয়েরা রাধাকান্তের নেতৃত্বে যে প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছিলেন তাতে বড় জোর ৩০,০০০ স্বাক্ষর ছিল। বিহারীলালের মতে বিরুদ্ধবাদীদের আবেদনপত্রে ৫০।৬০ হাজার স্বাক্ষর ছিল। তবে গ্র্যান্ট সায়েবের বক্তৃতা এবং উক্ত আইনের তৃতীয়বার আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, গ্র্যান্ট বলেছিলেন "বিরোধীগণের ত্রিশ

আইন-প্রণেতারা তা গ্রাহ্য করেন নি। বিদ্যাসাগরের পক্ষে বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি—পণ্ডিত, বিচারপতি, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজপতি, ভূস্বামিসম্প্রদায় (বর্ধমানের ও কৃষ্ণনগরের মহারাজারা বিদ্যাসাগরের বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন), এই আবেদনপত্রে সানন্দে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। এটি ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হয়। গ্র্যাণ্ট সায়েব নিজে তৎপর হয়েছিলেন বলে বিরোধী-পক্ষের সমস্ত বাদ-প্রতিবাদ তুচ্ছ করে বিদ্যাসাগরের পক্ষীয়দের অনুকূলে হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইন পাস করিয়েছিলেন। ১৮৫৫ সালের ১৭ই নভেম্বর আইনসভায় উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি প্রথম পঠিত হয়। ১৮৫৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি পাণ্ডুলিপিটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়, ৩১শে মে সিলেক্ট কমিটি রিপোর্ট পেস করেন, ১৯শে জুলাই আইনের পাণ্ডুলিপি তৃতীয়বার আলোচিত (Third reading) হয়। ২৬শে জুলাই (১২৬৩ সন, ১৫ই শ্রাবণ) বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়ে গেল। এরই নাম '১৮৫৬ সালের ১৫ই আইন' (Act XV of 1856)। এই আইন পাস হলে বিধবার পুনর্বিবাহ আইনতঃ স্বীকৃত হল এবং এই বিবাহে বিধবার গর্ভজাত সন্তান জনকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলেও গৃহীত হল, কিন্তু পুনর্বিবাহের পর বিধবা পূর্বস্বামীর সম্পত্তির অধিকার হারাল। গ্র্যাণ্ট সায়েবের আন্তরিক চেষ্টার ফলে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এ আইন পাস হয়ে গেল। কিন্তু আইন পাস করেই বিদ্যাসাগর ক্ষান্ত হলেন না, যথার্থই বিধবাবিবাহের উদ্যোগ করলেন। কলকাতার নিকটবর্তী খাঁটুরা গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুগত

সহস্র স্বাক্ষরের তুলনায় বিধবাবিবাহ পক্ষীয় লোকদের স্বল্পসংখ্যক স্বাক্ষরের মূল্য অনেক, কারণ এরূপ সংস্কারের পক্ষে সাহস করিয়া অগ্রসর হওয়া কিরূপ কঠিন কার্য তাহা ভাবিলে, প্রত্যেকেই আমার কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।" (চণ্ডীচরণ—বিদ্যাসাগর, পৃ. ১৬২)

ছিলেন, বিধবাবিবাহের প্রথম আবেদনে স্বাক্ষরও করেছিলেন। তিনি বিধবাবিবাহ করতে সম্মত হলেন। পাত্রী হল বর্ধমানের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী। ব্রহ্মানন্দ পূর্বে স্বর্গারোহণ করায় তাঁর বিধবা পত্নী লক্ষ্মীমণি দেবী কন্যার বিবাহ দিতে ও সম্প্রদানে প্রস্তুত হলেন।[১৩] আইন পাস হবার কয়েক মাসের মধ্যে এই বিবাহ-সংঘটন হয়। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী থেকে এই বিবাহের উদ্যোগ-অনুষ্ঠান হয়। হিন্দুমতেই সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই ব্যাপার নিয়ে শহর তোলপাড় হয়েছিল। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করে পথে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। বরের পালকী ধরেছিলেন কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা —রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকনাথ মিত্র প্রভৃতি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি। পার্শ্ববর্তী বালি ও শিবপুর থেকেও বহু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক এই বিবাহে উপস্থিত হয়েছিলেন। মহাধুমধামে ১৯৫৬ সালের ১৫ আইনানুসারে প্রথম বিধবাবিবাহ হয়ে গেল পুরোপুরি হিন্দুনিয়মে। বরকন্যা ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ভুক্ত। রাজকৃষ্ণের বাড়ীর মেয়েরা এই বিবাহে কুমারী-বিবাহের মতোই সমস্ত খুঁটিনাটি আয়োজন করেছিলেন, কোনও অনুষ্ঠানের বিন্দুমাত্রও ব্যত্যয় হয় নি।

বিধবাবিবাহের জন্য যে প্রথম আবেদন প্রেরিত হয়, তাতে অন্যতম স্বাক্ষরকারী হিসেবে 'সংবাদ-প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তেরও নাম

১৩. লক্ষ্মীমণি দেবী নিজের নামে নিমন্ত্রণ পত্র মুদ্রিত করেন। তার নমুনা :

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেব্যাঃ বিনয়ং নিবেদনম্,

২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ হইবেক, মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়ার সুকেয় ষ্ট্রীটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি। তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ শকাব্দঃ ১৭৭৮।

ছিল।[১৪] পরে তিনি বিধবাবিবাহের বিপক্ষতা করে বিদ্যাসাগরকে ব্যঙ্গ করে ছড়া ফেঁদেছিলেন এবং 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রথম বিধবাবিবাহের বিদ্বেষমূলক ও অভিসন্ধিপ্রসূত এক বর্ণনাও সংযোজিত করেছিলেন।[১৫] তাঁর প্রতিযোগী সম্পাদক ('রসরাজ' ও 'সংবাদ ভাস্কর') গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর পত্রে বিধবাবিবাহকে সমর্থন করেছিলেন। মনে হয় জর্নালিস্ট-সুলভ ঈর্ষাবশতই ঈশ্বর গুপ্ত বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন।

এই বিধবাবিবাহের যাবতীয় ঝুঁকি বিদ্যাসাগর একাকী নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। ঠাকুরদাস পুত্রকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, "বাবা! ধরিবার পূর্ব্বে ভাবা উচিত, ধরেছ ছেড়ো না, প্রাণপর্যন্ত স্বীকার করিও।"[১৬] বিদ্যাসাগর তাই-ই করেছিলেন, সর্বস্ব পণ করে সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌঁছেছিলেন। এই ব্যাপারে প্রায় ৪০-৫০ হাজার টাকা ব্যয় করে তিনি শেষজীবনে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন, চারিদিকে ঋণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, নানা জনের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন।[১৭] কিন্তু তিনি যত বাধা পেয়েছেন, ততই দৃঢ়তর বিক্রমে ছদ্মবেশী বন্ধু, প্রতিকূল শত্রু এবং মূঢ় দেশাচারের বিরুদ্ধে শাস্ত্র ও যুক্তির অস্ত্র ধারণ করে প্রায় একাকী সংগ্রাম করে গেছেন।

শ্রীশচন্দ্রের বিধবাবিবাহের সংবাদ সারা দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। আইন পাস হবার আগেই কিন্তু প্রচণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। শান্তিপুরের তাঁতীরা মূল্যবান কাপড়ের পাড়ে বিধবাবিবাহ-

১৪. চণ্ডীচরণ তার গ্রন্থে এই স্বাক্ষরকারীদের ৭৪ জনের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে ২৪শ স্থানে ঈশ্বর গুপ্তের নাম এইভাবে মুদ্রিত হয়েছে—'ঈশ্বর গুপ্ত (প্রভাকর)'। (পৃ. ২৫৫)

১৫. বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃ. ২৩০-২১

১৬. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (সনৎ গুপ্ত সম্পাদিত) পৃ. ১১০

১৭. বিহারীলাল সরকারের ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৩২৩

সংক্রান্ত ব্যঙ্গাত্মক গান রচনা করে বেশ কিছু উপার্জন করেছিল। সেই গানের শেষের দু' স্তবক উদ্ধৃত হচ্ছে :

একাদশী উপোসের জ্বালা, কর্ণেতে লাগিল তালা,
ঘুচে যাবে সে সব জ্বালা, জুড়াবে জীবন ;
দু'জনাতে পালঙ্কেতে করিব শয়ন—
বিনাইয়া বাঁধব খোঁপা গুঁজিকাটি মাথায় দিয়ে।
যেদিন হতে মহাপ্রসাদ শুনেছি ভাই, এ সংবাদ,
সেদিন হতে আনন্দেতে হয় না রেতে ঘুম—
পছন্দ করেছি বর না হতে হুকুম,
ঠাকুরপোরে করব বিয়ে ঠাকুরঝিরে বলে কয়ে ॥[১৮]

আইন পাস হবার পরে 'দিদি, ফিরেছে কপাল' গানটিও খুব প্রচলিত হয়েছিল।

প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানের অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে এবং অর্থব্যয়ে আরও কয়েকটি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর ব্যয়নির্বাহের জন্য যে সমস্ত ধনকুবের তাঁকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, নানা অছিলায় তাঁরা ক্রমে ক্রমে কর্মক্ষেত্র থেকে সরে পড়লেন। ফলে আর্থিক ক্ষতির সব ঝুঁকি তাঁর ওপর এসে পড়ল। ১২৬৩ সনের (১৮৫৬-৫৭ খ্রীঃ অঃ) মধ্যে আরও তিনটি বিধবাবিবাহের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কায়স্থ কৃষ্ণমোহন বিশ্বাস ও বালবিধবা থাকমণি দাসীর বিবাহও শ্রীশচন্দ্রের বিবাহের কয়েকদিন পরে (১২৬৩ সন, ২৫ অগ্রহায়ণ) অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় বিবাহের বরের নাম মধুসূদন ঘোষ, কলকাতায় অভিজাত বংশের শিক্ষিত যুবক, প্রেসিডেন্সি কলেজের ল'-ক্লাসে অধ্যয়ন করতেন। এই বিবাহে বিদ্যাসাগরের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল। চতুর্থ বিবাহও এই বৎসরের ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। পাত্র—দুর্গানারায়ণ বসু, প্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসুর পিতৃব্যপুত্র।

১৮. শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থে এইভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। এর অন্য পাঠও প্রচলিত ছিল।

দুর্গানারায়ণও স্কুলের অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন। এই বিবাহে রাজনারায়ণ মহোৎসাহে যোগদান করেছিলেন। তাঁর মধ্যম সহোদর মদনমোহন বসুও জ্যেষ্ঠের উৎসাহে বিধবাবিবাহ করেছিলেন।[১৯]

এবার বিদ্যাসাগরের পুস্তিকাখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক। প্রথম পুস্তিকা মাত্র বাইশ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।[২০] অবশ্য তার পূর্বেই তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় সে বিষয়ে কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, যার ফলে তাঁর পুস্তিকা প্রকাশিত হবার কিছু পূর্ব থেকেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এ বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয়কুমার দত্ত এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন; কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই ধরনের সামাজিক আন্দোলন ও গোলমালের বড় একটা পক্ষপাতী ছিলেন না। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে প্রবন্ধ লেখালেখি করুন এ-ও তিনি চাইতেন না। সে যাই হোক, প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেল (দু'হাজার কপি মুদ্রিত)। এর কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হল। রাজপুরুষের কাছে এবং যাঁরা বাংলা বোঝেন না, তাঁদের কাছে পুস্তিকাদ্বয়ের মূল বক্তব্য উপস্থাপিত করার জন্য

১৯. রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রও সোৎসাহে বিধবাবিবাহ সমর্থন করতেন। তিনি ১৮৮৪ সালে বোম্বাইয়ের মালাবারিকে লিখেছিলেন, "I have no daughter, but if I had the misfortune to have a young widowed one in my house, I would have certainly tried my utmost to get her remarried." (চণ্ডীচরণের গ্রন্থে উদ্ধৃত, ঐ গ্রন্থের পৃ. ৩০৮, পাদটীকা). তিনি ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে *On the Funeral Ceremonies of the Ancient Hindus* প্রবন্ধে প্রাচীন যুগে বিধবাবিবাহের সুপ্রচলন ছিল, তার নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য : চণ্ডীচরণের 'বিদ্যাসাগর', পৃ. ২২৩, পাদটীকা

২০. বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর, পৃ. ২৮০

বিদ্যাসাগর ইংরেজীতে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। এটি *Marriage of Hindu Widows* নামে ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর ইংরেজীনবীশ বন্ধুদের সাহায্যে অনুবাদ করেছিলেন।[২১] তাঁর বাংলা পুস্তিকা প্রকাশিত হলে বিরোধী পক্ষীয়েরা তাঁর নামে নানা রকম হীন অভিযোগ করলেন। কেউ কেউ বললেন, "বিদ্যাসাগর এই পুস্তকের রচনামাত্র করিয়াছেন, যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অন্যদীয়; অর্থাৎ তিনি নিজে সে সকল যুক্তি উদ্ভাবিত, কিম্বা সে সকল প্রমাণ তত্তৎ গ্রন্থ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারেন নাই" (উক্ত পুস্তিকার চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য)। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছাত্র ও বন্ধুদের দ্বারা কয়েকটি প্রমাণ পুঁথিপত্র থেকে বার করে নিলেও আর সমস্তই নিজে সংগ্রহ করেছিলেন। ২১৫টি প্রমাণের মধ্যে তিনি মাত্র ১৩টি প্রমাণ অন্যের কাছে সন্ধান পেয়েছিলেন। কেউ কেউ বিদ্যাসাগরের ওপর অনৃতাচার ও কাপট্যের অভিযোগ এনেছিলেন। তাঁদের মতে বিদ্যাসাগর যে-সমস্ত শ্লোক প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করেছিলেন,

২১. এ বিষয়ে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, "তিনি একদিন আমাকে স্পষ্ট বলিলেন, "তোরা দুইয়ের বার হয়ে রইলি; না ইংরাজিও তেমন লিখতে পারিস, না সংস্কৃতেও পণ্ডিত হলি।" তিনি তখন বিধবাবিবাহ বাদানুবাদে মগ্নপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিলাষ ছিল যে, তাঁহার যুক্তিবিন্যাসগুলি ইংরাজিতে উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু সংস্কৃতও ভাল বুঝে, ইংরাজিও ভাল লিখিতে পারে এরূপ লোক না পাওয়ায় নিরস্ত হইয়াছিলেন" (পুরাতন প্রসঙ্গ, নবসংস্করণ, পৃ. ৫৯)। কৃষ্ণকমলের একথা ঠিক নয়। কারণ বিধবা-বিবাহবিষয়ক ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীনাথ বসু প্রভৃতি ইংরেজীনবীশ বন্ধুরা বিদ্যাসাগরকে ইংরেজী অনুবাদে সাহায্য করেছিলেন, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী প্রুফ দেখেছিলেন। (দ্রষ্টব্য: বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃ. ৩০১)

তার অধিকাংশই প্রাচীন পুঁথিতে ছিল না, এ সব তাঁরই রচিত।[২২] নিজ নিজ সংস্কারের জন্য আমাদের দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি—এমন কি দেবভাষার ধারক ও বাহক শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দলও অনেক সময়ে অক্লেশে মিথ্যাচার করে থাকেন, 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ'—এই মহাবাক্যানুসারে তাঁরা বিদ্যাসাগরের ওপরে কাপট্যাচরণের অভিযোগ এনেছিলেন, কিন্তু প্রমাণ দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

প্রথম প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বিধবাবিবাহ কর্তব্যকর্ম কিনা তাই বিচার করেছেন। শুধু যুক্তির ওপর নির্ভর করে কোনও কিছু সিদ্ধান্তে আসা এ দেশের লোকের স্বভাববিরুদ্ধ। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কেউ-ই বিশুদ্ধ যুক্তির ছায়া মাড়াতে চায় না। কিন্তু শাস্ত্রে আছে, প্রমাণ করতে পারলে যুক্তিবিরোধী ব্যাপারেও অনেকে উৎসাহিত হতে পারে। বিদ্যাসাগর বলছেন, "যদি শাস্ত্রে কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন।...অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক" (বি. র. ২ পৃ. ১১৬)।

অতঃপর তিনি শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হলেন এবং মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করলেন। মনু প্রভৃতির সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখালেন, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিযুগের মানুষের রীতি-চরিত্র

২২. প্রসন্নকুমার দানিয়াড়ী নামে এক ব্যক্তি বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করে একখানি পুস্তিকা লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় আপন মত সমর্থনার্থ অনেক গ্রন্থের প্রকৃত পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।" বিহারীলাল সরকার এ বিষয়ে বলেছেন, "কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-চরিত সমালোচনা করিলে, এ কাপট্যাচরণ আরোপিত করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বোধহয়, গ্রন্থে প্রকৃতই পাঠান্তর আছে। বিদ্যাসাগর কপট একথা স্বপ্নেও আসে না।" ('বিদ্যাসাগর', পৃ. ২৭২)

আলোচনা করলে দেখা যাবে, "উত্তরোত্তর যুগে যুগে, মানুষের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া যাইতেছে" (ঐ, পৃ, ১১৭)।[২৩]

তারপর তিনি 'পরাশর সংহিতা'র একটি শ্লোক থেকে প্রমাণ করলেন যে, কলিযুগে পরাশরের স্মৃতিগ্রন্থই একমাত্র অবলম্বন হওয়া উচিত।[২৪] ঋষিবাক্য মানলে পরাশরকে অস্বীকার করা যায় না। পরাশর সংহিতায় পুনঃপুনঃ কলিযুগের কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং বিদ্যাসাগরের মতে, "এই সমুদায় দেখিয়া পরাশর সংহিতা যে কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র, সে বিষয়ে আর কোনও আপত্তি অথবা সংশয় করা যাইতে পারে না" (বি. র. ২. পৃ. ১২০)। পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্লোকগুলি পাওয়া গেছে। প্রত্যেক পুঁথিতেই এই শ্লোকের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং এর প্রামাণিকতায় সন্দেহ করা চলবে না, বা এটি প্রক্ষিপ্ত বা এর পাঠান্তর আছে, একথাও বলা চলবে না।[২৫] কারণ পরবর্তী কালে অত্যন্ত রক্ষণশীল ও বিধবাবিবাহের ঘোর প্রতিবাদী পঞ্চানন তর্করত্ন 'বঙ্গবাসী' থেকে পরাশর সংহিতার যে সংস্করণ অনুবাদ ও সম্পাদনা

২৩. অন্যে কৃতযুগে ধর্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং হ্রাসানুরূপতঃ॥ যুগ (মনু. ১।৫৮)

যুগানুসারে মানুষের শক্তি হ্রাস পায়, সত্যযুগের ধর্ম একপ্রকার, ত্রেতাযুগের ধর্ম আর এক রকম, দ্বাপরযুগের ধর্ম আলাদা, কলিযুগের ধর্ম অন্য ধরনের।

২৪. কৃতে তু মানবা ধর্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ, পরাশরাঃ স্মৃতাঃ॥

"মনু নিরূপিত ধর্ম সত্যযুগের ধর্ম, গৌতম নিরূপিত ধর্ম ত্রেতাযুগের ধর্ম, শঙ্খ লিখিত ও নিরূপিত ধর্ম দ্বাপরযুগের ধর্ম, পরাশরনিরূপিত ধর্ম কলিযুগের ধর্ম।" (বি. র. ২. পৃ. ১১৭)

২৫. বিধবাবিবাহের ঘোর প্রতিবাদী বিহারীলাল সরকারকতকটা এই মত পোষণ করতেন। তিনি বলেছেন, "বোধহয়, গ্রন্থে প্রকৃতই পাঠান্তর আছে" (ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১৯২)। বিদ্যাসাগর জেনে শুনে মিথ্যাচার করেছিলেন, বা পুঁথির পাঠ বদলিয়ে ফেলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের চরিতকার বোধহয় ততটা যেতে প্রস্তুত

করেছিলেন, তাতেও 'নষ্টে মৃতে' শ্লোকটি ছিল। অবশ্য তিনি সেই শ্লোকের একটা মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। পরাশর সংহিতায় উক্ত শ্লোক না থাকলে, বা সে সম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ থাকলে পঞ্চানন তর্করত্ন সেই রন্ধ্রপথে উক্ত শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলে সরাসরি বাতিল করতেন এবং বিধবার পুনর্বিবাহ পরাশর অনুমোদিত নয় বলে কলকণ্ঠে ঘোষণা করতেন। যাই হোক বিদ্যাসাগর একদিন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে হাতে লেখা পুঁথি খুঁজতে খুঁজতে পরাশর স্মৃতির মধ্যে এই শ্লোকটি পেলেন :

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥
মৃতে ভর্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্ধককোটি চ যানি লোমানি মানবে।
তৎকালং বসেৎ স্বর্গং ভর্তারং যানুগচ্ছতি ॥

বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদ :

"স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনার্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। যে নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায়, স্বর্গলাভ করে। মনুষ্যশরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তৎসমকাল স্বর্গ বাস করে।" (বি. র. ২, পৃ. ১২০)

এখানে দেখা যাচ্ছে শুধু বিধবা নয়, স্বামী নষ্ট, সন্ন্যাসী, ক্লীব ও পতিত হলে পরাশর নারীর পত্যন্তর গ্রহণের বিধি দিয়েছেন। অবশ্য স্বামীর

ছিলেন না। তাই তিনি কোনও প্রকারে বিদ্যাসাগরকে কপট আচরণ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, "কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত সমালোচনা করিলে, এই কাপট্যাচরণ আরোপ করিতে প্রকৃতই প্রবৃত্তি হয় না।" (ঐ, পৃ, ২৯২) এ যেন অনেকটা 'damning with faint praise.'

মৃত্যুর পর যে নারী ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে, মানুষের শরীরে যত লোম আছে (সাড়ে তিন কোটি), সে তত বছর স্বর্গে বাস করে। পরাশর উক্ত শ্লোকের প্রথমেই নারীর পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা দিয়েছেন। কারণ তিনি জানতেন, "কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই, লোকহিতৈষী ভগবান্ পরাশর সর্ব্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন" (ঐ. পৃ. ১২০)।[২৬] এর পর বিদ্যাসাগর পরাশর থেকে যুক্তি নির্ধারণ করে দেখালেন, বিধবার পুনর্বিবাহের পর যে পুত্র জন্মাবে তাকে 'পুনর্ভব' বলা চলবে না, তাকে ঔরস ও বৈধ পুত্রই বলতে হবে। কারণ পরাশরের কোথাও 'পৌনর্ভব' শব্দ নেই। সুতরাং মনে হচ্ছে পরাশর বিধবাবিবাহে জাত সন্তানকে শাস্ত্রসম্মত ও ঔরসপুত্র বলেই গ্রহণ করেছিলেন।[২৭] পরাশরের প্রমাণ ধরে বিদ্যাসাগর প্রথমে বিধবার পত্যন্তর গ্রহণকে ধর্মীয় ও সমাজিক উভয় দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তারপর বিধবাবিবাহের সন্তানকে ঔরসপুত্র, সুতরাং পিতার সম্পত্তিতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। কলিযুগে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ, কোন স্মৃতিতেই এরূপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নিষেধ নেই। কলিযুগে কোন্ কোন্ কর্ম নিষিদ্ধ তা বৃহন্নারদীয় পুরাণ (উদ্বাহতত্ত্ব), যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা এবং আদিত্যপুরাণে বলা আছে। সে তালিকায় বিধবার

২৬. পিতা ঠাকুরদাস পুত্রকে একবার বলেছিলেন যে, কলিতে স্ত্রীলোকে ব্রহ্মচর্য পালনে অপারগ। সুতরাং একালে বিধবাদের বিবাহের ব্যবস্থা থাকা উচিত। (দ্রষ্টব্য—শম্ভুচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত', সনৎ গুপ্ত সম্পাদিত নূতন সংস্করণ, পৃ. ১০৭)

২৭. মনু ঔরসপুত্রের সংজ্ঞায় বলেছেন :

স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ন্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিকম্॥ (৯।১৬৬)

বিবাহিত সজাতীয় স্ত্রীতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করে, সেই পুত্র ঔরসপুত্র এবং তাকেই মুখ্যপুত্র বলে।

পুনর্বিবাহের কোন প্রসঙ্গই নেই—বিধিও নেই, নিষেধও নেই। পূর্ব পূর্ব যুগে বিধবাবিবাহের সন্তানকে 'পৌনর্ভব' বলত। কিন্তু কলিযুগে পরাশর সেকথা বলেন নি। সুতরাং এ কালে বিধবাবিবাহে উৎপন্ন পুত্রকে ঔরস পুত্রই বলতে হবে—'পৌনর্ভব' নয়। কিন্তু যদি পুরাণে বিধবাবিবাহের নিষেধ থাকে, এবং স্মৃতিতে তার বিধি থাকে, তা হলে কোন্‌টি গ্রহণ করতে হবে? শাস্ত্রমতানুসারে, স্মৃতি ও পুরাণে বিবাদ বাধলে স্মৃতিই গ্রাহ্য হবে, পুরাণ বাতিল হবে। সুতরাং বৃহন্নারদীয় পুরাণ বা আদিত্যপুরাণে যাই থাক না কেন, পরাশর স্মৃতির বিধানই কলিযুগে একমাত্র গ্রহণীয়।[২৮] অতএব বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তিকায় সিদ্ধান্ত করলেন, "অতএব, কলিযুগে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম, তাহা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইল।" (বি. র. ২. পৃ. ১২৬)

কিন্তু কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারেন, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হলেও শিষ্টাচারসঙ্গত নয়। সুতরাং এদেশে প্রচলিত হওয়া উচিত নয়। বিদ্যাসাগর সে প্রশ্নের মীমাংসাও শাস্ত্রের দ্বারাই করেছেন। 'বশিষ্ঠ-সংহিতা' বলছেন যে, শাস্ত্রে কোন বিধি পাওয়া না গেলে শিষ্টাচার মানা চলতে পারে।[২৯] শাস্ত্রে (অর্থাৎ পরাশরে) যখন কলিযুগে বিধবাবিবাহের বিধান রয়েছে, তখন শিষ্টাচার বা লোকাচারের দোহাই দেবার প্রয়োজন নেই। বিধবাবিবাহ ইদানীং সমাজে প্রচালত নেই

২৮. কারণ ব্যাসসংহিতায় বলা হয়েছে :

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।

তত্র শ্রোতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা ॥

সেখানে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যাবে, সেখানে বেদকেই প্রমাণ হিসাবে ধরতে হবে, আর স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে বিরোধ বাধলে স্মৃতিকেই প্রমাণ হিসেবে ধরতে হবে।

২৯. "লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্।" কি লৌকিক, কি পারলৌকিক উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম অবলম্বন করা উচিত। শাস্ত্রের বিধান না পেলে শিষ্টাচারকে (বা লোকাচার) প্রমাণ বলে ধরতে হবে।

বলে সমাজে যে কত অন্যায় ও দুষ্ক্রিয়া গোপনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার হিসেব নেই। বিদ্যাসাগর বাস্তব পরিবেশ ও নারীর সাধারণ মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন না। কন্যা বিধবা হলে কন্যার আত্মীয়েরা যে কত বেদনাবোধ করেন তার ইয়ত্তা করা যায় না। আবার অনেক বিধবা দুর্জয় রিপুকে শান্ত করতে না পেরে মহাপাপেও লিপ্ত হয়ে পড়ে। ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অপকর্ম গোপনে অনুষ্ঠিত হয় সমাজে বিধবাবিবাহের প্রচলন নেই বলে।

এই পুস্তিকা থেকে দেখা গেল, তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল, পরাশর স্মৃতির শ্লোক। তিনি মনে করেছিলেন, বাঙালী জাতি শাস্ত্র মেনে চলে। শাস্ত্রে বিধবাবিবাহ বৈধ, এ-কথা প্রমাণ করতে পারলেই সকলে তাঁর মত মেনে নেবে। কিন্তু পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারলেন, শাস্ত্রসংহিতা, তত্ত্বকথা যুক্তি-বুদ্ধি—কোনও কিছুর দ্বারাই বাঙালীরা পরিচালিত হয় না, তারা পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে সকলেই লোকাচারের দাস। যা চলে আসছে, তা যতই নির্মম হোক, তারা অম্লানবদনে তা পালন করে যায়। বিদ্যাসাগর নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করে বিধবাবিবাহ অতি ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করে উক্ত পুস্তিকার সর্বশেষে পাঠককে অনুরোধ করেছিলেন, "পরিশেষে, সর্ব্বসাধারণের নিকট বিনয়বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া, এবং বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহার আদ্যোপান্ত বিশিষ্টরূপ আলোচনা করিয়া দেখুন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা।"

(বি. র ২. পৃ, ১২৭)

কিন্তু পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমাজে দাবানল ছড়িয়ে পড়ল। এর আগে সহমরণপ্রথা বিলোপের সময় এই ধরনের প্রবল আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অবশ্য সরকারী নিষেধাজ্ঞার ফলে আধুনিক শিক্ষা ছড়িয়ে পড়লে সহমরণপ্রথার বীভৎসতা সহৃদয় ব্যক্তিকে দ্রবীভূত করেছিল। কিন্তু বৈধব্যজীবন সমাজে গভীরভাবে

অনুপ্রবিষ্ট সংস্কার, যা সহজে উন্মূল হতে পারে না। এর সঙ্গে আমাদের এমনই সংস্কারের যোগ যে, বিধবাবিবাহ বললেই যেন কোথায় আঘাত লাগে। তাই এই পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন উন্নতহৃদয় প্রগতিশীল ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করলেও অনেক শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও ভূস্বামীরা তাঁর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। অভিজাততন্ত্রের অনেক সমাজ-প্রধান তাঁদের সভাপণ্ডিতদের দ্বারা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে পুস্তিকা লিখিয়ে নিয়ে প্রচার করেছিলেন। এই সমস্ত পুস্তিকার অধিকাংশই মহাকালের সম্মার্জনী আঘাতে লুপ্ত হয়ে গেছে। এর মধ্যে দু'-চারখানির নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে: (১) আঁটপুর দর্শনশাস্ত্র-অধ্যাপক শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ রচিত এবং উমাকান্ত তর্কালঙ্কার সংশোধিত 'বিধবাবিবাহের নিষেধক প্রচার', (২) কাশীপুরবাসী শশিজীবন তর্করত্ন ও জানকী-জীবন ন্যায়রত্ন প্রণীত 'বিধবাবিবাহ-নিষেধক প্রমাণাবলী', (৩) কালিদাস মৈত্র বিরচিত 'পৌনর্ভবখণ্ডনম্', (৪) সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্যের মতানুসারে রামচন্দ্র মৈত্র সংগৃহীত 'বিধবোদ্বাহবারকঃ', (৫) মধুসূদন স্মৃতিরত্ন সঙ্কলিত 'বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ', (৬) 'শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ-বিষয়ক ভ্রমসূচক পত্রাবলীর কাশীস্থ পণ্ডিত সম্মত প্রত্যুত্তর', (৭) ধর্মমর্ম সভা হইতে 'বিধবাবিবাহবাদ প্রথম খণ্ড', (৮) রাজা কমলকৃষ্ণ দেববাহাদুরের সভাসদগণ বিরচিত 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের উত্তর', (৯) পীতাম্বর কবিরত্ন বিরচিত 'বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত নহে', (১০) 'বিধবাবিবাহ-নিষেধ বিষয়িণী ব্যবস্থা' (ধর্মসভার প্রত্যুত্তর)। এই ধরনের দু' একখানি পুস্তিকা এখনও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে। তার অধিকাংশেরই যুক্তি হাস্যকর, ভাষা বিকট, রুচি ঘৃণ্য। কেউ কেউ দেবভাষা অবলম্বনে আসুরিক রুচির পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। এঁদের মধ্যে দু' একজনের আলোচনা কিছু কিছু যুক্তিসঙ্গত বটে। এই সমস্ত

প্রতিবাদ-পুস্তিকা সম্বন্ধে বিহারীলাল সরকার বলছেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিষয়িনী পুস্তিকা প্রচারিত হইবার পর তৎপ্রতিবাদে যেসব পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশেই গভীর অকাট্য যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্যের সমাবেশ হইয়াছিল। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তিকা যেরূপ সরল প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত হইয়াছিল এবং তাঁহার যুক্তিখ্যাপন যেরূপ সহজ প্রণালীতে সমাবেশিত হইয়াছিল, এসব পুস্তকে সেরূপ হয় নাই।”[৩০] বিধবাবিবাহবিদ্বেষী বিহারীলালের এ মন্তব্য ঠিক নয়। আমরা উক্ত পুস্তিকার দু'একখানি দেখেছি। এতে নানা সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে নানা বচন উদ্ধৃত হয়েছে বটে, কিন্তু স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারা তার তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় নি। এই পণ্ডিতের দল সংস্কৃতে-লেখা যে-কোন বাক্যকেই শিরোধার্য করেছিলেন এবং নিজ নিজ সংস্কারকে জয়ী করবার জন্য ন্যায়শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করতেও কুণ্ঠিত হন নি। আমাদের দেশে ‘টুলো পাণ্ডিত্য’ (যাকে বিদ্যাসাগর ব্যঙ্গ করে বলতেন ‘টিকিদাস ভট্টাচার্য’), যত গভীর হোক, সাধারণ ব্যাপারে হাস্যকর মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, এই পুস্তিকাগুলি দেখে তাই মনে হয়।

এর পর বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এত সমস্ত কুৎসাপ্রচারক পুস্তিকা প্রচারিত হতে লাগল যে, বাধ্য হয়ে তিনি প্রথম পুস্তিকাপ্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যে আরও যুক্তি সিদ্ধান্তসহ ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব—দ্বিতীয় পুস্তক, প্রকাশ করলেন (১৮৫৫, অক্টোবর)। এটি ‘প্রস্তাব’ নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে একখানি বিশিষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থ—প্রথম প্রস্তাবের চেয়ে অনেক বড়। প্রথম প্রস্তাবে তিনি শুধু পরাশর স্মৃতির শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা ও যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রতিবাদীরা নানা প্রকার হীন অভিযোগ করলে বিদ্যাসাগর বাধ্য হয়ে তাঁর প্রথম

৩০. বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর, পৃ. ২৮৩

পুস্তিকায় প্রকাশিত সিদ্ধান্তকে দ্বিতীয় প্রস্তাবে সবিস্তারে এবং নানা প্রমাণ দিয়ে উপস্থাপিত করলেন।

দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর একই সঙ্গে প্রমাণযুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করলেন এবং প্রতিকূল সমালোচনার অযুক্তি-কুযুক্তির বা যথোপযুক্ত জবাব দিলেন। সমস্ত বিষয়টি তাঁকে আনুপূর্বিক আলোচনা করতে হয়েছে বলে দ্বিতীয় প্রস্তাবের কলেবর বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পুস্তিকার প্রথম মুখবন্ধ হিসেবে বিদ্যাসাগর বলেছেন যে, তাঁর প্রথম পুস্তিকা অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বলে তিনি আনন্দিত হয়েছেন বটে, কিন্তু প্রতিবাদীরা যুক্তি-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে, এমন কি ন্যায়-অন্যায়বোধ ত্যাগ করে তাঁকে আক্রমণ করেছেন, অনুচিত রঙ্গরহস্য করেছেন, এজন্য তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। শাস্ত্র বিচারকালে হাস্যপরিহাস করা ও কুরুচির আশ্রয় নেওয়া সেকেলে সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের মারাত্মক বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ দেশের রক্ষণশীল পণ্ডিতসম্প্রদায় প্রতিবাদের ছলে বিদ্যাসাগরকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করতেই অধিক উৎসাহ বোধ করেছেন। এজন্য বিদ্যাসাগর ক্ষুব্ধচিত্তে লিখেছিলেন, "আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বাদীর প্রতি উপহাসবাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ" (বি. র. ২. পৃ. ১৬৯)। তাঁর পূবে রামমোহনও বেদান্তবিষয়ক পুস্তিকা লিখে এই ধরনের গালিগালাজের সম্মুখীন হয়ে বলেছিলেন, "পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কখন সর্ব্বত্র অযুক্ত হয়।" মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রামমোহনের বেদান্ত বিষয়ক মতের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কোন কোন স্থলে লঘুচিত্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে রামমোহন বলেন, "ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রালাপে দুর্ব্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি, যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না।"[৩১] যাই হোক বিদ্যাসাগর প্রতিবাদকারীদের

৩১. রামমোহনের 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পৃ. ১৫৬-৫৭।

মধ্যে যাঁদের প্রতিবাদে কিছু যুক্তিবিচার ছিল, তাঁদের প্রতিবাদের যথাসাধ্য উত্তর দিয়েছিলেন এবং পরাশর বচনের তাৎপর্য এবং কলি-যুগে তার প্রয়োগের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছিলেন। অনেকে পরাশরের শ্লোকটি বাগ্‌দত্তা সম্পর্কে প্রযোজ্য বলেছিলেন।[৩২] কিন্তু বিদ্যাসাগর 'নারদসংহিতা' (দ্বাদশ বিবাদপদ) থেকে দেখালেন যে, উক্ত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ, বাগ্‌দত্তা নয়। বিবাহিতা কন্যার পুনর্বিবাহের উল্লেখ আছে পরাশর ভাষ্যে। কাত্যায়ন বচনে ('নির্ণয়সিন্ধু'), বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি স্মার্তগণের স্মৃতিগ্রন্থে বলা হয়েছে, স্বামী যদি পতিত, ক্লীব, অনুদ্দেশ, কুলশীলহীন, যথেচ্ছাচারী, চিররোগী, অপস্মাররোগগ্রস্ত, প্রব্রজিত, সগোত্র, দাস, অন্যজাতীয় হয়, অথবা মারা যায়, তা'হলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্বিবাহ চলতে পারে। তারপর বিদ্যাসাগর দেখালেন যে, পরাশর স্মৃতির বচন শুধু কলিযুগেই প্রযোজ্য, অন্য যুগে নয়।[৩৩] কেউ কেউ বললেন,

৩২. পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন পরাশর স্মৃতির বঙ্গানুবাদ করতে গিয়ে 'নষ্টেমৃতের'—এই ধরনের ব্যাখ্যা করেছেন, "যে পাত্রের সহিত এই বিবাহের কথাবার্তা স্থির হইয়া আছে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে ; তবে ঐ ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তবে এই পঞ্চপ্রকার আপদে ঐ কন্যা পাত্রান্তরে প্রদানবিহিত।" এ অনুবাদের যৌক্তিকতা তিনি কোথা থেকে পেলেন, তার উত্তরে তিনি লিখেছেন, "যে অনুবাদ প্রদত্ত হইল, ইহাই বহু-পণ্ডিত সম্মত।" পরাশরের যেখান থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে সেখানে কোথাও বাগদত্তার কোন প্রসঙ্গই নেই। নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করে আমাদের দেশের সংস্কারান্ধ পাণ্ডিত্য এই ভাবেই আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকে। (পঞ্চানন তর্করত্নের পরাশরস্মৃতির অনুবাদের ৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

৩৩. ভট্টোজী দীক্ষিত 'চতুর্বিংশতি স্মৃতি ব্যাখ্যা'-য় ("বিবাহপ্রকরণ") পরিষ্কার করে বলেছেন, "ন চ কলির্নিষিদ্ধস্যাপি যুগান্তরীয় ধর্মস্যৈব নষ্টে মৃতে ইত্যাদি পরাশরং বাক্যং প্রতিপাদকমিতি বাচ্যং কলাবনুষ্ঠেয়ান ধর্মাণেব বক্ষ্যামীতি

পরাশরে বিধবাবিবাহ স্বীকার্য হলেও মনুতে বিধবাবিবাহের কোন উল্লেখ নেই। মনুর সঙ্গে অন্য স্মৃতির বিবাদ বাধলে মনুই গ্রহণযোগ্য, মনুর বিপরীত রীতি প্রশস্ত নয়। সুতরাং পরাশরের বিধানকে মনু-বচনের দ্বারা নাকচ করা যায়। এর উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন, বৃহস্পতি বচনানুসারে মনুস্মৃতি সত্যযুগেই প্রযোজ্য, কলিযুগে নয়। তার প্রমাণ, মনুনির্দিষ্ট অনেক বিধি এখন আমরা আর মানি না। মনু বর-কন্যার বিবাহের যে বয়স বেঁধে দিয়েছেন (বারো বছরের কন্যার সঙ্গে ত্রিশ বছরের বর, এবং আট বছরের কন্যার সঙ্গে চব্বিশ বছরের বরের বিবাহ প্রশস্ত), এখন কেউ কি সে নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মানে? মনু তো ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রের মধ্যে ধনবিভাগের নিয়ম করেছেন। এখন কি, ঔরস ভিন্ন অন্য পুত্র পিতৃধনে অধিকারী হয়? তা ছাড়া পরাশর যে মনুর মতোই প্রমাণসিদ্ধ, সে-কথা মাধবাচার্য অনেক আগেই বলে গেছেন, "তস্মাৎ পরাশরোঽপি মনু সমান এব।" অতএব মনুর মতো পরাশরও মান্য। বশিষ্ঠ, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য—এঁদেরও অনুরূপভাবে মান্য করতে হবে।

এরপর বিদ্যাসাগর প্রমাণ করলেন, বিধবাবিবাহে জাত পুত্রও জনকের শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনের উত্তরাধিকারী। কারণ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য 'পৌনর্ভব' অর্থাৎ বিধবাবিবাহের পুত্রকে উক্ত অধিকার দিয়ে গেছেন, সুতরাং তাঁদের বিধান অমান্য করার কোন কারণ নেই। বস্তুতঃ বিধবাবিবাহ মনুবিরুদ্ধ নয়। তবে তাঁর যুগে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীকে 'পুনর্ভূ' এবং তার গর্ভজাত সন্তানকে 'পৌনর্ভব' বলা হত। অন্যান্য পুত্রদের তুলনায় পৌনর্ভব' পুত্র মনুর যুগে একটু অপাংক্তেয় হয়ে থাকত। কিন্তু পরাশর কোনও স্থলে পৌনর্ভবের উল্লেখ করেন নি,

---

প্রতিজ্ঞায় তদ্‌গ্রন্থ প্রণয়নাৎ।" অর্থাৎ 'নষ্টে মৃতে এই পরাশর বচন দ্বারা কলিনিষিদ্ধ যুগান্তরীয় ধর্মেরই বিধান হইয়াছে, একথা বলা যাইতে পারে না; কারণ, কলিযুগের অনুষ্ঠেয় ধর্মই বলিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরাশরসংহিতার সঙ্কলন করা হইয়াছে।' (বি. র. ২, পৃ. ১৮৯)

বা দ্বিতীয় বার পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে অন্ত সন্তানদের তুলনায় নিকৃষ্ট বলেন নি। সুতরাং কলিযুগে স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহজাত সন্তানকে নিশ্চয়ই ঔরসপুত্র বলা হবে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে (৯১ অধ্যায়) দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং অর্জুন ঐরাবত নামক এক নাগরাজের বিধবাকন্যাকে বিবাহ করেন। অর্জুন ও ঐ কন্যার সন্তানের নাম ইরাবান, তাকেও ঔরসপুত্র বলা হয়েছে।[৩৪]

এর পর প্রতিবাদীদের প্রত্যুত্তর দেবার জন্য বিত্তাসাগর দেখালেন, পরাশরের বিধবাবিবাহবিধান বেদবিধিবিরুদ্ধ নয়। মহাভারত বেদ-বিধি উল্লেখ করে বলেছেন, "সহেতি যুগপদ্বহুপতিত্বনিষেধো বিহিতো ন তু সময়ভেদেন।" অর্থাৎ বেদে একই সময়ে এক স্ত্রীর একাধিক পতি নিষিদ্ধ হয়েছে, নতুবা সময়ভেদে বহুপতিবিবাহ দোষাবহ নয়। আসল কথা বিধবাবিবাহ কখনই বেদবিরোধী ছিল না, থাকলে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে-বিধবাবিবাহ হতে পারত না।

অতঃপর বিত্তাসাগর তাঁর ওপরে আরোপিত গুরুতর অভিযোগের জবাব দিলেন। বিধবাবিবাহবিষয়ক যে সমস্ত শ্লোক তিনি পরাশরস্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন, কেউ কেউ অভিযোগ করলেন ঐ শ্লোকগুলি যথার্থ পরাশরে নেই। কেউ কেউ বললেন, উক্ত বচন পরাশরের নয়, "ভারতবর্ষের দুরবস্থাকালে হিন্দুরাজাদিগের ইচ্ছানুসারে, ঐ কৃত্রিম বচন সংহিতামধ্যে নিবেশিত হইয়াছে।"[৩৫] এই সব হাস্যকর যুক্তি কখনও প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। মাধবাচার্য যখন পরাশরধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন, তখন শ্লোকগুলি যে পূর্ব থেকেই পরাশরে

৩৪. মাধবাচার্য পরাশরভাষ্যে 'নষ্টে মৃতে' শ্লোকটিকে মনুর বলেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে পরাশর মনুর শ্লোক নিজের মতানুকূল দেখে নিজের স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত করেন। (বি. র. ২. পৃ ২১০)

৩৫. ভবানীপুর নিবাসী প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় বিত্তাসাগরের মতের প্রতিবাদ করতে গিয়ে এই উৎকট অনুমানের সাহায্য নিয়েছিলেন। (বি. র. ২. ২১৭)

ছিল, পরে প্রক্ষিপ্ত হয় নি বা হিন্দুরাজাদের নির্দেশে অনুপ্রবিষ্ট হয় নি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর নিজের মতের বিপরীত হলেই যদি সবকিছুকে কৃত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত বলতে হয়, তা হলে "লোকের মত এত ভিন্ন ভিন্ন যে, প্রায় সকল বচনই ক্রমে ক্রমে কৃত্রিম হইয়া উঠিবেক।"

(বি. র. ২. পৃ. ২২১)

কালিদাস মৈত্র ('পৌনর্ভবখণ্ডনম্') উক্ত শ্লোকের এক বিচিত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, মূল শ্লোকের নাকি 'পতিরন্যোঽ-বিধীয়তে'—অর্থাৎ অন্যপতি বিবাহ অবিধি, এই আকার ছিল। কালিদাস মৈত্র বিদ্যাসাগরকে অপদস্থ করতে গিয়ে, সামান্য কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে কুযুক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন। কারণ নারদ-সংহিতায় স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, স্বামী মারা গেলে, বা তার খোঁজ না পেলে ব্রাহ্মণ জাতীয়া স্ত্রী আট বৎসর অপেক্ষার পর বিবাহ করতে পারে, নিঃসন্তানা হলে চার বৎসর অপেক্ষা করলেই চলবে। ক্ষত্রিয় জাতীয়া স্ত্রী ছ'বৎসর অপেক্ষা করে তার পর পুনর্বিবাহ করতে পারে, নিঃসন্তানা হলে তিনবৎসর। বৈশ্য জাতীয়া স্ত্রী সন্তান থাকলে বারো বৎসর, না থাকলে ছ'বৎসর এবং শূদ্র জাতীয়া স্ত্রীর কোন প্রতীক্ষা-কাল নেই। সুতরাং 'পতিরন্যোবিধীয়তে' এর মাঝখানে কোথাও নিষেধার্থক নঙ্ নেই।

কেউ কেউ[৩৬] বলেছেন যে, পরাশর সংহিতা শুধু কলিযুগে নয়, অন্য-যুগেও প্রযোজ্য।[৩৭] তার উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন, কলিযুগের

৩৬. পীতাম্বর সেন কবিরত্ন এই প্রশ্ন তোলেন, "হ্যাঁ গো মহাশয়, আপনি কি পরাশর সংহিতা আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিয়াছেন, না কেবল অনিষ্ট বিষয়েই সচেষ্ট? শিষ্ট সমাজে বিশিষ্ট গণ্য হইতে কি অনিষ্টে নিবিষ্টই উৎকৃষ্ট লক্ষণ? পরাশর কেবল কলিধর্ম বক্তা এমত স্থির করিবেন না, অন্য যুগধর্মও লিখিয়াছেন।" (বি. র. ২. পৃ. ২৬২)

৩৭. এ রকম বলার অর্থ, "যদি ইহা স্থির হয় যে, পরাশর সংহিতাতে অন্যান্য যুগেরও ধর্ম নিরূপিত আছে, তাহা হইলে, পরাশর বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীদিগের

জন্যই যখন পরাশর স্মৃতির নির্দেশ রয়েছে, তখন অন্য যুগ সম্বন্ধে কোনও কথা ওঠাই নিরর্থক। এইভাবে তিনি প্রতিবাদীদের সমস্ত যুক্তিতর্ক অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে খণ্ডন করেন। এর পরেও অনেকে বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত অনেক সমস্যার কথা তুলেছিলেন। যেমন— বিধবাবিবাহে কে কন্যা সম্প্রদান করবে। পিতা তো প্রথমবার কন্যা দান করে নিঃস্বত্ব হয়েছেন। সুতরাং তিনি আবার কি করে কন্যা দান করবেন? তারপর প্রশ্ন হল, বিধবাবিবাহে কন্যার কোন্ গোত্র উল্লেখ করতে হবে, কারণ প্রথম বিবাহে তো কন্যা গোত্রান্তরিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার বিবাহে কি প্রথমবারের মন্ত্রই পঠিত হবে? এই তুচ্ছ বিষয়গুলিকেও বিদ্যাসাগর অতি নিপুণতার সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিপক্ষের হাস্যকর শিরঃপীড়ার যথাসম্ভব আরাম করার চেষ্টা করেছিলেন। সর্বশেষে কেউ কেউ এই ভাবে নতুন আপত্তি উত্থাপন করেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হলেও লোকাচার বা শিষ্টাচারসঙ্গত নয় বলে পরিহর্তব্য। এর উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাভারতের অনুশাসন পর্ব থেকে এই শ্লোকটি উল্লেখ করলেন :

ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।
দ্বিতীয়ং ধর্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ॥

যাঁরা ধর্মের স্বরূপ জানতে চান, বেদ তাঁদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, ধর্মশাস্ত্রের স্থান দ্বিতীয়, লোকসংগ্রহ অর্থাৎ লোকাচারের স্থান সর্বনিম্নে। সুতরাং শিষ্ট ও শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিষয়ে লোকাচারকেই পরিত্যাগ করতে হবে। অতএব পরাশর স্মৃতিশাস্ত্রে যখন কলিযুগে বিধবাবিবাহের বিধিব্যবস্থা রয়েছে। তখন দেশাচারের দাস হয়ে বিধবাদের প্রতি নির্মম হওয়া যেমন যুক্তিহীন, তেমনই হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। কিন্তু মূঢ় দেশে কে শাস্ত্রসংহিতার ধার ধারে? পণ্ডিতেও মূর্খের মতো

পুনর্বার বিবাহের যে বিধি দিয়াছেন, তাহা কলিযুগের ধর্ম না হইয়া অন্যান্য যুগের ধর্ম হইবেক।" (বি. র. ২. পৃ. ২৪১)

আচরণ করে। সাধারণের মতোই তারা ভ্রান্ত দেশাচারের অনুবর্তন করে। আর তা ছাড়া দিনে দিনে দেশাচারের পরিবর্তন হয়। পূর্বে কোন শূদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসলে তার গুরুতর শাস্তি হত। কিন্তু কলিযুগে শুধু একাসনে নয়, শূদ্র অনেক সময়ে ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক উচ্চাসনেও বসে থাকে। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের এজলাসে অনেক শাণ্ডিল্য-ভরদ্বাজের বংশাবতংশকেও জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। রাজবল্লভের আগে বৈদ্যগণ উপবীত গ্রহণ করতেন না, তাঁর পর থেকে এঁরা উপবীত ধারণ করে আসছেন। কে তাঁদের নিষেধ করছে, বা গলদেশ থেকে সূত্রখণ্ড ছিঁড়ে নিচ্ছে? কাজেই কালে কালে কত আচারবিচার পরিবর্তিত হয়। কিন্তু যারা সে সমস্ত পরিবর্তনের সংবাদ না রেখে শুধু সমকালীন দেশাচারের অনুবর্তন করে, বিদ্যাসাগর তাদের কৃপার দৃষ্টিতে দেখেছেন। বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার দ্বারা পরাশরধৃত শ্লোককে প্রামাণিক ও গ্রহণযোগ্য বলে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু তিনি জানতেন, বাংলাদেশ দেশাচারের দাস, স্বাধীন বুদ্ধি এ জাতির সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে। তাই উপসংহারে সক্ষোভে তিনি বলেছেন :

> "হায় কি আক্ষেপের বিষয়! দেশাচারই এদেশের অদ্বিতীয় শাসনকর্তা, দেশাচারই এদেশের পরমগুরু; দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন, দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ।" (ঐ, পৃ. ৩০৩)

কেউ কেউ বলেছেন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে ধর্ম লোপ হবে। তার উত্তরে বিদ্যাসাগর ধিক্কার দিয়ে বলেছেন :

> "হা ধর্ম, তোমার মর্ম বুঝা ভার! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ পায়, তা তুমিই জান!" (ঐ, পৃ. ৩৩)

বিদ্যাসাগর শাস্ত্র, যুক্তি, বাস্তবজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োগ করে বিধবাবিবাহের বৈধতা প্রমাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এর পূর্বে রামমোহনও সহমরণনিষেধক প্রস্তাবে এই জাতীয় যুক্তিবুদ্ধির পরিচয়

দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, যুক্তির দ্বারা তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ; কিন্তু আসলে তিনি আবেগের দ্বারা মানবপ্রেমের বশীভূত হয়ে বিধবাদের দুঃখমোচনে অগ্রসর হয়েছিলেন। অবশ্য বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হলে সমাজে ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যাপাপ বাড়বে, বিদ্যাসাগর সামাজিক ও নৈতিক পাপ সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন, গোপনে অনুষ্ঠিত এই সমস্ত মহাপাপ থেকে বিধবাদের ও সমাজকে বাঁচাতে হলে বিধবাবিবাহের আশু প্রয়োজনীয়তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। অত্যন্ত কঠোর বাস্তব-বাদীর মতো তিনি বিধবা নারীর বাসনা-কামনা ও তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, অনেক বিধবা সদ্‌জীবন যাপনে সমর্থ হলেও, এমন কেউ কেউ থাকতে পারে যার পক্ষে হয়তো দেহজ কামনাকে বশীভূত করা সম্ভব হয় না। সমাজনেতারা মনে করেন, বিধবা হলেই স্ত্রীলোকের আর সুখদুঃখবোধ থাকে না, বাসনা-কামনার উত্তাপও মুছে যায়। কিন্তু একথা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। তাই তিনি বাস্তব সমস্যাকে বৃথা আদর্শের শান্তিজল ছিটিয়ে কৃত্রিমভাবে বিশুদ্ধ করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না, বরং মুক্ত কণ্ঠে বললেন, "তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায় ; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না ; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না ; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়।" এখানে বিদ্যাসাগর নারীর দেহ ও মনের স্বাভাবিক বৃত্তিকে বাস্তব সত্য বলেই স্বীকার করেছেন, তাকে ব্রহ্মচর্য, সংযম প্রভৃতি মিষ্ট বাক্যে চাপা দেবার চেষ্টা করেন নি। তিনি শাস্ত্র মন্থন করলেন, যুক্তিশাস্ত্রের তূণ থেকে তীক্ষ্ণ শর বার করে প্রতিপক্ষের অক্ষম যুক্তির ওপর নিক্ষেপ করলেন, সকলের মনে হতভাগিনী বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি জাগাতে চাইলেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে বড় দুঃখবেদনায় ভারতের দুঃখিনী নারীদের সম্বোধন করে এই কথা ক'টি বলে উপসংহার করেছেন : "হা অবলাগণ, তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।" বাংলা

সাহিত্যে আদর্শ বিতর্ক-সাহিত্য হিসেবে বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'-এর দু'খানি পুস্তিকাই চিরদিন স্বীকৃতি লাভ করবে। যুক্তি-বুদ্ধির সঙ্গে উদার হৃদয়, সংস্কার-বর্জিত মানবপ্রেমের সঙ্গে উচ্চতর নীতির এমন সুষ্ঠু সমন্বয় ইদানীং কোন গ্রন্থে দেখা যায় না।

৪.

বিধবাবিবাহের প্রচারের দরুণ বিদ্যাসাগরের মানসিক ক্ষতচিহ্ন তখনও লুপ্ত হয় নি। সেই সময়েই তিনি সামাজিক কুসংস্কারের দ্বিতীয় দৈত্য বহুবিবাহপ্রথাকে আক্রমণ করে দু'খানি প্রচারপুস্তক লিখলেন। সে পুস্তকগুলি কিন্তু নিছক প্রচারপুস্তক নয়—আশু-প্রয়োজন মিটিয়েই যা লুপ্ত হয়ে যায়। আজ শতবর্ষ পরে সেই পুস্তক দু'খানি পড়তে বসলে এখনও পাঠক তার মধ্যে দুশ্ছেদ্য যুক্তিজালের সমারোহ দেখে বিস্মিত হবেন, সরস চিত্তের স্পর্শ পেয়ে প্রসন্ন হবেন, উদার হৃদয়ের আমন্ত্রণে উল্লসিত বোধ করবেন এবং নারীসমাজের পরিত্রাতা বলে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

পুস্তিকা দু'খানির পরিচয় নেবার আগে বহুবিবাহ-সংক্রান্ত সামাজিক 'ইনস্টিট্যুশনের'র সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। বাংলা দেশের ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণদের মধ্যে একদা বহুপ্রচলিত কৌলীন্যপ্রথা থেকে সমাজে 'অধিবেদন প্রথা'[৩৮] অর্থাৎ পুরুষের এক স্ত্রী বর্তমানে একাধিক বিবাহপ্রথার উৎপত্তি হয়েছিল। পুরুষের অধিবেদন থেকে উৎপন্ন কুপ্রথায় বহু স্ত্রীলোককে বৈধব্যযন্ত্রণার চেয়েও কষ্ট পেতে হত।[৩৯]

---

৩৮. "পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহের নাম অধিবেদন।" দেবকুমার বসু সম্পাদিত বিদ্যাসাগররচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৩ (অন্য নির্দেশ না থাকলে পৃষ্ঠাসংখ্যা এই খণ্ডকেই নির্দেশ করবে।)

৩৯. ১৮৬৩ সালে দুর্গাচরণ নন্দী প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি ভারত সরকারের কাছে বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে যে আবেদন করেছিলেন তাতে একথা স্বীকার

কুলজীশাস্ত্র এবং লোকশ্রুতি অনুসারে দেখা যায় বাংলা দেশের রাজা আদিশূর (ইতিহাসে এঁর কোন উল্লেখ নেই) ৯৯৯ শকে [৪০] আচারবান সদ্ব্রাহ্মণের অভাব দূর করবার জন্য কান্যকুব্জ থেকে বৈদিক ক্রিয়াকর্মে পারদর্শী পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনান।[৪১] রাজার অনুরোধে তাঁরা এদেশে থেকে যান এবং স্থানীয় কন্যা বিবাহ করেন। এঁদের মোট ৫৬ জন পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয়। রাজা এই ৫৬ জনকে ৫৬টি পৃথক গ্রাম দান করেন। সেই গ্রামের নামানুসারে এই ব্রাহ্মণদের ছাপ্পান্ন গাঁইয়ের সৃষ্টি হয়। কান্যকুব্জ থেকে পঞ্চব্রাহ্মণ আসবার আগে স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পরিবারের সংখ্যা ছিল সাত শ'। আচারে-আচরণে তাঁরা কিছু অনভিজ্ঞ ছিলেন বলে অতঃপর তাঁরা 'সপ্তশতী' ব্রাহ্মণ নামে সমাজে হীন হয়ে পড়লেন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বহিরাগত পঞ্চ-ব্রাহ্মণদের পঞ্চগোত্রের (শাণ্ডিল্য কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, বাৎস্য, সাবর্ণ্য) বহির্ভূত ছিলেন। এঁরা সংস্কার-বর্জিত ব্রাত্য ধরনের ছিলেন বলে পঞ্চগোত্রজাত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এঁদের আহারাদি বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক আদানপ্রদান প্রচলিত ছিল না। পঞ্চগোত্রোদ্ভূত কেউ এঁদের সঙ্গে সামাজিক ব্যবহার করলে

করেছিলেন যে "An usage (অর্থাৎ বহুবিবাহ প্রথা) which has destroyed the domestic happiness of Hindoo Women to a far greater extent than the doom of perpetual widowhood." (বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৭)

৪০. 'কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র'-এর "আদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতীশতাব্দে পঞ্চ-ব্রাহ্মণানানয়মাস"—এই পংক্তি থেকে জানা যাচ্ছে, আদিশূর ৯৯৯ শকে অর্থাৎ ১০৭৭ খ্রীস্টাব্দে কান্যকুব্জরাজের কাছ থেকে আদিশূর পঞ্চ-ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। (দ্রষ্টব্য: চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭-১৮)

৪১. এই পঞ্চ-ব্রাহ্মণ পঞ্চগোত্রভুক্ত—শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ-গোত্রীয় দক্ষ, বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড়, সাবর্ণ্যগোত্রীয় বেদগর্ভ এবং ভরদ্বাজগোত্রীয়

তাঁরাও 'পতিত' হতেন। কুলজী গ্রন্থ মতে শূর বংশের পর সেনবংশ বাংলার রাজা হন। ইতিমধ্যে পঞ্চগোত্রের বাহ্মণদের শীল-সাদাচারও ক্ষুণ্ণ হতে আরম্ভ করে। তখন বল্লালসেন ব্রাহ্মণদের বিশুদ্ধি বজায় রাখবার জন্য ন'টি গুণ নির্দেশ করলেন :

> আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
> নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥
> আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থপর্যটন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি (অর্থাৎ বৈবাহিক আদান-প্রদান), তপস্যা ও দান—এই ন'টি হল কুললক্ষণ।

যে-সব ব্রাহ্মণ এই গুণগুলির পুরোপুরি অনুশীলন করবেন, তাঁরাই সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণ বলে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হবেন। পূর্বোল্লিখিত ছাপ্পান্ন গাঁইয়ের মধ্যে আটটি গাঁই হলেন—বন্দ্য, চট্ট, মুখুটি, ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল, কুন্দগ্রামী। এঁরা কুলীনের সবগুণের পূর্ণ অধিকারী। আর চৌত্রিশ গাঁইয়ের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণেরা, যাঁরা একটি গুণ থেকে বঞ্চিত হয়ে আটটি গুণের অধিকারী হলেন, তাঁরা কৌলীন্যের মর্যাদা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে 'শ্রোত্রিয়' নামে পরিচিত হলেন। অবশিষ্ট চৌদ্দ গাঁইয়ের ব্রাহ্মণেরা, বিশেষভাবে আচারভ্রষ্ট হয়েছিলেন বলে 'গৌণ কুলীন' বলে সমাজে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হলেন। বল্লালসেন কুলবিশুদ্ধি ও শ্রেণীবিশুদ্ধি বজায় রাখবার জন্য এই নিয়ম করে দিলেন যে, কুলীনেরা কুলনীদের সঙ্গে বৈবাহিক আদানপ্রদান করতে পারবেন। শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করলেও তাঁদের দোষ হবে না। কিন্তু শ্রোত্রিয়ের ঘরে কন্যা দান করলে কুলভ্রষ্ট হয়ে কুলীন ব্রাহ্মণ 'বংশজ' বলে নিম্নপর্যায়ে নেমে যাবেন। কুলীনেরা গৌণ-কুলীনের কন্যা গ্রহণ করলে কুললক্ষণ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হবেন। গৌণ কুলীনেরা তাই "অরয়ঃ কুলনাশকাঃ' (কুলরামের কুলজীগ্রন্থ) অর্থাৎ কৌলীন্যের শত্রু বলে নিন্দিত হয়েছেন। তা হলে মর্যাদা অনুসারে সেকালের বাঙালী ব্রাহ্মণসমাজকে পাঁচ 'থাকে' বিন্যস্ত করা যায় :

১. কুলীন, ২. শ্রোত্রিয়, ৩. বংশজ, ৪. গৌণকুলীন, ৫. গোত্রহীন সপ্তশতী (যাঁরা এদেশের আদিব্রাহ্মণ)।
বল্লালসেনের কয়েক শ' বছর পরে দেবীবর ঘটক আবার নতুন করে ব্রাহ্মণশ্রেণীর বিন্যাসব্যবস্থা করেন। বল্লালসেন ব্রাহ্মণদের কুলমর্যাদা-জ্ঞাপক যে ন'টি গুণ নির্দেশ করেছিলেন, কালক্রমে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে শুধু বৈবাহিক আদানপ্রদান ('আবৃত্তি') ভিন্ন, আর সমস্ত গুণ লুপ্ত হয়ে যায়। বল্লাল গুণ দেখে কুলীন ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিন্যাস করেছিলেন। কিন্তু কয়েক শ' বছর পরে কুলীন ব্রাহ্মণদের সমস্ত গুণ বিনষ্ট হলে দেবীবর ঘটক দোষ অনুসারে ব্রাহ্মণসমাজকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করলেন। এই বিন্যাসের নাম 'মেল' বা 'মেলবন্ধন'—অর্থাৎ দোষ অনুসারে ব্রাহ্মণদের শ্রেণীবিভাগ। এই মেলের সংখ্যা ছত্রিশ। এঁদের মধ্যে ফুলিয়া মেল ও খড়দহ মেল সমাজে প্রাধান্য লাভ করে এবং প্রধান কুলীন বলে পরিগণিত হয়। দেবীবর ব্রাহ্মণদের কুলবিশুদ্ধি বজায় রাখবার জন্য বিবাহের ব্যবস্থা সঙ্কুচিত করে আনেন। বল্লালী কৌলীন্য অনুসারে আট গাঁইয়ের মধ্যে যথেচ্ছা বিবাহ হতে পারত। তাকে বলে 'সর্বদ্বারী বিবাহ'।[৪২] এ-মত অনেকটা উদার। এর ফলে অন্ততঃ কুলীনদের মধ্যে বিবাহ ব্যাপারে কোন বাধা বা নিষেধ ছিল না। ফলে কুলরক্ষার জন্য একজনকে একাধিক কন্যা বিবাহ করার প্রয়োজন হত না; কিন্তু দেবীবরের আঁটা-আঁটিপূর্ণ মেলবন্ধনের জন্য

---

৪২. "মেলবন্ধনের পূর্বে, কুলীনদিগের আটঘরে পরস্পর আদানপ্রদান প্রচলিত ছিল। ইহাকে সর্বদ্বারী বিবাহ কহিত। তৎকালে, আদনপ্রদানের কিছুমাত্র অসুবিধা ছিল না। এক ব্যক্তির অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার আবশ্যকতা ঘটিত না, এবং কোনও কুলীনকন্যাকেই, যাবজ্জীবন, অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন করিতে হইত না। এক্ষণে (অর্থাৎ দেবীবরের সময়ে), অল্প ঘরে মেলবন্ধন হওয়াতে, কাল্পনিক কুলরক্ষার জন্য, একপাত্রে অনেক কন্যার দান অপরিহার্য হইয়া উঠিল। এইরূপে, দেবীবরের কুলীনদিগের মধ্যে বহুবিবাহের সূত্রপাত হইল।" (বিদ্যাসাগর, ৪র্থ, পৃঃ ২৬)

বিবাহের আদানপ্রদান অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল, স্বাধীনতা নষ্ট হল, 'ঘটক-কারিকা' হল বিবাহ-নির্ধারণের একমাত্র ম্যানুয়াল। তাই কাল্পনিক কুলবিধি (কাল্পনিক, কারণ দেবীবরের অনেক আগেই কুলীনদের কুলবিশুদ্ধি ক্ষুণ্ণ এবং বিপর্যস্ত হয়েছিল) বজায় রাখার জন্য, বিশেষ চিহ্নিত কুলের পাত্রে একাধিক কন্যাদান প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বস্তুতঃ বহুবিবাহের পাতকজনিত অপরাধে দেবীবরই একমাত্র অপরাধী।[৪৩] তিনি কুলীনদের মেলবন্ধন করে পারস্পরিক আদান-প্রদানের স্বাভাবিক ও স্বাধীন পথ রুদ্ধ করে দেন। ফলে তথাকথিত সৎকুলজাত পাত্রের হাতে কন্যা সমর্পণ করার জন্য কন্যার পিতারা লালায়িত হয়ে নিজ নিজ কন্যাদের এক পাত্রে অর্পণ করতেন। এর চেয়ে বল্লালী 'সর্বদ্বারী' বিবাহপ্রথা [৪৪] অনেক ভালো ছিল। ক্রমে ক্রমে কুলপ্রথা ব্রাহ্মণসমাজে বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়াল। কুল-রক্ষার জন্য কন্যার পিতা আকুল হয়ে পালটী ঘরের সন্ধান করতেন, পালটী ঘর না পেলে কন্যাকে সারাজীবন অবিবাহিত রাখতেন, তবু কুলক্ষয় করতেন না। ফলে নারীসমাজে দুর্গতি ও দুর্নীতি দেখা দিল। উপরন্তু কুলগর্বিত ব্যক্তিরা মহানন্দে একাধিক (শতাধিকও হতে পারে) কন্যার পাণিপীড়ন করতেন, ক্রমে অপদার্থ কুব্রাহ্মণেরা কুলরক্ষার

৪৩. অবশ্য বিদ্যাসাগর এজন্য বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটককেই নিন্দা করে লিখেছিলেন, "যদি ধর্ম থাকেন, রাজা বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটক বিশারদ, নিঃসন্দেহে নরকগামী হইয়াছেন।" (৪র্থ, পৃঃ ৩৬)

৪৪. সর্বদ্বারী বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের অভিমত : "এ অবস্থায় বোধ হয়, পুনরায় সর্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, কুলীনদিগের পরিত্রাণের আর পথ নাই। এই পথ অবলম্বন করিলে, কোনও কুলীনের, অকারণে, একাধিক বিবাহের আবশ্যকতা থাকিবে না; কোন কুলীনকন্যাকে, যাবজ্জীবন বা দীর্ঘকাল, অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া, পিতাকে নরকগামী করিতে হইবেক না, এবং রাজনিয়ম দ্বারা বহুবিবাহ প্রথা নিবারিত হইলে কোনও ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটিবেক না।" (৪র্থ, পৃঃ ২৯)

নামে প্রচুর টাকা নিয়ে বিবাহ শুরু করে দিলেন। বিবাহ হয়ে পড়ল উপার্জনের সুলভতম পন্থা। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে এই কুপ্রথার দিকে কারও কারও দৃষ্টি পড়েছিল এবং বিদ্যাসাগরের পূর্বেও বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজে এর বিরুদ্ধে কিছু কিছু লেখালেখি চলেছিল। কিন্তু তখনও তা আন্দোলনে পরিণত হয় নি। বিদ্যাসাগর, নারীর কল্যাণকামনায়, দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত করলেন।

বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় আলোচনা হয়। ১৭৬৪ শকাব্দের (১৮৪২ খ্রীঃ অঃ) আষাঢ় মাসে অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় 'বিদ্যাদর্শনে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদকদ্বয় নানা বিষয়ের সঙ্গে "দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির" চেষ্টা করেছিলেন। বলা বাহুল্য এ ব্যাপারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। এই পত্রিকার ২য় সংখ্যায় (১৮৪২—জুলাই-আগস্ট, ১৭৬৪ শকের শ্রাবণ) কুলীনদের সম্বোধন করে কৌলীন্য ও বহুবিবাহপ্রথা রহিত করার জন্য আবেদন করা হয়। এর পরের সংখ্যায় (ভাদ্র) একটি চিঠিতে এই প্রথার কুফল আলোচিত হয়েছে এবং 'অধিবেদন' (বহুবিবাহ) নামে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয় যে, কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ দূর করবার জন্য আইন তৈরি ও প্রযুক্ত হওয়া কর্তব্য। খুব সম্ভব সম্পাদকীয় স্তম্ভটি বিদ্যাসাগরের অনুরাগী অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছিলেন। এর পর সে যুগের বিখ্যাত ব্যক্তি ও সমাজসেবী কিশোরীচাঁদ মিত্র এ বিষয়ে কিছুটা সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর কাশীপুরের বাড়ীতে 'সমাজোন্নতি-বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও কিশোরীচাঁদ মিত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এই সভার পক্ষ থেকে ১৮৫৫ সালের গোড়ার দিকে বহুবিবাহ প্রথা নিরোধের অভিলাষে আইন তৈরির

জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কিশোরীচাঁদ আবেদন করেন।[৪৫] এ ব্যাপারে বোধ হয় অক্ষয়কুমারই উদ্যোগী হয়ে কিশোরীচাঁদকে প্রবর্ত্তিত করেন।[৪৬] এই মাসেরই শেষের দিকে (২৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৫) বিদ্যাসাগর ভারত সরকারের কাছে ঐ একই সর্ভে আবেদন করেন। এর মাত্র দু'মাস আগে (৪ঠা অক্টোবর, ১৮৫৫) তিনি বিধবাবিবাহ আইনের জন্য সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ নিবর্তন—এই দুই ব্যাপারেই বিদ্যাসাগর একসঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন। সামাজিক কুসংস্কার যে প্রথম থেকেই বিদ্যাসাগরকে অভিভূত করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রবর্তিত করেছিল তা এ ঘটনা থেকে জানা যায়।

বিদ্যাসাগরের অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন অগ্রজের জীবনীতে ('বিদ্যাসাগর জীবনচরিত')[৪৭] বলেছেন যে, সন ১২৬৯ সালের কার্তিক মাসে (১৮৬২) বিদ্যাসাগর যখন বীরসিংহে ছিলেন, তখন তাঁর বাল্যশিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের (ইনি কুলীন এবং একাধিক বিবাহ করেছিলেন) প্রথমা স্ত্রী ও কন্যা অন্নাভাবে বিদ্যাসাগরের কাছে এসে নিজেদের দুঃখের কথা জানান। অতঃপর বিদ্যাসাগরের মধ্যস্থতায় কালীকান্ত তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে কিছুকাল ভরণপোষণ করেন, তারপর তাও পরিত্যাগ করেন। এজন্য বিদ্যাসাগর তাঁর পরম শ্রদ্ধাস্পদ

৪৫. মন্মথনাথ ঘোষ—কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৩৩৩), পৃঃ ১০০-১০৮

৪৬. এর বিরুদ্ধেও আবেদন প্রেরিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ নিষেধক গ্রন্থের (প্রথম খণ্ড) 'বিজ্ঞাপনে' তার উল্লেখ করেছেন—"বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য, তাহা রহিত হইলে, হিন্দুদিগের ধর্ম্মলোপ হইবেক; অতএব, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে, এই মর্ম্মে, প্রতিকূল পক্ষ হইতেও এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল।"

৪৭. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, পৃঃ ১৪৩ (নতুন সংস্করণ)

বাল্যশিক্ষকের প্রতি কিছু রুষ্ট হয়েছিলেন এবং কিছুকালের জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও বিসর্জন দিয়েছিলেন।[৪৮] কুলীন স্ত্রীদের এই দুরবস্থা দেখে তিনি নাকি তারপর (অর্থাৎ ১৮৬১ সালের পর) এ বিষয়ে তথ্যসন্ধান করতে প্রবৃত্ত হন ও অনেককে এ বিষয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। বহুবিবাহনিরোধক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি এই ঘটনাটির সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন (বি. র. ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭-৩৯)। সুতরাং মনে হয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী-কন্যার দুরবস্থা দর্শনে বিচলিত হয়ে তিনি এই কুপ্রথা বিদূরণে অগ্রসর হন। অবশ্য তার পূর্বেও তিনি এ ব্যাপারের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের প্রথম আবেদনে বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরের মহারাজা এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। এর সঙ্গে আরও ১২৭ খানি আবেদনপত্র (আর একখানি আবেদনপত্র বারাণসী থেকে ভারত সরকারের কাছে প্রেরিত) কয়েক হাজার লোকের স্বাক্ষরসহ বাংলা সরকারের কাছে প্রেরিত হয়। ১৮৫৭ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারি জে. পি. গ্র্যাণ্ট (ভারত সরকারের সদস্য) ও রমাপ্রসাদ রায়ের (রামমোহনের পুত্র) যুগ্ম প্রচেষ্টায় বহুবিবাহ নিরোধের জন্য একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত হয়। কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের জন্য বিব্রত সরকার বহুবিবাহনিষেধক কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে সাহস করেন নি।[৪৯] এর

৪৮. এবিষয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর স্বরচিত জীবনচরিতে লিখেছেন: "আমি তাঁহাকে (অর্থাৎ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে) অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহার দেহাত্যয়ের কিছুদিন পূর্ব্বে একবার মাত্র, তাঁহার উপর আমার ভক্তি বিচলিত হইয়াছিল।" (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭০)

৪৯. বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত সরকারী আচরণ সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, "বিধবাবিবাহের বৈধতাসম্পাদক আইন তাঁহারা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার কথা স্বতন্ত্র। কারণ বিধবাবিবাহের কোনও জবরদস্তি নাই, কেবল অনুমতি দেওয়া মাত্র (Permissive--not coercive)। আইন

পর ১৮৬৩ সালে অক্টোবর মাসে দুর্গাচরণ নন্দী, ভগবতীচরণ নন্দী এবং আরও প্রায় ১৬০০ স্বাক্ষরকারী বাংলা দেশ থেকে ভারত সরকারের কাছে বহুবিবাহ নিবারণের আইন প্রণয়নের জন্য আবেদন-পত্র পাঠান। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। এর পর বারাণসীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ উৎসাহী হয়ে বড়লাট এলগিনের কাছে এই মর্মে একটি বিল পেশ করেন—"To regulate the plurality of marriages between Hindoos in British India." তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন; সময় সুযোগ পেলে এই বিল উত্থাপনে তিনি নিশ্চয় কৃতকার্য হতেন। কিন্তু তাঁর সদস্যের টার্ম্ ফুরিয়ে যাওয়ায় এ বিলের বিষয়ে আর কিছু শোনা যায় না। তারপর ১৮৬৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি শেষবার বহু লোকের স্বাক্ষর সহ ছোট লাট সিসিল বিডনের কাছে আবেদনপত্র পাঠান হয়। বিডন কয়েকদিন পরে স্বাক্ষরকারীদের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা সত্যনারায়ণ ঘোষাল, সারদাপ্রসাদ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, দেবেন্দ্র মল্লিক, দুর্গাচরণ লাহা, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্যামাচরণ সরকার, দ্বারকা-নাথ মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, কৃষ্ণদাস পাল, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, বিদ্যাসাগর এবং আরও অনেকে। আবেদনপত্র পাঠ করেন রাজা সত্যনারায়ণ ঘোষাল। বিডন এই আবেদনে সাড়া দেন এবং বলেন, এবিষয়ে তিনি যথাসাধ্য করবেন। বিডন তাঁর কথা রেখেছিলেন।

বিধবাকে বলিতেছে—'ইচ্ছা হয়, বিবাহ কর; না হয় না কর; কিন্তু যদি কর, তোমার সন্তান আইনমতে জারজ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।' পক্ষান্তরে বহুবিবাহ নিষেধ করিতে গেলে জবরদস্তি করা হয়; এই জবরদস্তি করিতে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের ভরসা হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে, বিধবাবিবাহের আইন সিপাহীবিদ্রোহের অন্যতম কারণ। সুতরাং এরূপ আইন বিষয়ে ইংরেজদের আতঙ্ক জন্মিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের চেষ্টা নিষ্ফল হইল।" (—পুরাতন প্রসঙ্গ, বিশ্বভারতী সংস্করণ, পৃঃ ১২২)

১৮৬৬ সালের ৫ এপ্রিল বাংলা সরকার ভারত সরকারকে বহুবিবাহ নিরোধক আইন রচনার কথা জানালেন এবং এই কুপ্রথা অন্ততঃ বাংলা দেশ থেকে দূর করবার জন্য ভারত সরকারকে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ভারত সরকার নানা কারণে এ বিষয়ে অগ্রসর হতে ভরসা পেলেন না। সিপাহিবিদ্রোহের অগ্নিজ্বালা তখনও নির্বাপিত হয় নি। তদানীন্তন সরকার বুঝেছিলেন, ।ধর্মকর্মে আঘাত লাগলে নিরীহ কালা আদিমও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। বিধবা-বিবাহ আইন পাস হবার পর রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নিন্দা লাভ করে সরকার কিছু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। বহুবিবাহ নিরোধ সম্পর্কে যৎসামান্য আন্দোলন এবং রাজদ্বারে আবেদনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সম্প্রদায় সক্রিয় হয়ে উঠে-ছিলেন। গ্র্যাণ্ট ও রমাপ্রসাদ রায়ের দ্বারা যে বহুবিবাহনিরোধক বিল রচিত হয়ে ভারত সরকারের কাছে প্রেরিত হয়, তাতে দেখা যাচ্ছে, ভারত সরকারের কাছে বাংলা দেশ থেকে যেমন প্রগতিশীল ব্যক্তিদের স্বাক্ষরসহ বহুবিবাহনিরোধক প্রস্তাব সরকারের সমীপে প্রেরিত হয়, তেমনি রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে সনাতনপন্থিগণ এই আন্দোলনের প্রতিকূলতা করে এবং বহুবিবাহকে হিন্দুধর্মের অঙ্গস্বরূপ গণ্য করে একটি প্রতিবাদলিপি সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এই সমস্ত কারণে হিন্দুর সমাজসংস্কারে ভারত সরকার সাহসী হলেন না। ১৮৬৬ সালের ৮ আগস্ট ভারত সরকার বাংলা সরকারকে জানিয়ে দিলেন যে, বাংলা দেশের একদল শিক্ষিত শ্রেণীর গণ্যমান্য ব্যক্তি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ উত্থাপন করলেও, বহুবিবাহের স্বপক্ষে প্রেরিত,বাংলাদেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রতিবাদলিপি থেকে তাঁদের মনে হয়েছে, বহুবিবাহনিরোধের বিপক্ষেও অনেক প্রধান ব্যক্তি আছেন। ভারত সরকারের পত্র প্রাপ্তির পর বাংলা সরকার এবিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য একটি তদন্ত কমিটী নিয়োগ করেন। সাত জন সদস্য নিয়ে কমিটী গঠিত হল—১. হবহাউস, ২. প্রিন্সেপ, ৩. সত্যশরণ

ঘোষাল, ৪. বিদ্যাসাগর, ৫. রমানাথ ঠাকুর, ৬. জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৭. দিগম্বর মিত্র। এঁদের রিপোর্ট থেকে মনে হয়, একমাত্র বিদ্যাসাগর ছাড়া আর সকলেই আইন করে বহুবিবাহপ্রথা নিরোধের বিপক্ষেই মত দিয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন, আধুনিক সভ্যতা ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কার আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে, তার জন্য আইনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই প্রস্তাবে সায় দিতে পারলেন না, তিনি কমিটীর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে এবং অমত জানিয়ে স্বাক্ষর করলেন। তিনি প্রতিবাদে লিখলেন—"I do not concur in the conclusion come to by the other gentlemen of the committee. I am of opinion that a Declaratory Law might be passed without interfering with the liberty which Hindoos now by law possess in the matter of marriage." তদন্তকমিটীর অন্যান্য সদস্য কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহকে সমাজের হানিকর কুসংস্কার জেনেও লোকমতের ভয়ে যথাকর্তব্য করতে অপারগ হয়েছিলেন। একমাত্র বিদ্যাসাগরই লোকমতকে উপেক্ষা করে লোকশ্রেয়ের প্রতি অনুরাগ দেখাবার মানসিক সামর্থ্য রাখতেন। রাজদ্বারে এ আইন উপেক্ষিত হলেও বিদ্যাসাগর নিজের মানসিক শক্তিকে এই কাজে যথাসাধ্য নিয়োগ করে অসাধারণ বীর্যবত্তার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হলেও এই সময় অপত্তিকারীরা বলতে শুরু করেছিলেন যে, বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথা হিন্দুর বিশেষ ধর্মসংস্কার ('Institution'); সুতরাং বিদেশী সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করবেন, এ স্বীকার করা যায় না। শাস্ত্রে বহুবিবাহের বিধান রয়েছে, পুরাণ কাহিনীতে পুরুষের বহুবিবাহের অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। তা ছাড়া দীর্ঘ দিন ধরে সারা ভারতবর্ষেও এ-প্রথা অবিরোধে চলে আসছে। সুতরাং এই শাস্ত্রসঙ্গত ব্যাপারে মুষ্টিমেয় ইংরেজী-শিক্ষিত আধুনিক-ভাবাপন্ন সম্প্রদায় হস্তক্ষেপ করবেন, ধর্মের ব্যাপারে সরকারী লৌহ-আইনের

দণ্ড প্রয়োগ করবেন—এ কখনই চলতে পারে না। বিদ্যাসাগর অভীষ্ট-লাভে ব্যর্থ হলেও এই সমস্ত অযুক্তি-কুযুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নানা শাস্ত্রসংহিতা মন্থন করে বহুবিবাহের শাস্ত্রীয় অবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে চাইলেন এবং নিজস্ব যুক্তি ও তথ্য দিয়ে একখানি পুস্তিকা রচনা আরম্ভ করলেন। কিন্তু শরীরিক অসুস্থতার জন্য কিছু দূর অগ্রসর হয়েও ক্ষান্ত হলেন। অবশ্য অল্পকালের মধ্যে এই বিষয়ে নিজ বক্তব্য উপস্থাপিত করবার সুযোগ লাভ করলেন। ১৮৭০ সালে কলকাতার 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র কর্তৃপক্ষ আবার নতুন করে বহু-বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য প্রস্তুত হন এবং এই রীতি রদ হলে শাস্ত্রের অমর্যাদা হবে কি না, এজন্য তাঁরা বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মতামত জানতে চান। এই সময় বিদ্যাসাগর তাঁর অসম্পূর্ণ পুস্তিকা সম্পূর্ণ করে নানা শাস্ত্র থেকে প্রসঙ্গ ও উক্তি উল্লেখ করে দেখালেন, বহুবিবাহ শাস্ত্রীয় ব্যাপার নয়, এবং এর নিরোধে শাস্ত্রীয় মর্যাদার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। ১৯২৮ সংবৎ ১লা শ্রাবণ (১৮৭১, ১০ আগস্ট) বহুবিবাহ নিরোধক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হল। তার নাম দিলেন—'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার'। তিনি দেখালেন ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে 'মানব' ধর্মশাস্ত্রই মাননীয়। তাতে আছে যে, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পর গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের জন্য প্রত্যেককেই বিবাহ করতে হবে। প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হলে দ্বিতীয়-বার বিবাহ বিধেয়। কারণ সস্ত্রীক না হলে গার্হস্থ্যাশ্রম নির্বাহ হয় না। তৃতীয় কারণেও পুরুষের পুনর্বিবাহ চলতে পারে। মনুতে বলা হয়েছেঃ "স্ত্রী সুরাপায়িনী ব্যাভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীত-কারিণী, চিররোগিণী, অতি ক্রুরস্বভাবা, অর্থনাশিনী" হলে পুনরায় অধিবেদন অর্থাৎ দারপরিগ্রহ চলতে পারে।[৫০] আরও বলা হয়েছে,

৫০. মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
বাধিতা ব্যাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্বদা॥

স্ত্রী বন্ধ্যা হলে অষ্টমবর্ষে, মৃত পুত্র হলে দশমবর্ষে, শুধু কন্যাপ্রসবিনী হলে একাদশবর্ষে ও অপ্রিয়বাদিনী হলে তদ্দণ্ডে পুরুষের পুনর্বিবাহ চলতে পারে।[৫১]

চতুর্থ প্রকারের বিবাহকে 'কাম্যবিবাহ' বলে। যে-কোন পুরুষ উক্ত ত্রিবিধ বিবাহ ছাড়াও ইচ্ছামতো, বিলাসপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চাইলে, সংহিতাকারেরা মানবচরিত্রের প্রবণতা স্মরণ করে তাতে বাধা দেন নি। তাঁরা বলেছেন, পূর্বোল্লিখিত ত্রিবিধ বিবাহে সবর্ণা পাত্রী প্রয়োজন। কিন্তু কাম্যবিবাহে অনুলোমক্রমে বিবাহরীতি অনুসৃত হবে। অর্থাৎ চতুর্থ ধরনের বিবাহে পাত্র তার চেয়ে নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ করবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—শুধু এই তিন শ্রেণীরই কাম্য-বিবাহে অধিকার, শূদ্রসমাজ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই পূর্বোল্লিখিত তিন প্রকার পত্নীকে 'ধর্মপত্নী' এবং চতুর্থ প্রকারের পত্নীকে 'কামপত্নী' বলা হয়েছে।[৫২] শেষোক্ত পত্নীকে সহধর্মিণী বলা যায় কি না সন্দেহ। কামবাসনার অবাধ মুক্তি ছাড়া এই জাতীয় বিবাহে পুরুষের আর কোন লাভ নেই। এ রকম বিবাহে প্রবৃত্ত হলে ধর্মপত্নীর সম্মতি প্রয়োজন।[৫৩] পত্নী সন্তোষসহ সম্মতি না দিলে কামুক পুরুষ কাম চরিতার্থ করার জন্য অসবর্ণা কামপত্নী গ্রহণেও অসমর্থ হবেন। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র থেকে অধিবেদন সম্পর্কে এই পাঁচটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে :

৫১. বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥

৫২. সবর্ণা যস্য যা ভার্যা ধর্মপত্নী হি সা স্মৃতা।
অসবর্ণা তু যা ভার্যা কামপত্নী হি সা স্মৃতা ॥ (মৎস্য সূক্ত, ৩১ পটল)

৫৩. একামুৎক্রম্য কামার্থমন্যাং লব্ধুং য ইচ্ছতি।
সমর্থস্তোষয়িত্বার্থৈঃ পূর্বোঢ়ামপরাং বহেৎ ॥ (মদনপারিজাতধৃত দেবল-বচন)

১. গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পর গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হয়ে সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করবে।

২. প্রথমা পত্নীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটলে, তার জীবিতকালের মধ্যেও সবর্ণা বিবাহ চলতে পারে।

৩. আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্বে স্ত্রীবিয়োগ হলে আবার সবর্ণা বিবাহ চলতে পারে।

৪. সবর্ণা কন্যার অভাবে অসবর্ণা (অনুলোমক্রমে) বিবাহ চলবে।

৫. পত্নী থাকতেও কামুক পুরুষের কামেচ্ছা জাগলে অসবর্ণা বিবাহ করতে পারে।[৫৪]

কিন্তু পঞ্চম প্রকারের বিবাহ যে নিতান্তই 'পিত্তরক্ষা' তাতে সন্দেহ নেই। কামপত্নী সম্বন্ধে কোথাও শ্রদ্ধাবাচক উক্তি নেই, কোথাও-বা এ প্রথার বিরুদ্ধকথাই আছে। কোন কোন শাস্ত্রকার কামপত্নীকে প্রায় উপপত্নীর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। স্বামীর সঙ্গে ধর্মাচর্যা ও গৃহচর্যায় যায় অধিকার নেই, স্বামীর কামোপশমনের জন্যই যার প্রয়োজন, তাকে উপপত্নী ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়। 'আপস্তম্ব' সুযোগ্যা পত্নী বর্তমানে অন্য পত্নী বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কালক্রমে যখন সমাজব্যবস্থা গলিতপ্রায় হয়ে এল, কুলীন ব্রাহ্মণেরা পরবর্তীকালের 'বিবাহবিশারদ হীরালালে'র মতো রুজি রোজগারের জন্য বহুবিবাহ করতে শুরু করলেন, তখন বাংলার উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকদের দারুণ দুর্দশা ঘনিয়ে এল। করুণাময় বিদ্যাসাগর নারীজাতিকে এই ঘৃণ্য দুর্গতি থেকে রক্ষা করার জন্য বহুবিবাহ-নিষেধ-

৫৪. কিন্তু প্রতিলোমক্রমে (অর্থাৎ পুরুষ যেখানে স্ত্রীর চেয়ে নিম্নবর্ণ) বিবাহ কখনই শাস্ত্রবিধি নয়। এরকম বিবাহোৎপন্ন সন্তানদের বর্ণসঙ্কর বলে—"প্রতিলোম্যেন জজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ।" (নারদসংহিতা, ১২শ বিবাহ পদ)। ব্যাসসংহিতায় (১ম অধ্যায়) এই বিবাহজাত সন্তানদের শূদ্রের চেয়েও অধম ("অধমাদুত্তমায়াত্ত জাতঃ শূদ্রাধমঃ ভবন্তি")। তাই জীমূতবাহন ('দায়ভাগ') পুনঃ পুনঃ অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন—"প্রতিলোম পরিণয়নং সর্বথৈব ন কার্যম্।"

বিধি প্রচলনের ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন। সংস্কারান্ধ ব্যক্তিরা তাঁর বিরুদ্ধে নানা কুযুক্তি প্রয়োগ করেন এবং হিন্দুধর্ম যায়-যায় রব তুলে শাস্ত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমর্থন সংগ্রহ করেন। এই সমস্ত স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা শাস্ত্রকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করেছেন দেখে বিদ্যাসাগর দু'খানি পুস্তকে শাস্ত্র মন্থন করে বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে 'অকাট্য' যুক্তি প্রয়োগ করেন এবং তার সঙ্গে অভিসন্ধিপরায়ণ বহুবিবাহ-সমর্থকদের নষ্টামিও ধরিয়ে দেন। এই দু'খানি পুস্তকে তিনি একাধারে শাস্ত্র মীমাংসা করছেন, আবার প্রতি-পক্ষের যুক্তির ত্রুটি, দুর্বলতা এবং ইচ্ছাকৃত দুর্ব্যাখ্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। শাস্ত্র ছেড়ে দিলেও, সমাজ ও সহৃদয়তার দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি বহুবিবাহের উচ্ছেদ চেয়েছিল। যাকে শাস্ত্রযাজী বলে, বিদ্যাসাগর সে ধরনের মানুষ ছিলেন না। মানুষের কল্যাণের কথাই ছিল তাঁর কর্মধারা ও চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শাস্ত্রে তার সমর্থন মিললে তিনি সে শাস্ত্রবচন গ্রহণ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের জন্য শাস্ত্র, শাস্ত্রের জন্য মানুষ নয়।

তাঁর অধিবেদন নিষেধক প্রথম পুস্তিকায় ('বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'—১৮৭১) 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র সহায়তাসূচক যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে। পুরুষ জাতির পীড়নে ও সামাজিক কুপ্রথার দোষে বহুবিবাহের শিকার স্ত্রীজাতির দুঃখদুর্দশা দূর করবার জন্য তিনি প্রথম পুস্তিকায় বহুবিবাহ সমর্থনকারীদের যুক্তি খণ্ডন করেন, এবং শাস্ত্রবচনের সাহায্যেই খণ্ডন করেন। সাতটি অধ্যায়ে তিনি প্রতিপক্ষের সাতটি আপত্তি বিশ্লেষণ করে যদৃচ্ছা বহু-বিবাহ যে অশাস্ত্রীয় ও অনর্থকর তা প্রমাণ করেন। এই আপত্তিসমূহে তিনি দেখান যে, শাস্ত্রে যথেচ্ছাক্রমে বহুবিবাহের সমর্থন নেই। বহুবিবাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ হলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, এবং কুলীন ব্রাহ্মণদের জাতিলোপও হবে না, সমাজধর্মেরও কোন ক্ষতি হবে না।

তখনকার দিনে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে হলেও এর জন্য সরকারী আইনের হস্তক্ষেপ মানতে সম্মত হন নি। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মন অনেক বেশী প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী ছিল। তিনি মনে করতেন, গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে এই সমস্ত সামাজিক কুৎসিত দোষ নিবারিত হতে পারে না। শিক্ষালাভের পর দেশের লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই সমস্ত দোষ স্বেচ্ছাক্রমে পরিত্যাগ করবে, এমন আশা করলে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে। তাই তিনি বলেছেন, "রাজশাসন দ্বারা, এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ হইলে, সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ঘটিবেক, তাহার কোন হেতু বা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না।........আমাদের ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এরূপ কথা বলা বালকলতা প্রদর্শন মাত্র। আমাদের ক্ষমতা কোথায়। ক্ষমতা থাকিলে, ঈদৃশ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যক হইত না ; আমরা নিজেই সমাজের সংশোধন-কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম। ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, ক্ষমতা নাই ; সুতরাং, সমাজের দোষ সংশোধন করিতে পারিবেন না ; কিন্তু তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিলে, অপমানবোধ বা সর্বনাশ জ্ঞান করিবেন, এরূপ লোকের সংখ্যা, বোধ করি, অধিক নহে ; এবং অধিক না হইলেই, দেশের ও সমাজের মঙ্গল।" (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৮–৫৯)

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকেও কৌলীন্যপ্রথা এদেশে কী ভয়াবহ আকারে বর্তমান ছিল, তা বিদ্যাসাগর-সংগৃহীত কুলীন ব্রাহ্মণদের বিবাহের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে। তিনি শুধু হুগলী জেলা এবং ঐ জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রাম থেকে যে তথ্য[৫৫] সংগ্রহ করেন, তাতে দেখা যাচ্ছে পঞ্চান্ন বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা চার-কুড়ি বিবাহ করতেও পিছপাও হন নি। চিত্রশালি গ্রামের বিশ বছরের যুবক দুর্গাচরণ

৫৫. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের মতে নবীন চক্রবর্তী নামে বিদ্যাসাগরের এক গ্রামবাসী এই তালিকা সংগ্রহ করে দেন। (দ্রঃ শম্ভুচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ', বুকল্যাণ্ড প্রকাশিত নতুন সংস্করণ ১৩৬২, পৃঃ ১৪৮-১৪৯)

বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বয়সের মধ্যেই ষোলটি বিবাহ করে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। কলকাতার কাছাকাছি শিক্ষিত গ্রাম জনাইয়ের কুলীন ব্রাহ্মণদের যে তালিকা বিদ্যাসাগর সংগ্রহ করেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, এ গ্রামের প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণই দশ বা তার কিছু কম বিবাহ করেছিলেন। যিনি অতিশয় কৃপণরুচি, তাঁরও বিবাহের সংখ্যা—দুই। এ ছাড়াও বর্ধমান, নবদ্বীপ, যশোহর, বরিশাল, ঢাকা[৫৬] প্রভৃতি অঞ্চল থেকে তিনি যে সংবাদ সংগ্রহ করেন, তাতে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের অনেক তথ্য আছে।

বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, "আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ, অত্যন্ত অপদার্থ; আমাদের হতভাগ্য সমাজ অতিকুৎসিত দোষপরম্পরায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ" (পৃঃ ৫৫)। তাই তিনি অনন্যোপায় হয়ে রাজবিধানের সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন। মনে করেছিলেন, "যেরূপ শুনিতে পাই, তাঁহারা (অর্থাৎ ইংরেজ শাসক), রাজ্যভোগের লোভে আকৃষ্ট হইয়া, এ দেশে অধিকার বিস্তার করেন নাই; সর্ব্বাংশে এদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনই তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য" (পৃঃ ৬০)। কিন্তু বহুবিবাহের আইন পাসের ব্যাপারে সরকারের টালবাহনা দেখে তাঁর সে বিশ্বাস

৫৬. পূর্ববঙ্গেও বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলন বিশেষভাবে প্রচার লাভ করেছিল। ঢাকা তারপাশা গ্রামের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে (নিজে কুলীন হওয়া সত্ত্বেও) এই রীতির বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে প্রচণ্ড সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রজসুন্দর মিত্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এবং 'হিন্দুহিতৈষিণী, 'ভারত-সংস্কারক', 'ঢাকা প্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকা তাঁর প্রচারকার্যে সহায়তা করেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ববঙ্গের বহু গ্রামে এই প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছিলেন, এই সম্পর্কে অনেক গান ও কবিতা লিখেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। ১৮৮১ সালে তাঁর একখানি ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশিত হয়। তাতে এই সম্পর্কে অনেক কৌতূহলপূর্ণ সংবাদ আছে।

শিথিল হয়েছিল। শোনা যায়, তিনি বহুবিবাহনিষেধক গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করে বিলাতে গিয়ে মাহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে দিয়ে এই বলে অনুযোগ করতে চেয়েছিলেন, যে-দেশের রাজ্যশাসন করেন এক মহীয়সী নারী, সে দেশের নারীসমাজের এত দুর্গতি কেন। ঠিক এই জাতীয় উক্তি তাঁর বহুবিবাহনিষেধক পুস্তিকার প্রথম খণ্ডের শেষভাগে এক মন্দভাগিনী কুলীনকন্যার মুখেও পাওয়া যায়—"সকলে বলে, এক স্ত্রীলোক আমাদের দেশের রাজা কিন্তু আমরা সে কথায় বিশ্বাস করি না ; স্ত্রীলোকের রাজ্যে, স্ত্রীজাতির এত দুরবস্থা হইবেক কেন" (৪র্থ, পৃঃ ৬১)।[৫৭]

বহুবিবাহনিষেধক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হবার পর যেন মধুচক্রে লোষ্ট্রপাত হল। তাঁকে আক্রমণ করে নানাজনে প্রতিবাদপত্র প্রকাশ শুরু করলেন। সে প্রতিবাদ বহু স্থলেই অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয়, আক্রমণের ভাষাও অতিশয় তীব্র। অতঃপর বিদ্যাসাগর আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, সেই সমস্ত অলীক অভিযোগ ও অন্যায় আক্রমণের জবাব দেবার জন্য প্রথম পুস্তিকা প্রকাশের দু' বছরে পরে (এপ্রিল, ১৮৭৩) দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রচার করলেন—'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (দ্বিতীয় পুস্তক)'। প্রথম পুস্তকের প্রথম ক্রোড়পত্রে তিনি 'বহুবিবাহ-বিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচার' নামে বহুবিবাহ সমর্থক একখানি পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন। সেটি বোধ হয় তাঁর প্রথম পুস্তিকার ঈষৎ পূর্বে প্রকাশিত হয়। ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, নারায়ণ বেদরত্ন প্রভৃতি তেরজন পণ্ডিতের স্বাক্ষরে প্রকাশিত এই পুস্তিকায় শাস্ত্রসাহায্যে বহুবিবাহ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়। বিদ্যাসাগর এই ক্রোড়পত্রে তাঁদের যুক্তি ছিন্নভিন্ন করেন। এই

৫৭. বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বলেছেন, "বাবা বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে গিয়া বহুবিবাহ গ্রন্থ সুন্দর করিয়া ছাপাইয়া মহারাণীর হাতে দিয়া বলিবেন, মেয়েরাজার দেশে মেয়েদের দুঃখ ঘুচে না কেন ?" (দ্রঃ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, ১৮৯৫, পৃঃ ৩৩৪)

পুস্তিকাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি শুনতে পান, এই পণ্ডিতগণ "কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে, সহায়তায় ও উত্তেজনায় বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচার-পত্র প্রচারিত করিয়াছেন "(৪র্থ, পৃঃ ৬৯)। এ সংবাদে বিদ্যাসাগর বিস্মিত হন। কারণ ইতিপূর্বে বহুজনের স্বাক্ষরে রাজদ্বারে বহুবিবাহ-নিরোধক আইন প্রণয়নের জন্য দ্বিতীয় বার যে আবেদন প্রেরিত হয় তাতে তারনাথ তর্কবাচস্পতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহোৎসাহে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। "এক্ষণে, তিনিই আবার, বহুবিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, অনর্থকর, অধর্ম্মকর ব্যবহারকে শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইবেন, ইহা সম্ভব বোধ হয় না" (ঐ, পৃঃ ৬৯)। কিন্তু তাও সম্ভব হল। তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ ও সহায়ক তারানাথ এবং আরও অনেক পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের মতের প্রতিবাদ করে, বহুবিবাহ যে সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত, তা প্রমাণের জন্য বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করেন এবং তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রতি প্রচুর দুর্বাক্য বর্ষণ করে এই সমস্ত পুস্তক প্রচার করেন। তাঁরা এমন অভিযোগ আনতেও দ্বিধা করেন নি যে, বিদ্যাসাগর স্বাভিপ্রায় সাধনে তঞ্চকতা করে মিথ্যা শাস্ত্রোক্তি ও অলীক শ্লোক উদ্ধার করেছেন। তাঁর প্রথম পুস্তিকা প্রকাশের অব্যবহিত পরে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহায়ক তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং স্নেহভাজন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল) এ বিষয়ে তাঁর প্রতিকূলতা করে 'সোমপ্রকাশে' (দ্বারকানাথ সম্পাদিত) প্রবন্ধনিবন্ধ ও পত্র প্রকাশ করেন। তর্কবাচস্পতি একদা বহুবিবাহব্যাপারের নিরোধক হয়ে আবার তার সমর্থক হলেন কেন সে বিষয়ে 'সোমপ্রকাশে' তিনি লেখেন—"তৎকালে উপায়ান্তর নাই বিবেচনা করিয়া সামাজিক বিষয় হইলেও নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয়ের নিবারণার্থে আইন প্রস্তুত করিবার জন্য রাজদ্বারে আবেদন-

পত্রেও স্বাক্ষর করিয়া তদ্বিষয় সম্পাদনায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, বিদ্যাচর্চ্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বহুবিবাহ প্রণালী অনেক ন্যূন হইয়াছে। আমার বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবে অতএব তজ্জন্য আর আইনের আবশ্যকতা নাই।" (সোমপ্রকাশ, ১২৭৮, ভাদ্র)

বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় ক্রোড়পত্রে তর্কবাচস্পতির যুক্তি ও অভিমত খণ্ডন করেন। ঐ একই সপ্তাহের 'সোমপ্রকাশে' সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বিদ্যাসাগরের অভিমতের বিরোধিতা করে লেখেন যে, শাস্ত্রে ও সাহিত্যে পুরুষের বহুবিবাহের উল্লেখ আছে। সুতরাং এর বিরুদ্ধাচরণ করা নিষ্প্রয়োজন। উপরন্তু পুরুষেরা বহুকাল ধরে স্বেচ্ছাচারী হয়ে আসছেন, স্ত্রীলোকদের সুখদুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত না করে একাধিক বিবাহরসে মজে আছেন; তাঁরা যে সহজে সে অধিকার ছেড়ে দেবেন তা মনে হয় না। সুতরাং এবিষয়ে আইনপ্রণয়ন নিষ্প্রয়োজন। দ্বারকানাথের মতো পণ্ডিতের অপণ্ডিতজনোচিত এই শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনে বিদ্যাসাগর নিরতিশয় বিস্মিত হয়েছিলেন। এখানে দ্বারকনাথ-সংক্রান্ত তথ্য সংক্ষেপ উদ্ধৃত হচ্ছে।

'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বহুবিবাহ সমর্থন করতে গিয়ে এই হাস্যকর যুক্তি উত্থাপন করেন—"এদেশের পুরুষেরা চিরকালই স্বৈরব্যবহারী হইয়া আসিয়াছেন। আপনাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার অন্বেষণেই চিরকাল ব্যস্ত ছিলেন। স্ত্রীজাতির সুখদুঃখাদির প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। এতাদৃশ স্বার্থপর পুরুষেরা স্বহস্তে শাস্ত্রকর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া যে আপনাদিগের একটি প্রধান ভোগপথ রুদ্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।" এর প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর লেখেন, "পণ্ডিতের মুখে কেহ কখনও এরূপ বিচিত্র মীমাংসা শ্রবণ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।" দ্বারকানাথ সামাজিক ব্যাপারে প্রগতিশীল হলেও গর্ভণমেন্টের সাহায্যে সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনিও মনে করতেন, শিক্ষাদীক্ষা

প্রচারিত হলেই এ সমস্ত কুসংস্কার আপনা-আপনি লোপ পেয়ে যাবে। যে-কোন ব্যাপারে "দাদাকে ডাকা সুখের নয়" (সোমপ্রকাশ, ৩০ শ্রাবণ, ১২৭৮), এই ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। বহুবিবাহ নিরোধে সরকারী হস্তক্ষেপ তিনি চান নি বটে, কিন্তু তার বিকল্প হিসেবে যে প্রস্তাব করেন, তাও সরকারী হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়। তাঁর পরামর্শটি কৌতুকাবহ। "যাবৎ ইঁহারা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া সমাজ সংস্কার করিতে না পারিতেছেন, তাবৎ কালের নিমিত্ত আমরা একটা সদুপায় বলি।.... এই বলিয়া গভর্ণমেণ্টে আবেদন করুন শাস্ত্রোক্ত কয়েকটি কারণ ব্যতিরেকে যাঁহারা একাধিক বিবাহ করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক বিবাহে ৫০০ টাকা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে। অর্থসম্বন্ধ আছে শ্রবণ মাত্র এ আবেদন গবর্ণমেণ্টের হৃদয়গ্রাহী হইবে, আমাদিগেরও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিঃস্ব অপদার্থ কুলীনকুমারেরাই উপদ্রব করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাইবে। অপর লাভ এই, গবর্ণমেণ্টের সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইল না।" এর উত্তরে বিদ্যাসাগর যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর বিদ্যাসাগর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' পুস্তকের (১৮৭৩) দ্বিতীয় খণ্ডে সবিস্তারে তাঁর প্রতিবাদীদের মতামত বিচার করেন এবং তাঁদের অধিকাংশ অভিমত খণ্ডন করে নিজ সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এতে তিনি পাঁচজন প্রতিবাদীর মত ও মন্তব্যের যৌক্তিকতা বিচারপ্রসঙ্গে অধিবেদনসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য-উপাদানের পুনর্বিচারের সুযোগ লাভ করেন। এঁরা হলেন সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি (এঁর পুস্তিকা 'বহু বিবাহবাদ' সংস্কৃতে রচিত), বরিশাল নিবাসী রাজকুমার ন্যায়রত্ন (পুস্তিকার নাম 'প্রেরিত তেঁতুল'), ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন ('বহুবিবাহ-বিষয়ক বিচার'), সত্যব্রত সামশ্রমী ('বহুবিবাহবিচার সমালোচনা') এবং মুর্শিদাবাদ নিবাসী গঙ্গাধর রায় কবিরাজ ('বহুবিবাহরাহিত্যা-রাহিত্যনির্ণয়')। এই পাঁচজন প্রতিবাদীর গুরুত্ব অনুসারে বিদ্যাসাগর

তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও সত্যব্রত সামশ্রমীর পুস্তিকার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আপেক্ষাবৃত বিশদ আলোচনা করেন ; আর তিনজনের রচনা ও যুক্তিরীতি নিতান্তই সাধারণ স্তরের বলে বিদ্যাসাগর এঁদের সম্পর্কে আলোচনা স্বল্প কথায় সেরেছেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতির সঙ্গে বহুবিবাহ নিয়ে তাঁর বিরোধ সে যুগের কলকাতার বৈঠকখানার রসাল আলোচনায় পরিণত হয়েছিল। সুপ্রসিদ্ধ 'বাচস্পত্যভিধান' প্রণেতা এবং আরও অনেক গ্রন্থের লেখক তারানাথ তর্কবাচস্পতি (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের পিতা) সেযুগের পণ্ডিতসমাজে বিখ্যাত হয়েছিলেন। প্রথমে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা ছিল। বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতেই বাচস্পতি ১৮৪৫ সালে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। তার পূর্বে পণ্ডিত মহাশয় অর্থোপার্জনের জন্য নানাবিধ বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। কাপড়ের কারবার, গহনার দোকান, চাষবাস, কাঠচালানির ব্যবসা প্রভৃতি নানা ধরনের ব্যাপারে জড়িত হয়ে তিনি বিলক্ষণ ধনোপার্জন করেছিলেন।[৫৮] বহুবিবাহ নিষেধের বিরুদ্ধে তিনি সংস্কৃত ভাষায় একখানি পুস্তিকা ('বহুবিবাহবাদ') লিখে বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসঙ্গত তা প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁর ওপর অনেক দুষ্ট অভিসন্ধি আরোপ

৫৮. বহুবিবাহনিরোধক দ্বিতীয় আবেদনে বাচস্পতি সম্মতিসূচক স্বাক্ষরও করেছিলেন। কিন্তু তার পরে এই ব্যাপারে তিনি বিদ্যাসাগরের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়েন এবং একাধিক পুস্তিকায় বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে নানা দোষারোপ করেন। বিদ্যাসাগরও স্বনামে দ্বিতীয় পুস্তকে এবং বেনামে ('অতি অল্প হইল,' 'আবার অতি অল্প হইল') বাচস্পতির আক্রমণের যথোচিত জবাব দেন। এ বিষয়ে ইন্দ্রমিত্র ('করুণাসাগর বিদ্যাসাগর') আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে বিদ্যাসাগর যতদিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তর্কবাচস্পতি ততদিনই তাঁর আনুকূল্য করেছিলেন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের কর্ম ত্যাগ করলে, তর্কবাচস্পতিও বিদ্যাসাগরে প্রতি আনুকূল্য ছেড়ে ফেলে দেন। দ্রঃ বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর ১৩২৯, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩০৭-৮

করেন। তাঁর পুস্তিকাটি সংস্কৃতে রচিত বলে [৫৭] সাধারণে এর তাৎপর্য সম্বন্ধে ততটা অবহিত ছিল না। যাই হোক বিদ্যাসাগর বাংলায় এর জবাব লিখলেন। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রথম দশটি পরিচ্ছেদে ("তর্ক-বাচস্পতি প্রকরণ") তিনি তারানাথের বহু উক্তির কঠোর সমালোচনা করে তাঁর বিচারভ্রান্তি দেখিয়ে দিয়েছেন। যদিও তর্কবাচস্পতি শাস্ত্রাদিতে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু বহুবিবাহপ্রবর্তক সংস্কৃত পুস্তিকায় নিজ মত আঁকড়ে থাকার জন্য অনেক সময় শাস্ত্রের সরলার্থকে অনাবশ্যক জটিল করবার চেষ্টা করেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর মত ও মন্তব্য হাস্যকর মনে হয়। 'বহুবিবাহবাদে' তর্কবাচস্পতি অনেক শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করেছেন, কিন্তু হালে পানি না পেয়ে শেষকালে বলে ফেলেছেন, "ইচ্ছায়া নিরঙ্কুশত্বাচ্চ যাবদিচ্ছং তাবদ্বিবাহস্যোচিতত্বাৎ"—ইচ্ছার নিয়ামক নেই, অতএব যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত! পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও যে কাণ্ডজ্ঞানের বিলক্ষণ ঘাটতি থাকতে পারে—তর্কবাচস্পতির এই দাম্ভিক উক্তিই তার প্রমাণ। এটা অনেকটা যেন *argumentum baculinum* বা লাঠ্যৌষধির মতো। তারানাথ, তর্কযুদ্ধে পরাভূতের শেষ অস্ত্র, যা-খুশি-তাই করার নীতি গ্রহণ করাতে বিদ্যাসাগর ঈষৎ পরিহাসের সুরে সরসভাবে যথার্থ মন্তব্য করেছেন: "এই ব্যবস্থার অথবা উপদেশবাক্যের সৃষ্টিকর্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি, এবং আশীর্বাদ করিতেছি, তিনি চিরজীবী হউন এবং এইরূপ সদ্ব্যবস্থা ও সদুপদেশ দ্বারা স্বদেশীয়-দিগের সদাচার শিক্ষা ও জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন বিষয়ে, সহায়তা করিতে থাকুন। তাঁহার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি, অগাধ বিদ্যা, অদ্ভুত সাহস ব্যতিরেকে, এরূপ অভূতপূর্ব ব্যবস্থার উদ্ভব কদাচ সম্ভব নহে।" 'বহুবিবাহবাদে' তথাকথিত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধারের পর বিদ্যাসাগরকে খোঁচা দিয়ে

---

৫৮. বহুবিবাহ নিষেধের বিরুদ্ধে তিনি নাকি 'লাঠি থাকিলেও পড়ে' নামে একখানি বাংলা পুস্তিকায় বিদ্যাসাগরকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। (বিহারীলালের উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০৮)

তর্কবাচস্পতি লিখেছিলেন, "তচ্চ দ্বিশকটপুস্তকভারাহরণেন উপদেশ-সহস্রানুসরণেন বা তেন সমাধেয়ম্"—'এক্ষণে তিনি (বিদ্যাসাগর) দুই গাড়ী পুস্তক আহরণ অথবা সহস্র উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহার সমাধান করুন।' বিদ্যাসাগর এর উত্তরে পরিহাস করে লেখেন, "দেখ, তিনি কেমন সরল, কেমন পরহিতৈষী ; একগাড়ী পুস্তক পর্যাপ্ত হইবেক না, যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন, অমনি দুই গাড়ী পুস্তক আহরণের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি যে সকল পুস্তক আহরণ করিয়াছি, আমার আশঙ্কা হইতেছে, তাহা দুই গাড়ী পরিমিত হইবে না ; বোধ হয়, অথবা বোধহয় কেন, একপ্রকার নিশ্চয়ই, কিছু ন্যূন হইবেক ; সুতরাং, সম্পূর্ণভাবে, তদীয় তাদৃশ নিরুপম উপদেশের পালন করা হয় নাই ; এজন্য, আমি অতিশয় চিন্তিত, দুঃখিত, লজ্জিত, কুণ্ঠিত ও শঙ্কিত হইতেছি। দয়াময় তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যে রূপ দয়া করিয়া, আমায় ঐ উপদেশ দিয়াছেন, যেন সেইরূপ দয়া করিয়া, আমার এই অপরাধ মার্জনা করেন" (পৃঃ ১৫৫-৫৬)। এই সূক্ষ্ম পরিহাস বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনায় তীব্র ব্যঙ্গে পর্যবসিত হয়েছিল, যথাস্থানে সে বিষয়ে আলোচনা করব। তর্কবাচস্পতি ছিলেন তাঁর প্রধান প্রতিযোদ্ধা। তাঁর সংস্কৃত পুস্তিকার বচনাদিকে বিদ্যাসাগর যেভাবে ছিন্নভিন্ন করেছেন, তাতে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞান—উভয়েরই প্রশংসা করতে হয়। নিজের গোঁ বজায় রাখার জন্য শাস্ত্রবাক্যকে মোচড় দিয়ে স্বাভিমতানুযায়ী অর্থ নিষ্কাশন করা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিতের উচিত কাজ নয়। কিন্তু তর্কবাচস্পতি শুধু সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ছিলেন না, অর্থাগমাদি ব্যাপারে তাঁর ব্যবসায়ী বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল—সেই কেজো বুদ্ধির সাহায্য নিয়েছেন এই সংস্কৃত পুস্তিকায়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের যুক্তি, তর্ক ও সিদ্ধান্তের আঘাতে তাঁর বহু সিদ্ধান্ত ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে।

এর পর উল্লেখ করতে হয় সত্যব্রত সামশ্রমীর ('বহুবিবাহ বিষয়ক বিচার') মত খণ্ডন করে লেখা অধ্যায়টির ("সামশ্রমিপ্রকরণ")।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বেদবিৎ সামশ্রমীর সমাজে প্রাধান্য স্মরণ করে বিদ্যাসাগর তাঁর পুস্তিকারও ঈষৎ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সামশ্রমীর যুক্তিজাল কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় হলেও বহু স্থলে তিনিও সূক্ষ্ম বিচারবোধ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন, বিদ্যাসাগর এই অধ্যায়ে সবিস্তারে তা প্রমাণ করেছেন। বহুবিবাহ সম্বন্ধে সামশ্রমী বলেছেন, "যখন ইহা আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত আছে, শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন ইহাকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থিরকরনার্থ বিশেষ শাস্ত্রানুসন্ধানে বা ধীসহকৃত কাল ব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।" এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সামশ্রমী গতানুগতিক সামাজিক নিয়মের উর্ধ্বে উঠতে সাহস করেন নি। যেহেতু সর্বত্র চলছে, সেই হেতু, যত অন্যায় হোক না কেন, তাকে স্বীকার করে নিতে হবে—এ জাতীয় গড্ডলবৃত্তির দাসত্ব ধীমানের লক্ষণ হয়। আর তা ছাড়া syllogism-এর major premise-ই যেখানে সংশয়-পূর্ণ ("শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না"), সেখানে উপসংহারও ভ্রান্ত হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, সামশ্রমী মহাশয় পণ্ডিত, গবেষক ও তাত্ত্বিকের অকরণীয় কার্যও করেছেন। তিনি নিজ মত প্রমাণের জন্য মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত বৈবাহিক পর্বের কয়েকটি শ্লোক (দ্রুপদের উক্তি)[৬০] উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পঞ্চম বেদতুল্য মহাভারতে শুধু পুরুষের একাধিক বিবাহের কথা আছে, কিন্তু স্ত্রীর একাধিক স্বামীর কথা নেই। দ্রুপদের এই কথার উত্তরে যুধিষ্ঠির যে উত্তর দিলেন, সামশ্রমী মহাশয় নিজ বক্তব্য আঁকড়ে ধরার জন্য সেকথা বেমালুম চেপে গেছেন। যুধিষ্ঠির দ্রুপদের কথার উত্তরে বললেন যে, পুরাণে নারীর একই সময়ে একাধিক পতি-

৬০. একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন।
নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ॥ (মহাভারত)
দ্রুপদ বললেন, হে কুরুনন্দন, একপুরুষের এককালে বহু স্ত্রীর বিধান আছে। কিন্তু একস্ত্রীর এককালে বহুপতি হবার কথা কোথাও শুনি নি।

গ্রহণের কাহিনী আছে। সুতরাং তাঁরা পাঁচ ভাই মিলে দ্রৌপদীকে বিবাহ করলে অধর্ম হবে না। কারণ

> শ্রূয়তে হি পুরাণেঽপি জটিলা নাম গৌতমী।
> ঋষীনধ্যাসিতবতী সপ্ত ধর্মভৃতাং বরা॥
> তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ।
> সঙ্গতাভূদ্দশ ভ্রাতৃনেকনাম্নঃ প্রচেতসঃ॥ (মহাভারত, আদি, ১৯৫ অধ্যায়)

পুরাণেও শুনতে পাওয়া যায় গোতমকুলোদ্ভবা জটিলা সাতজন ঋষিকে বিবাহ করেছিলেন। এবং মুনিকন্যা বার্ক্ষী প্রচেতা নামক তপঃপরায়ণ দশ ভ্রাতার ভার্যা হয়েছিলেন।

নিজ উক্তিকে প্রামাণিক করবার জন্য সামশ্রমী যুধিষ্ঠিরের এই উক্তিটুকু উহ্য রেখেছিলেন। তাঁর এই কৌশল *suppressio veri suggestio false*-র পর্যায়ে পড়ে নাকি ? সামশ্রমীর যুক্তিপন্থার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে পরিশেষে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন, "প্রথমতঃ, সামশ্রমী ধর্মশাস্ত্রের রীতিমত অধ্যয়ন ও বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই, দ্বিতীয়তঃ, তত্ত্বনির্ণয় লক্ষ্য করিয়া, বিচারকার্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই ; তৃতীয়তঃ, বাল্য স্বভাবসুলভ চাপল্য দোষের আতিশয্যবশতঃ, স্থিরচিত্তে শাস্ত্রার্থনির্ণয়ে বুদ্ধিচালনা করিতে পারেন নাই।" শুধু সাধারণ জ্ঞান থেকেই বিদ্যাসাগরের এই মন্তব্যের সারবত্তা বোঝা যাবে।

এর পর তিনখানি প্রতিবাদ-পুস্তকের কথা বিদ্যাসাগর সংক্ষেপে সেরেছেন। রাজকুমার ন্যায়রত্নের প্রতিবাদ-পুস্তিকাটির নাম বড় বিচিত্র —'প্রেরিত তেঁতুল'। বোধ হয় রাজকুমার শুধু ন্যায়রত্নই ছিলেন না, রসিকরত্নও ছিলেন। পুস্তিকাখানির বিচিত্র নামকরণের হেতু নির্ণয় করে রসিক চূড়ামণি বলেছেন, "যাঁহারা সাগরের রসাস্বাদন করিয়া বিকৃত ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃত ভাবস্থ করিবার নিমিত্ত এই তেঁতুল প্রেরিত হইল বলিয়া 'প্রেরিত তেঁতুল' নামে গ্রন্থের নাম নির্দিষ্ট হইল।" অবশ্য শকুন্তলা নাটকের বিদূষকের উক্তির মতো "জহ

"কস্‌স বি পিণ্ড খজ্জুরেহিং উবেবইদস্‌স অহিলাসো হোইত্তহু", স্থায়রত্ন এই বরিশালী-তিন্তিড়ীর দ্বারা পিণ্ড-খেজুর খাওয়া জিহ্বার অসাড়তা দূর করতে চেয়েছিলেন বোধ হয়। কিন্তু তিনি জীমূতবাহনের দায়ভাগ উত্থাপন করলেও এর গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন বলে মনে হয় না। বিদ্যাসাগর এ অকিঞ্চিৎকর রচনাটির প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন নি। এর পর মুর্শিদাবাদনিবাসী গঙ্গাধর রায় কবিরাজ কবিরত্নের "বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়" উল্লেখযোগ্য। ইনিও নানা শাস্ত্র উল্লেখ করে বহুবিবাহ শাস্ত্রবিহিত প্রমাণের চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে কবিরত্ন-কবিরাজের বিশেষ অধিকার ছিল না। ফলে তিনি অনেক স্থলে মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি।[৬১] কবিরত্নের অনেক সিদ্ধান্ত মাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিরও হাস্যোদ্রেক করে। বিদ্যাসাগর দু'এক স্থলে সরস পরিহাসে কবিরাজ মহাশয়কে আপ্যায়িত করেছেন। সর্বশেষে ঈষৎ অম্লাক্ত মন্তব্য করে ("চিকিৎসা বিষয়ে কিরূপ বলিতে পারি না ; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র নাড়ীজ্ঞান নাই", পৃঃ ২৬৬)[৬২] বিদ্যাসাগর অল্প কথায় ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে পল্লবগ্রাহী কবিরাজের যুক্তির দুর্বলতা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন। উক্ত প্রতিবাদী বিচারবিতর্কের স্থলে লঘু সুর আমদানি করেছিলেন ;

৬১. এবিষয়ে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন, "কবিরত্ন মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী নহেন ; সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসায় বদ্ধপরিকর হইয়া, তিনি কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা অনুমান করা দুরূহ ব্যাপার নহে।" (বি. র. ৪র্থ, পৃঃ ২৪০)

৬২. নানা কারণে বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র কিছু প্রতিকূল ছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' (১২৮০, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর-ব্যবহৃত এই জাতীয় তীব্র ভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, "বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে ভদ্রসমাজে বিচার চলিতে পারে না।" (দ্রষ্টব্য : অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের 'বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর', চতুষ্কোণ, ১৩৭৫ ভাদ্র)

বিদ্যাসাগর দু'এক স্থলে মৃদু রসিকতার সহাস্য আঘাতের দ্বারা তা চমৎকারভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর চতুর্থ প্রতিবাদী ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন 'বহুবিবাহবিষয়ক বিচার' পুস্তিকায় অনেকটা সংযতভাবে বিদ্যাসাগরের মতের প্রতিবাদ করেছেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ বা জয়পরাজয় ধরনের কোন অহমিকা তাঁর ছিল না। শুধু শাস্ত্রার্থ অবগতির জন্যই তিনি বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। এইজন্য বিদ্যাসাগর তাঁর মতামত না মানলেও তাঁর প্রতি কোনওরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি।[৬৩] উপসংহারে তিনি এই সুদৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করেন, শাস্ত্রকারগণ এমন নৃশংস ছিলেন না যে, পুরুষকে যথেচ্ছা বিবাহের বিধান দেবেন। তিনি বহু শাস্ত্র অনুশীলন করে দেখেছেন যে, শিষ্টজনের একপত্নীত্বই ছিল সাধারণ রীতি। রাজা বা প্রধানেরা কোন কোন সময়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে বহুপত্নী গ্রহণ করতেন বটে, কিন্তু তা ছিল সবলের যথেচ্ছাচার, কামভোগীর রিরংসাবৃত্তি উপশমের সামাজিক সীলমোহর। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর এইভাবে শাস্ত্রার্থ উপস্থাপিত করেছেন, "তাঁহারা (শাস্ত্রকারগণ) পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্মপত্নী শব্দে, আর কামোপশমনের নিমিত্ত, অনন্তর পরিণীতা অসবর্ণা ভার্য্যাকে কামপত্নী শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্র অনুসারে, ধর্ম্মপত্নী গৃহস্থকর্ত্তব্য যাবতীয় লৌকিক বা পারলৌকিক বিষয়ে সহাধিকারিণী, কামপত্নী কেবল কামোপশমনের উপযোগিনী; সুতরাং শাস্ত্রকারেরা কামপত্নীকে উপপত্নী বিশেষ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন।" (বি. র. ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৬৯)

বিদ্যাসাগর নারীজাতির কল্যাণের জন্য বহুবিবাহ নিরোধার্থে রাজ-

৬৩. স্মৃতিরত্ন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলেছেন, "স্মৃতিরত্ন মহাশয় অতিশয় ধীর স্বভাব, অন্যান্য প্রতিবাদী মহাশয়দিগের মত, উদ্ধত ও অহমিকাপূর্ণ নহেন। তাঁহার পুস্তকের কোনও স্থলে, ঔদ্ধত্য প্রদর্শ বা গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে, যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন।" (বি. র. ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮৯)

বিধির সাহায্য চেয়েছিলেন, কিন্তু তা পান নি। উপরন্তু বহু ব্যক্তির কাছ থেকে সময়ে-অসময়ে কটূক্তি লাভ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করব। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহনিষেধক দ্বিতীয় গ্রন্থের বিরুদ্ধে কলম শাণিয়ে 'বঙ্গদর্শনে' (১২৮০, ৩য় সংখ্যা) 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগরের তিরোধানের পরেও তিনি 'বিবিধপ্রবন্ধে' (২য়) ঐ প্রবন্ধটি সংযোজিত করেন, অবশ্য তীব্র কটূক্তির বহর কিছু কমিয়ে দেন। বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে ধৃতাস্ত্র বিদ্যাসাগরের যোদ্ধৃবেশ দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যকর ডন কুইকজোটের কথা মনে পড়েছিল—"বহুবিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডন কুইক্সোটকে মনে পড়িবে" (বিবিধপ্রবন্ধ, ২য়)। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, বহুবিবাহ কালগতিকে আপনিই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং মুমূর্ষুর গায়ে আর বৃথা অস্ত্রক্ষেপের প্রয়োজন কি? এ ছাড়াও তিনি বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনার অভিযোগও এনেছিলেন। হুগলী জেলা থেকে বিদ্যাসাগর কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের যে তালিকা তাঁর প্রথম গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তার সততায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য "আমাদিগের স্মরণ হয় হুগলী জেলায় যত গুলিন বহুবিবাহপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে তাঁহাদিগের তালিকা দিয়াছেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে, কেহ কেহ বলেন যে, মৃত ব্যক্তির নাম সন্নিবেশ দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে দুই একটির কথা সবিশেষ জানি, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই" (বিবিধপ্রবন্ধ, ২য়)। এখানে তিনি স্পষ্টতঃ বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অনৃতাচারের অভিযোগ এনেছেন, আইনের ভাষায় যাকে বলতে পারি perjury। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যখন এমন অভিযোগে কর্ণপ্রদান করেছিলেন তখন 'অন্যে পরে কা কথা'।

কেউ কেউ বলেন যে, বিদ্যাসাগর প্রগতিশীল মনোভাবের বশে সমাজ সংস্কারের ইচ্ছায় এই সমস্ত কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন।[৬৪] কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের (এমন কি, রামমোহনেরও) সংস্কারের আদর্শ আর বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-বহুবিবাহ-সংক্রান্ত আন্দোলনের আদর্শ এক নয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সমাজসংস্কারকে নীতিবোধ ও ঔচিত্য-বোধের দ্বারা বিচার করেছেন—বুদ্ধি যেখানে সজাগ্র প্রহরী। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সর্ববিধ সমাজসংস্কারের মূল প্রেরণা বুদ্ধি নয়, হৃদয়। এইজন্য ভাবাবেগের বশে কোন কোন সময়ে তিনি আন্দোলনের কারণ ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে ততটা সচেতন ছিল না। উপরন্তু মনে করেছিলেন, বহুবিবাহ শাস্ত্রমতে আবশ্যিক কর্তব্য নয়, এ কথার প্রমাণ দিলেই বিদ্বজ্জন তাঁর যুক্তি বুঝবেন এবং তাঁকে সমর্থন করবেন। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, বাংলা দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ইতর-ভদ্র—সকলেই সংস্কারের দাস, শাস্ত্র-প্রমাণ বা যুক্তির আবেদন এদের কাছে নিষ্ফল। সে যাই হোক, তাঁর যুক্তি ও প্রামাণিকতা, তারানাথ তর্কবাচস্পতি বা সত্যব্রত সামশ্রমীর তুলনায় যে অনেক বেশী ঘাতসহ তা স্বীকার করতে হবে। 'পলেমিক' রচনা হিসেবে তাঁর এই গ্রন্থ দু'খানি রামমোহনের সমধর্মী, কোথাও কোথাও রামমোহনের অপেক্ষাও সার্থক হয়েছে।

৬৪. "বিদ্যাসাগর এই ঐতিহাসিক আবশ্যকতাবোধ থেকেই সংস্কারকর্মে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন।" বিনয় ঘোষ—'বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ', ১ম, পৃঃ ৭৫

পঞ্চম অধ্যায়

মৌলিক রচনা

১.

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, শিক্ষাপ্রচার, সমাজসংস্কার, অনুবাদকর্ম ও বিতর্কমূলক আলোচনায় বিদ্যাসাগরের আয়ুষ্কালের প্রায় সবটাই অতিবাহিত হয়েছে। বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির কোন অপার্থিব প্রেরণা এই মানববাদী কর্মযোগীর হৃদয়ে স্থান পায় নি, উপযোগবাদের বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর লেখনী পরিচালিত হয়েছে। অথচ তাঁর এমন কয়েকটি ছোটখাট রচনা আছে, যার থেকে মৌলিক চিন্তা ও শিল্পরসের বিচিত্র আস্বাদ পাওয়া যায়। জীবনসংগ্রামে ও লোককল্যাণে অতন্দ্র-ভাবে নিযুক্ত বিদ্যাসাগরের জীবনে অবসর ছিল বড় অল্প। ফলে সামর্থ্য থাকলেও তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টির বিশেষ কোন সুযোগ পান নি; মৌলিক চিন্তাশক্তির অমিত অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সময়াভাবে তিনি অসাধারণ মনস্বিতার সব পরিচয়টুকু আমাদের দিয়ে যেতে পারেন নি—এ আমাদের নিষ্ফল ক্ষোভ, এ আমাদের ঐতিহ্যের অপূরণীয় ক্ষতি। মননশীলতার যে গৌরব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতীকপুরুষে পরিণত করেছে, বিদ্যাসাগরের তাতে ছিল সমান অধিকার। কিন্তু এই মহাপুরুষের দক্ষিণপাণির সে দাক্ষিণ্য আমরা অঞ্জলি পেতে নিতে পারি নি। তাঁর মহত্ত্বকে আমরা পদে পদে খণ্ডিত করেছি, এই মিত্রোত্তমকে আমরা নির্লজ্জ শত্রুতার দ্বারা অভ্যর্থনা করেছি। ফলে সারা জীবন তাঁকে মূঢ় প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে, প্রচারপুস্তিকায় বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করতে হয়েছে। এ কারণে তাঁর মৌলিক রচনা ক্রমেই মুষ্টিমেয় হয়ে পড়েছে। অনেক উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, ভারতবর্ষের একখানি

ইতিহাস লিখবারও পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল, কাজ-অকাজের গুরুভারও তাঁর রোগজর্জর দেহকে ক্ষীণায়ু করে তুলেছিল। সময় নেই, স্বাস্থ্য নেই। নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধেও যে দু'চার কথা লিখে যাবেন, তারও অবকাশ জুটল না, আত্মকথার কয়েক পৃষ্ঠা লিখেই পুঁথিতে ডোর দিলেন। প্রয়োজনের আশু তাগিদে বিদ্যাসাগর এতই ব্যাপৃত ছিলেন যে, তাঁর বিশেষ কোন মৌলিক রচনা সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এই ধরনের যেটুকু রচনা সংগৃহীত হয়েছে এখানে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।পাঠক-পাঠিকারা দেখবেন, এ রচনা নিতান্ত মুষ্টিমেয়—কিন্তু স্বর্ণমুষ্টি।

২.

'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) তাঁর প্রথম মৌলিক ও স্বাধীন রচনা—কোন গ্রন্থের অনুবাদ নয়। যাঁরা বিদ্যাসাগরকে শুধু অনুবাদকরূপে দেখতে অভ্যস্ত তাঁরা এই পুস্তিকা থেকে তাঁর পরিচ্ছন্ন স্বাধীন রচনার নমুনা পাবেন। আজও আমরা যে সাধু গদ্যরীতি ব্যবহার করে থাকি, এই পুস্তিকায় তারই পূর্বসূচনা দেখা যাবে।

এই পুস্তিকা একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনার এই বোধ হয় প্রথম প্রচেষ্টা। দ্বিতীয়তঃ এর থেকে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে বিদ্যাসাগরের অভিমত ও সিদ্ধান্ত জানা যাবে। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' বিদ্যাসাগর প্রদত্ত একটি বক্তৃতার বর্ধিত রূপ। বেথুন সোসাইটিতে তিনি এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, পরে তাকেই কিছু সম্প্রসারিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

ভারতপ্রেমিক ও বাঙালীর সুহৃদ্ জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (বীঠন) সায়েবের মৃত্যু হয় ১৮৫১ সালে ১২ই আগস্ট। তাঁর

অনুরাগী দেশীয় ও বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তৎকালীন কাউন্সিল অব এডুকেশনের সম্পাদক ডঃ এফ. জে. মৌয়াট সায়েবের নেতৃত্বে ১৮৫১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে মিলিত হয়ে মৃত মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি আলোচনা-চক্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এরই নাম বেথুন সোসাইটি। এতে স্থির হয় যে, এই সংস্থায় বাংলা, উর্দু ও ইংরেজী—এর যে কোন একটি ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হবে। পাঁচজন ইংরেজ এবং উনিশ জন বাঙালীকে নিয়ে গঠিত এই সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র—এবং আরও অনেকে। একাদিক্রমে প্রায় চল্লিশ বৎসর এই সমিতি চলেছিল। এর মাসিক অধিবেশনে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি পড়তেন ; তার কিছু কিছু সমিতির মুখপত্রে প্রকাশিত হত। এই সমিতির প্রথম মাসিক অধিবেশনে (১৮৫২ সালের ৮ই জানুয়ারী) ডাঃ সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী ইংরেজীতে কলকাতার পৌর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন। কবি রঙ্গলালের বাংলা কবিতা বিষয়ক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ সমিতির আর এক মাসিক অধিবেশনে পঠিত হয়।[১]

বেথুন সোসাইটির কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর মাসিক অধিবেশনে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১. ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে রামবাগানের দত্তবংশের হরচন্দ্র দত্ত বাংলা সাহিত্যকে নিন্দা করে সমিতির অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে রঙ্গলাল পরবর্তী অধিবেশনে বাংলা সাহিত্যের গুণ ব্যাখ্যা করে আর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এটি পরে 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

কেউ কেউ মনে করেন, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এই প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ পড়েছিলেন।[২] কিন্তু ১৮৫৩ সালের ১২ই মার্চ 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত সংবাদে এ রকম কোন উল্লেখ নেই। যথা ঃ

> "বীটন সভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহশয় সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব প্রতিষ্ঠাসন্দীপনমূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিপিনৈপুণ্য এবং সংস্কৃত বিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই, যে সকল মহাশয়েরা সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।"

সুতরাং বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাতেই প্রবন্ধটি পড়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সমিতিতে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে একাধিক-বার আলোচনা হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের পূর্বেই রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এর পরেও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'প্রাচীন ভারতবর্ষের লিপি ও সংস্কৃত অক্ষরমালা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন। বেথুন সোসাইটি দীর্ঘ দিন অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। ১৮৮১ সালের ১৯শে এপ্রিল মাসিক অধিবেশনে যুবক রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সংযোগে 'গান ও ভাব' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন রেভাঃ কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে প্রবন্ধ পড়া শেষ করতে হবে বলে বিদ্যাসাগর খুব সংক্ষেপে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন। মুদ্রিত পুস্তিকাটির কিছু সংস্কৃত শ্লোক বাদ দিলে এটি পড়তে ঘণ্টাখানেক সময় লাগতে পারে। এতে তিনি সংক্ষেপে পৌরাণিক অর্থাৎ ক্লাসিকাল যুগের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, শ্রোতাদের কাছে তা অতি উপাদেয় মনে হয়েছিল। কারণ তখন পাশ্চাত্ত্য দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের কালপর্যায় ও বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে

২. বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর (৪র্থ সংস্করণ), পৃ. ২৭০ (পাদটীকা)

আলোচনা শুরু হলেও এদেশে দেশীয় ভাষায় এ জাতীয় বিশেষ কোন আলোচনা হয় নি। তাই শ্রোতৃবৃন্দ বিদ্যাসাগরকে এই প্রস্তাব মুদ্রিত করতে অনুরোধ করলেন। বেথুন সোসাইটির সভাপতি ডাক্তার মৌয়াট সায়েবের অনুমতি অনুসারে তিনি প্রথমে দু'শ পুস্তিকা মুদ্রিত করে বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। এই পুস্তিকার প্রথম সংস্করণ আমরা দেখি নি। অনুমান হয়, তাঁর গোটা বক্তৃতাটাই মুদ্রিত হয়েছিল। এর পর সর্বসাধারণের জন্য দ্বিতীয় বার মুদ্রণের সময় প্রথম মুদ্রণের কপিটি অবিকল মুদ্রিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই সময় অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ভাবে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাস লেখার সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু অবকাশের অভাবে তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয় নি। অনেকে বললেন, "এই প্রস্তাব পাঠ করিলে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের উপকার দর্শিতে পারে অতএব ইহা পুনর্মুদ্রিত করা আবশ্যক, তদ্ব্যতিরিক্ত, অন্যান্য লোকেও এই পুস্তক পাঠ করিবার নিমিত্ত, ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন" (২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন)। এইজন্য তিনি বর্ধিতাকারে প্রকাশ না করে "এই প্রস্তাব যথাবস্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত" করেছিলেন। ঠিক সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বলতে যা বোঝায়, তিনি সে পন্থা অবলম্বন করেন নি। 'বিজ্ঞাপনে' সেকথা স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেছেন, "আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এরূপ গুরুতর প্রস্তাব যেরূপ সঙ্কলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক, কোনও রূপেই সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের অন্তর্গত কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ মাত্র হইয়াছে।" বেথুন সোসাইটিতে এক ঘণ্টার মধ্যে পঠিত প্রবন্ধে এর চেয়ে বেশী আলোচনা করা সম্ভব ছিল না।

সন-তারিখ ধরে সাহিত্যের ক্রমিক অগ্রগতি ও বিবর্তন নির্দেশ সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সর্বোৎকৃষ্ট প্রণালী। বিদ্যাসাগরের এই পুস্তিকা প্রকাশের ছয় বৎসর পরে ম্যাক্স ফ্রেডরিক ম্যুলারের *A History of Ancient Sanskrit Literature* (1859) প্রকাশিত

হয়। তারও আগে হোরেস হেম্যান উইলসনের *The Theatre of the Hindus* (1826) প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর সনতারিখ-ঘটিত বিবর্তনের দিকে না গিয়ে প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের রীতিতে পৌরাণিক যুগের সংস্কৃত সাহিত্যকে বিষয়ভেদে শ্রেণীবিন্যাস করলেন। অর্থাৎ সাহিত্যবিবরণীকে chronological না করে topical ভাগ করলেন। এর কারণ বেথুন সোসাইটির সভ্যেরা অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাঁদের কাছে সর্ব-প্রথম সংস্কৃত সদ্‌গ্রন্থের দৃষ্টান্ত দিয়ে এই বিশাল সাহিত্যের প্রতি তাঁদের কৌতূহল আকর্ষণ করাই বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে এর প্রতি শ্রোতাদের চিত্ত আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন।

এই পুস্তিকার প্রথমে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাঁর মতে, "সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সর্ব্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে" (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ২য়, পৃ. ৫)। সেই কথা প্রমাণের জন্য তিনি শিশুপালবধ, নলোদয়, কিরাতার্জুনীয় ও ভট্টিকাব্য থেকে অনুপ্রাস ও যমকের বিচিত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে কাদম্বরী, রঘুবংশ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ থেকে সরল-ললিত-মধুর বাক্‌রীতির উল্লেখ করেছেন। এই দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এদেশের পণ্ডিতদের মতে, এ ভাষা এদেশের "আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা হয়" (বি. র. ২, পৃ. ৫)।[৩] কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, সংস্কৃত-ভাষী লোকেরা সর্বপ্রথম ঈরাণে এসে বসবাস করে ; তার পর সেখান থেকে তাদের কিছু ভারতে, কিছু-বা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।

> "ঐ একজাতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হইয়া হিন্দু, গ্রীক, রোমক, জর্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছেন ; এবং ঐ এক

৩. অতঃপর দেবকুমার বসু সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী' "বি. র." বলে উল্লিখিত হবে।

> ভাষাই ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসে গ্রীক, ইটালিতে লাটিন, জর্মানিতে জর্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল ভাষা এরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, যে, উহাদিগের পরস্পর কোন সম্বন্ধ আছে ইহা আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু এই সমস্ত যে এক মূল ভাষার পরিণাম বিশেষ মাত্র, এ বিষয়ে সংশয় হইবার বিষয় নাই।"
> (বি. র. ২. পৃ. ১২-১৩)

এখানে দেখা যাচ্ছে, তিনি সংস্কৃত ভাষার বিবর্তন ও উৎস সম্বন্ধে অনেকটা ম্যাক্স্‌ম্যুলার-পন্থী। ম্যাক্স্‌ম্যুলার বিদ্যাসাগরের কিছু পূর্বে একখানি গ্রন্থে (*On the Veda and Zend Avesta,* 1847) ভারতীয় আর্যভাষার মূল রূপ যে ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা, তা প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রাচীন ঈরাণ এবং প্রাচীন ভারতের ভাষা, নরগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করে আর্যভাষার মূল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য উপস্থাপিত করেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার যথার্থ স্বরূপ, উৎস, পরিণামঘটিত তাঁর অধিকাংশ আলোচনা বিদ্যাসাগরের এই বক্তৃতার পর প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ সালে তাঁর *Comparative Philology* এবং ১৮৬১-৬৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত *Lectures on the Science of Language*-এ তিনি আদি ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার কথা তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। বিদ্যাসাগরের উক্ত প্রবন্ধ রচনার পূর্বে এ দেশে এ ধরনের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত হয় নি। এখানে তিনি ম্যাক্স্‌ম্যুলার প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত মোটামুটি মেনে নিয়েছেন। গ্রন্থের উপসংহারে তিনি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের অভিমত স্বীকার করে নিয়ে জানিয়েছেন,

> "ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা অন্য অন্য ভাষার মূলনির্ণয়, স্বরূপপরিজ্ঞান ও মর্মোদ্ভেদে সমর্থ হইয়াছেন ; এবং এই পৃথিবী যে নানা মানবজাতির আবাসস্থান, তাহাদের কে কোন

শ্রেণীর অন্তর্গত, কে কোন দেশের আদিম নিবাসী লোক, কে কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া কোন প্রদেশে বাস করিয়াছে; ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু, য়ুরোপীয় শব্দবিদ্যা যাবৎ সংস্কৃত ভাষার সহায়তা প্রাপ্ত হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; এই নিমিত্তই, ডাক্তার মোক্ষমূলর সংস্কৃত ভাষাকে সকল ভাষার ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

(বি. র. ২. পৃ. ৪৫)

এখানে দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের বৈজ্ঞানিক ভাষা-গবেষণা এবং ভাষাতত্ত্বের নবদিগন্ত আবিষ্কারের প্রতি বিদ্যাসাগরও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর মানসিক ঔদার্য বিস্ময়কর। দেবভাষা যে দেবলোক থেকে খসে পড়ে নি, পরন্তু এর পিছনে নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণ রয়েছে এবং সংস্কৃতভাষী নরগোষ্ঠী বহির্ভারত থেকে ব্রহ্মাবর্তে পদার্পণ করেছিলেন, অষ্টাদশ-উনিশ শতকের ভারততাত্ত্বিক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের এই অভিমত বিদ্যাসাগর মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

ভাষাতত্ত্বের যে সমস্ত প্রমাণের বলে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর আত্মীয়তার সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তার সমস্ত সংবাদই রাখতেন এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যৌক্তিকতাও স্বীকার করতেন। কিন্তু সেই সমস্ত পারিভাষিক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য তখনও বাংলাভাষা যথেষ্ট উপযোগী হয় নি বলে তিনি য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তটুকু গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের যুক্তির ধারা বিস্তারিত আকারে বিশ্লেষণ করেন নি। *

এর পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের অলঙ্কারগ্রন্থসম্মত শ্রেণী ও তার দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর অবলম্বিত ঐতিহাসিক-কাল হল মোটামুটি পৌরাণিক বা ক্লাসিকাল যুগ থেকে জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচনাকাল পর্যন্ত। অবশ্য তিনি বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ,

রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে কিছু বলেন নি; বেদ থেকে রামায়ণ-মহাভারত রচনার কাল, অর্থাৎ প্রাক্-পৌরাণিক যুগকে আলোচনা থেকে বাদ দিয়ে শুধু পৌরাণিক যুগের সংস্কৃত কাব্যনাট্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বোধ হয় প্রাক্-পৌরাণিক কালের সাহিত্যাদি বেথুন সোসাইটির সভ্যবৃন্দের তত্তটা রুচিকর হবে না অনুমান করে তিনি অপেক্ষাকৃত পরিচিত কবি ও গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলেন।

য়ুরোপীয় রীতিতে সাহিত্যের ইতিহাস লেখার প্রণালী বিদ্যাসাগর তাঁর বক্তৃতায় অনুসরণ করেন নি। কালিক বিবর্তনের চেয়ে এ সাহিত্যের বিশেষ-বিশেষ শ্রেণী ধরে আলোচনাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের মতো তিনি পৌরাণিক যুগের সংস্কৃত সাহিত্যকে প্রধানতঃ দু'ভাগে (শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য) বিভক্ত করেন। এর পর তিনি শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্যকেও বিভিন্ন শ্রেণী-উপশ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এর পর এই যুগের শ্রব্যকাব্যকে এই ভাবে বিভক্ত করা হয়: (১) মহাকাব্য, (২) খণ্ডকাব্য, (৩) কোষকাব্য, (৪) গদ্যকাব্য, (৫) চম্পূকাব্য। দৃশ্যকাব্য ছয়ভাগে বিভক্ত: (১) কালিদাস, (২) ভবভূতি, (৩) শ্রীহর্ষ, (৪) শূদ্রক, (৫) বিশাখদেব, (৬) ভট্টনারায়ণ। উপাখ্যানের মধ্যে (১) পঞ্চতন্ত্র ও (২) হিতোপদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সনতারিখঘটিত বিবর্তনের চেয়ে তিনি বিভিন্ন-শ্রেণীর সংস্কৃত কাব্যনাট্যের পরিচয় দিতে অধিকতর উৎসুক হয়েছিলেন। ইতিহাসে তাঁর যেরকম নিষ্ঠা ও আকর্ষণ ছিল, তাতে তিনি ইচ্ছা করলে সনতারিখ ও যুগ ধরে ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনা করতে পারতেন। কিন্তু বেথুন সোসাইটির একঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় তিনি সনতারিখ ও যুগবিভাগ ছেড়ে দিয়ে সাধারণ শ্রোতার কাছে সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব রত্নভাণ্ডার তুলে ধরেছিলেন। কারণ সে সভার শ্রোতারা সমাজের বিখ্যাত ও জ্ঞানীগুণী হলেও সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন না। অবশ্য বিদ্যাসাগর ক্লাসিকাল

যুগের পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি-সংহিতা ও ষড়দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি, শুধু ইঙ্গিত দিয়েছেন। বক্তৃতার জন্য নির্দিষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে সে সমস্ত আলোচনার অবকাশ ছিল না। এইজন্য বক্তৃতাটি তিনি প্রথমে মুদ্রিত করতে চান নি। তিনি মনে করেছিলেন যে, এই অতি ক্ষুদ্র "অসম্যক্ সঙ্কলিত প্রস্তাব পুনর্মুদ্রিত" না করে "প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক এক প্রস্তাব রচনা" করে প্রকাশ করবেন। কিন্তু নানা কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্য এবং অবকাশ না থাকার জন্য বক্তৃতাটাই তিনি প্রকাশ করেন। মনে হয়, তিনি পরে বিস্তারিত আকারে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লিখবার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকার জন্য তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয় নি। বাংলা সাহিত্যও সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এই পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকের জন্য পৌরাণিক যুগের বিখ্যাত কবি ও নাট্যকারের গ্রন্থের সমালোচনামূলক পরিচয় দিয়ে এর প্রতি সাধারণের প্রাথমিক কৌতূহল সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। অবশ্য কাব্যপরিচয় প্রসঙ্গেই তিনি সর্বদা অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলেন নি, নিজের যুক্তি-বুদ্ধি অনুসারে অধিকাংশ সময় বিচার-বিশ্লেষণ চালিয়েছেন এবং প্রয়োজনবোধে কোন কোন স্থলে সংস্কৃত কাব্য-নাট্যের প্রখর সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হন নি। মহাকবিদের মধ্যে কালিদাসকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন এবং তাঁকে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম বলে গ্রহণ করে তাঁর কাল সম্বন্ধে বলেছেন, "সুতরাং উনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন" (বি. র. ২. পৃ. ১৫)। কালিদাসের শকুন্তলা সম্বন্ধে তিনি সবচেয়ে বেশী স্তুতিবাদ করেছেন। তাঁর মতে "কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল অলৌকিক পদার্থ" (ঐ, পৃ. ৩৬)। মাইকেল মধুসূদন যে দৃষ্টিতে মিল্টনকে দেখতেন (মাইকেলের মতে, "Milton is divine") কালিদাসের প্রতি বিদ্যাসাগরেরও সেই জাতীয় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল।

তিনি উইলিয়ম জোন্‌স্‌ কৃত শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদের বিশেষ প্রশংসা করতেন। ফস্টর ইংরেজী শকুন্তলার জর্মান অনুবাদ করেছিলেন। সেই জর্মান অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ গ্যয়ঠে শকুন্তলা নাটক সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তার ইংরেজী অনুবাদ অনেকেরই জানা আছে :

Wouldst thou the young year's
Blossoms and the fruits of its decline,
And all by which the soul is
Charmed, enraptured, feasted, fed ?
Itself in one sole name combine ?
I name thee, O Sakoontola ! and
All at once is said.

বিদ্যাসাগর গ্যয়ঠের ইংরেজী অনুবাদকে এইভাবে বাংলায় অনুবাদ করেছেন :

"যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে ; তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুন্তল ! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি ; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।" (বি. র. ২য়. পৃ. ৩৬)[৪]

কালিদাসের কাব্য ও নাটকের বিশেষ প্রশংসা করলেও বিদ্যাসাগর কোন কোন সংস্কৃত কবির যুক্তিপূর্ণ সমালোচনাও করেছিলেন। শিশু-পালবধের তিনি নানা দোষ ত্রুটি দেখিয়েছেন। নৈষধচরিত, ভট্টিকাব্য, রাঘব-পাণ্ডবীয় প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য এখনও নিপুণ

৪. রবীন্দ্রনাথ গ্যয়ঠের এই উক্তিকে খুব সংক্ষেপে এইভাবে অনুবাদ করেছেন : "কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।" (প্রাচীন সাহিত্য'— "শকুন্তলা")

সমালোচনা বলে গৃহীত হতে পারে। নৈষধচরিতের অনেক স্থান পাঠ করে যে, 'অসন্তুষ্ট' ও 'বিরক্ত' (বি. র. ২. পৃ. ২৩) হতে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টই অপ্রসন্নতা ব্যক্ত করেছেন। ভট্টিকাব্য-কার শুধু ব্যাকরণের দৃষ্টান্ত দেবার জন্যই কাব্য লিখেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য খুব যুক্তিপূর্ণ, "কিন্তু ব্যাকরণীয় উদাহরণ প্রদর্শন গ্রন্থ-কর্তার যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করা তাদৃশ উদ্দেশ্য ছিল না" (বি. র. ২. পৃ. ২৪)। জয়দেবের গীতগোবিন্দের তিনি উচ্চ প্রশংসা করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর মতে জয়দেবের রচনাচাতুরী অসাধারণ হলেও "কবিত্বশক্তি তদনুযায়িনী" (ঐ, পৃ. ২৫) নয়। জয়দেবকে তিনি ভক্ত বৈষ্ণবকবি বলেই গ্রহণ করেছিলেন, "জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন, এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগসহকারে বৈষ্ণবদিগের পরম দেবতা রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন" (ঐ. পৃ. ২৫)। কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের কথা, জয়দেব যে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন একথা বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেন নি। কারণ জয়দেবের কাল নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "জয়দেব কোন্ সময় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহার নিশ্চয় হওয়া দুর্ঘট" (ঐ. পৃ. ২৬)।

গদ্যকাব্যের মধ্যে বিদ্যাসাগর বাণভট্টের কাদম্বরীর উচ্চ প্রশংসা করেছেন, "বোধ হয় কোনও দেশের কোনও কবি তদপেক্ষা অধিক মনোহর রচনা বা বর্ণনা করিতে পারেন নাই" (ঐ. পৃ. ৩১)। কিন্তু সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে এই অপূর্ব আখ্যানেরও কতকগুলি ত্রুটি দেখিয়াছেন। বাণের শব্দশ্লেষ ও বিরোধাভাসকে ভারতের পুরাতন আমলের পণ্ডিতেরা উচ্চ প্রশংসা করলেও তিনি এই সমস্ত বাকচাতুরীকে এবং "দীর্ঘ সমাসঘটিত অতি দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্যকে" দুরূহ ও নীরস বলতেও কুণ্ঠিত হন নি (ঐ, পৃ. ৩১)। দশকুমারচরিত সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, এর "উপাখ্যানভাগ এমন অসার ও অকিঞ্চিৎকর যে পাঠ করিলে পরিশ্রম পোষায় না" (ঐ. পৃ. ৩২)। নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরতমুনির অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তাঁর সন্দেহ ছিল—"এরূপ নাট্যাচার্য

যে কোনকালেই বিদ্যমান ছিলেন না, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না।" তাঁর মতে তন্ত্রগুলির অধিকাংশই অর্বাচীন কালের রচনা। কারণ "কোনও কোনও তন্ত্রে ইংরেজদিগের ও লণ্ডন নগরের নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়" (ঐ, পৃ. ৩৫)।[৫]

বিদ্যাসাগর দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ নাটক প্রসঙ্গে কালিদাসের সর্বোচ্চ প্রশংসা করেছিলেন তা আমরা পূর্বেই বলেছি। অবশ্য ভবভূতিকেও তিনি যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন, কিন্তু এই কবির "নাটকের কথোপকথন স্থলে সেরূপ দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দূষ্য" (ঐ. পৃ. ৩৭)। তাঁর মতে নাটকের ভাষা সংলাপের ধরনে লঘু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শকুন্তলার শ্রেষ্ঠত্ব তার আদিরসে, উত্তরচরিতের শ্রেষ্ঠত্ব করুণরসে। "এই নাটক (উত্তরচরিত) পাঠ করিলে মোহিত হইয়া ও অশ্রুপাত করিতে হয়" (ঐ, পৃ. ৩৮)। উত্তরচরিতের করুণরসের জন্য ও সীতাচরিত্রের প্রতি আকর্ষণের জন্য কিছুকাল পরে বিদ্যাসাগর এই নাটকের কাহিনীর কিয়দংশের ওপর ভিত্তি করে 'সীতার বনবাস' রচনা করেছিলেন। করুণরসের প্রতি তাঁর এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল যে, তিনি উত্তর-চরিতকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। স্বয়ং নাট্যকার ভবভূতি তাঁর 'মালতী-মাধব'কেই সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক মনে করতেন। প্রস্তাবনাতে তিনি সদম্ভে বলেছেন :

> যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
> জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈব যত্নঃ।
> উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
> কালোহ্যয়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী ॥

যারা আমার এই নাটকের প্রতি অবজ্ঞা দেখায় তারাই তার কারণ

৫. পূর্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্তিতাঃ
ফিরঙ্গ ভাষয়া তন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাদ্ভুবি।
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ
ইংরেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ড্রাজশ্চাপি ভাবিনঃ ॥ (মেরুতন্ত্র, ২৩ প্রকাশ)

জানে, তাদের জন্য আমার এ যত্ন নয়। আমার কাব্যের বোদ্ধা কোনও লোক এই অসীম ভূমণ্ডলের কোনও স্থানে থাকতে পারে, অথবা কোনও কালে জন্মাতেও পারে।

ভবভূতি 'মালতীমাধব' সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন, তাঁর এই নাটক "কালিদাসের শকুন্তলা, শ্রীহর্ষদেবের রত্নাবলী এবং তাঁহার নিজের উত্তর-চরিত অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূন।" (ঐ, পৃ. ৩৮) 'মৃচ্ছকটিক' যে অতি প্রাচীন নাটক, এমন কি বিদ্যাসাগরের মতে এ নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের সব চেয়ে পুরাতন নাটক, তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

উপাখ্যান ও নীতিকথা হিসেবে তিনি 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ'-এর উল্লেখ করেছেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন যে, পঞ্চতন্ত্রের আখ্যান ঈরাণ, আরব এবং য়ুরোপের নানাদেশের আখ্যানকে প্রভাবিত করেছিল—বিদ্যাসাগর সে কথার উল্লেখ করে নীতি-আখ্যান-বিষয়ক এই গ্রন্থগুলির সাহিত্যমূল্য বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু সাহিত্য-হিসেবে তিনি অতিখ্যাত গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করতে পারেন নি, পঞ্চতন্ত্র সম্বন্ধে তিনি অসঙ্কোচে বলেছেন, 'রচনার মাধুর্য্য নাই, কথা যোজনার চাতুর্য্য নাই ; অধিকন্তু, মধ্যে মধ্যে বহুতর অসার ও অসম্বদ্ধ কথা আছে। বোধ হয় কোনও বিশেষ গুণ নাই বলিয়াই পঞ্চতন্ত্র একান্ত উপেক্ষিত হইয়া আছে" (ঐ, পৃ. ৪৩)। হিতোপদেশের মধ্যেও তিনি অনেক অসংলগ্নতা নির্দেশ করেছেন। আর এক প্রসঙ্গে তিনি হিতোপদেশের লেখকের কঠোর সমালোচনা করেছেন, "গ্রন্থকর্তা লিখিয়াছেন, উপাখ্যানচ্ছলে বালকদিগকে নীতি-উপদেশ দিতেছি। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আদিরসসংঘটিত এক একটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি বুঝিয়া, গ্রন্থকর্তা ঐ সকল অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন করিলেন বলিতে পারা যায় না" (ঐ. পৃ. ৪৩)।

পরিশেষে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন সম্বন্ধে বলেছেন যে, সংস্কৃত ভাষা না জানলে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা ইন্দোয়ুরোপীয় মূল

জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্ধকারেই থেকে যেতেন। "ডাক্তর মোক্ষমূলর সংস্কৃত ভাষাকে সকল ভাষার ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন" (ঐ, পৃ. ৫৫)। তার কারণ, এ ভাষাই আদি ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার প্রাণকেন্দ্র। আরও একটি কারণে তিনি সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের প্রয়োজন বোধ করেছেন। বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার সম্যক উন্নতির জন্য "ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা" না নিলে এই সমস্ত প্রাদেশিক ভাষা ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন হতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে তাঁর আরও একটি কথা স্মরণীয়। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের জন্য উৎসাহী হলেও একথা স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, সাধারণ ভারতবাসী "বিদ্যানুশীলনের ফল-ভোগী" না হলে তাদের অন্তর থেকে কুসংস্কারকে সমূলে উন্মূলন করা যাবে না। একথাও তিনি জানতেন, "হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে সর্ব্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন স্পষ্টই হওয়া সম্ভব নহে" (ঐ, পৃ. ৪৫)। প্রাদেশিক লোকভাষা ভিন্ন জনসাধারণের কল্যাণ নেই—আজ থেকে এক'শ বছরেরও আগে বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন। প্রাদেশিক ভাষাকে সর্ব-কর্মক্ষম করে তুলবার জন্যই সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুশীলনের প্রয়োজন—এটাই হল তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত। অবশ্য ইংরেজীর উপযোগিতা সম্বন্ধেও তিনি অন্ধ ছিলেন না—"ইয়ুরোপীয় কোন ভাষা হইতে পুরাবৃত্ত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি ঐ সকল প্রচলিত ভাষায় সঙ্কলিত হওয়া অত্যাবশ্যক" (ঐ, পৃ. ৪৫)। য়ুরোপীয় ভাষা থেকে জ্ঞানের কথা সংগ্রহ করে মাতৃভাষায় নিবদ্ধ করতে হবে, তাঁর এ মন্তব্য যথেষ্ট প্রগতিশীল বলে গৃহীত হতে পারে।

বিদ্যাসাগর তাঁর পুস্তিকায় দুঃখ করে বলেছেন, সংস্কৃত ভাষায় যথার্থ পুরাবৃত্ত নেই, একমাত্র কাশ্মীর-রাজদের কাহিনী-সংক্রান্ত 'রাজ-তরঙ্গিণী'ই (কহ্লণ বিরচিত) কথঞ্চিৎ ইতিহাসের মর্যাদা দাবী করতে পারে। কিন্তু সে পুরাবৃত্ত "সর্ব্বসাধারণ লোক-সংক্রান্ত নহে।" কারণ

তাতে শুধু রাজবংশের উত্থানপতনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই মন্তব্যে দেখা যাচ্ছে, যথার্থ ইতিহাস কাকে বলে, সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আধুনিক ইতিহাস-দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন, "কে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কে কতদিন রাজ্য-শাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন, কে কোন সময়ে সিংহাসনভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, কে কাহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া স্বীয় ক্ষমতাতে রাজ্যাস্পদ অধিকার করিয়াছিলেন ; এইরূপ কেবল রাজাদিগের বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে" (ঐ, পৃ. ৪৫-৪৬)। সুতরাং তাঁর মতে 'রাজতরঙ্গিণী'-তে যাও বা ছিটেফোঁটা ইতিহাসের তথ্য আছে, তাও শুধু রাজবংশ-সংক্রান্ত। তার সঙ্গে প্রজাসাধারণের ইতিবৃত্তের কোন যোগাযোগ নেই। তাই ভারতের জনজীবনের পৌরাণিক যুগের যথার্থ ইতিহাস খুঁজতে হলে বেদ-পুরাণ, স্মৃতি-দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যেই তার সন্ধান করতে হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে, রাজবৃত্তকে তিনি যথার্থ ইতিবৃত্ত বলে স্বীকার করতে চান নি। তাঁর মতে, লোকবৃত্তই প্রকৃত ইতিহাস এবং সে সকল তথ্য সংস্কৃত গ্রন্থ থেকেই জানা যাবে। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত অনেকটা আধুনিক কালের অনুগত।

'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে' বিদ্যাসাগর পৌরাণিক যুগের প্রধান প্রধান কবি ও গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে পুরাতনের প্রতি মোহ ত্যাগ করে নিজস্ব যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি অলঙ্কার-শাস্ত্রীদের পুচ্ছাগ্রভাগ ধারণ করে পূর্বসূরীদের খনিত পথে যাত্রা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি, বরং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রতি অধিকতর অনুরক্তি দেখিয়েছেন, এবং এদেশের রক্ষণশীল ও অযৌক্তিক পুরাতন পাণ্ডিত্যের প্রতি কোন কোন সময়ে ঈষৎ ব্যঙ্গ ও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। 'রঘুবংশ'-এর মতো "আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর" (ঐ, পৃ. ১৫) কাব্যকেও এদেশের পণ্ডিতবর্গ অনেক সময় বিশেষ শ্রদ্ধা করেন না বলে বিদ্যাসাগর এঁদের ব্যঙ্গোক্তি করে বলেছেন,

"কিন্তু এতদ্দেশীয় সংস্কৃত ব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে, সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকেন" (ঐ, পৃ. ১৫)। পুরাণগুলি সাধারণ পণ্ডিতসমাজে একইকালে বেদব্যাসের রচিত বলে গৃহীত হয়ে থাকে। বিদ্যাসাগর যুক্তিসহ এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, "ঐ সমস্ত গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া কোন ক্রমেই প্রতীতি জন্মে না। যাঁহাদের সংস্কৃত রচনার ইতরবিশেষ বিবেচনা করিবার শক্তি আছে, তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এই সকল গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে। বাস্তবিক, পুরাণ সকল এক ব্যক্তিরও রচিত নয়, এক কালেও রচিত নয়। বোধ হয়, পুরাণ নাম প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমুদায়ের অধিকাংশই প্রাচীন নহে" (ঐ. পৃ. ১৮)।

এদেশের নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা এত অত্যুক্তিপ্রিয় ও অনুপ্রাসভক্ত যে, তাঁরা 'নৈষধচরিত'কে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলে থাকেন। বিদ্যাসাগর পুরাতন পণ্ডিতদের এই ধরণের অভিমতেরও সমালোচনা করেছেন। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা 'কাদম্বরী'র যত প্রশংসাই করুন না কেন, বিদ্যাসাগর পুরাতন পণ্ডিতী-পন্থা পরিত্যাগ করে খোলা মনে বিচার করে দেখেছেন, এই অতিবিখ্যাত কথাগ্রন্থেও নানা ধরনের দোষ-ত্রুটি আছে। যাই হোক, 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে' বিদ্যাসাগর পৌরাণিক যুগের বিশুদ্ধ সাহিত্যের ('literature of power') পরিচয় প্রসঙ্গেই সেকেলে সংস্কার পরিত্যাগ করে আধুনিক যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পেরেছেন, প্রয়োজনস্থলে পুরাতন পাণ্ডিত্যের সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হন নি, এতে তাঁর মানসিক বলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। দুঃখের বিষয় তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনার সময় পান নি, তাই তাঁর কাছ থেকে আমরা একখানি মৌলিক গ্রন্থ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। উক্ত পুস্তিকা প্রকাশের (১৮৫৩) পর এক

শতাব্দীরও বেশী অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এখনও বাংলা ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রামাণিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয় নি, বিস্তারিত ভাবে বিশেষ কোন গবেষণাও হয় নি। এতেই বোঝা যাচ্ছে, মুখে আমাদের দেশের সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা সংস্কৃত সাহিত্যকে যতটা শ্রদ্ধা দেখান, অন্তর থেকে ঠিক ততটা শ্রদ্ধা বোধ করেন না। বিদ্যাসাগরের ঐ পুস্তিকাখানি এখনও সংস্কৃত-সাহিত্যের দিগ্‌দর্শনী হয়ে আছে।

আর একটি উৎস থেকে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত সাহিত্য বিচার-বিশ্লেষণের মৌলিক সমালোচক-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগে তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্য-নাট্য প্রকাশিত হয়েছিল। কিছু কিছু বালপাঠ্য উপাখ্যানও তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয় নি। 'ঋজুপাঠে'র (সংস্কৃত অনুশীলনের প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক) তিন খণ্ডের ভূমিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত সাহিত্য বিচারে তিনি যুক্তি-বুদ্ধির আবেদনই বেশী মেনে নিয়েছেন। প্রয়োজন স্থলে দেবভাষায় লেখা পূজনীয় গ্রন্থকেও সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। 'পঞ্চতন্ত্রে'র মধ্যে অশ্লীল উপাখ্যান আছে, উপরন্তু "অধুনাতন গ্রন্থের ন্যায়, রচনার মাধুর্য নাই, কথাযোজনার চাতুর্য নাই।" তাই তিনি তার কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়েই সঙ্কলন করে-ছিলেন। এমন কি রামায়ণেও তিনি কয়েকটা মারাত্মক দোষ (পৌনরুক্ত, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অতি-বিস্তৃত বর্ণনা প্রভৃতি) দেখেছেন, এবং বাল্মীকির পরবর্তী নব্য কাব্যগ্রন্থে তিনি অধিকতর কাব্যলক্ষণ লক্ষ্য করেছেন, 'হিতোপদেশ'-কেও তিনি কাঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। এতেও অশ্লীল উপাখ্যানের অসদ্ভাব নেই, অসংলগ্নতা তো পদে পদেই আছে। এ গ্রন্থ বালকদের জন্য রচিত, অথচ এতে একাধিক অশ্লীল উপাখ্যান আছে। এ জন্য বিদ্যাসাগর বলেছেন, "অতএব, আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি প্রকারে গ্রন্থকর্তার ঐরূপ অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্তি হইল" (ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগের

বিজ্ঞাপন)। ভট্টিকাব্য সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত—কাব্যকার ব্যাকরণের উদাহরণের দিকে লক্ষ্যবদ্ধ ছিলেন বলে, "ভট্টিকাব্যের অধিকাংশই অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ। ফলতঃ ভট্টিকাব্য কোন মতেই উৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।" 'বেণীসংহার' রচয়িতা ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, "ভট্টনারায়ণ নাটকের নিয়ম যত প্রতিপালন করিয়াছেন, কবিত্বশক্তি তত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।" হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী'র মূল সংস্কৃত 'বেতালপঞ্চ-বিংশতি' সম্বন্ধে তিনি যথার্থ বলেছেন যে, এতে কোনও প্রকার শিল্প-কলার চিহ্ন নেই, এবং ছেলেমানুষীভরা গালগল্পের দিকেই গল্পগুলির প্রবণতা বেশী, সংস্কৃতির অবক্ষয়ের যুগে সাহিত্যের যা হল সাধারণ লক্ষণ। এই সমস্ত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে পূর্বসূরীদের প্রতি অযথা ভক্তি ত্যাগ করে বিদ্যাসাগর নিজস্ব ধ্যানধারণা এবং বাস্তব যুক্তির দ্বারা নিজস্ব সাহিত্যবিচারবুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন—শ্রেষ্ঠ সমালোচকের যেটা হল স্পৃহণীয় গুণ।

৩.

এবার আমরা বিদ্যাসাগরের সাহিত্যশ্রেণীর দু'একটি রচনার পরিচয় দেব। এই ধরনের যে-সমস্ত রচনা প্রচারমূলক বা আন্দোলনমূলক নয়, তার সংখ্যা অবশ্য বেশী নয়। এর মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় অসম্পূর্ণ রচনা 'রামের রাজ্যাভিষেক'। ১৮৬৯ সালে বিদ্যাসাগর রামের অভিষেক এবং সম্ভবতঃ নির্বাসন ব্যাপার পর্যন্ত অবলম্বন করে রামচন্দ্রের প্রথম দিকের চরিত্রাঙ্কনের ইচ্ছায় এই গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। ১৮৬০ সালে যখন 'সীতার বনবাস' রচনা করেন, তখন তাতে রামচন্দ্রের উত্তরজীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল। উপাদান স্বরূপ তিনি বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড এবং ভবভূতির উত্তরচরিতের কিয়দংশ গ্রহণ করেছিলেন। তখনই বোধ হয় রামচন্দ্রের প্রথম জীবন, অর্থাৎ বনগমনের পূর্ব পর্যন্ত কাহিনী রচনার কথা চিন্তা করেন।

'সীতার বনবাস' প্রকাশের পর এ গ্রন্থ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করলে সম্ভবতঃ তিনি রামচন্দ্রের পূর্বচরিত অবলম্বনে গদ্যকাহিনী লিখতে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে ছয় ফর্মা ছাপা হয়ে যায়।[৬] সেটা ১৮৬৯ সাল। কিন্তু পরে সংবাদ পান যে, শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের 'রামের রাজ্যাভিষেক' ছাপা হয়ে গেছে, দু' একদিনের মধ্যে প্রকাশিত হবে। ছাপাখানায় গিয়ে বিদ্যাসাগর সদ্য-মুদ্রিত গ্রন্থের এক কপি কিনে আনেন এবং পড়ার পর খুশি হয়ে মন্তব্য করেন, "বেশ হয়েছে"। অতঃপর তিনি নিজের ছাপা কার্য বন্ধ করে দেন। পরে তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্বরচিত 'রামের অধিবাসে' পিতার রচনাংশটুকু মুদ্রিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মূল রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সর্গের সম্পূর্ণ এবং ৫ম সর্গের যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করে রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কাহিনী শুরু হয়েছে বৃদ্ধ দশরথের স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে—"আমি দীর্ঘকাল অকণ্টকে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিলাম।........সৌভাগ্যক্রমে, চরম বয়সে, সেই সর্ব্বজনপ্রার্থনীয় অনির্ব্বচনীয় সুখের অধিকারী হইয়াছি। পুত্র অনেকের জন্মে, কিন্তু কোনও ব্যক্তিই আমার সমান সৌভাগ্যশালী নহেন।" অতঃপর তিনি সর্বগুণান্বিত জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার মানসে অমাত্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরা সানন্দে সম্মতি দিলেন এবং দেশের অন্যান্য ক্ষত্রপদিগকে আহ্বান করলেন। অন্য রাজ্যের নৃপতিরা দশরথের কাছে উপস্থিত হয়ে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। সভাস্থ সকলের প্রতিভূ হয়ে মগধরাজ বললেন, "আমরা সরল অন্তঃকরণে বলিতেছি, কেবল মহারাজের সন্তোষার্থে, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক বিষয়ে অনুমোদন করিতেছি না। আমরা তদীয় রমণীয় গুণগ্রাম দর্শনে নিরতিশয় মুগ্ধ হইয়া আছি। মানবকলেবরে গুণ-সমুদয়ের ঈদৃশ সমবায় অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব ঘটনা।" অতঃপর তিনি

৬. বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৪৬৬

তরুণ রামচন্দ্রের গুণগ্রাম ব্যাখ্যা করে বলেন, "মহারাজ। বলিতে গেলে ধৃষ্টতাপ্রদর্শন হয়, কিন্তু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আপনার সৌভাগ্যের অবধি নাই, রামচন্দ্র সদৃশ পুত্রলাভ অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। আমরা অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, আপনি রামচন্দ্রকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিলে, আমরা আন্তরিক পরিতোষ লাভ করিব ; অধিক আর কি বলিব, পরশ্রীকাতর পামরেরাও অসন্তোষ প্রকাশ করিবে না।" তখন দশরথ নিশ্চিন্ত আনন্দে রামের অভিষেকের জন্য কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে অনুরোধ করলেন এবং রামচন্দ্রকে নিজের কাছে ডাকিয়ে এনে সস্নেহে বললেন, "সমস্ত রাজগণ ও যাবতীয় পৌর জানপদ সভায় সমবেত হইয়াছেন ; সকলেরই একান্ত অভিলাষ, তোমায়, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, আমি রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হই। তদনুসারে স্থির করিয়াছি, কল্য প্রভাতে, তোমার হাতে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিব।" রামচন্দ্র নতমস্তকে এই ভার গ্রহণ করে সর্বাগ্রে প্রাণাধিক লক্ষ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সেখানে কৌশল্যা, সুমিত্রা ও সীতাও উপস্থিত ছিলেন। সকলেই এ সংবাদে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র নগরবাসীরা আনন্দে কোলাহল করে উঠল, "গৃহে গৃহে মহোৎসব ও মঙ্গলাচার হইতে আরম্ভ হইল। রাজপথ সকল মার্জ্জিত ও সুগন্ধ সলিলে সংসিক্ত হইতে লাগিল। সহকার শাখা ও সুশোভিত কুসুমমালা দ্বারে দ্বারে লম্বিত হইলে লাগিল। পূর্ণকলস, দ্বারদেশের উভয় পার্শ্বে, সন্নিবেশিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক ভবনের উপরিভাগে, পতাকাসকল উড্ডীয়মান হইতে লাগিল।" এর পর বিদ্যাসাগর ক্ষান্ত হয়েছেন। এই স্বল্প রচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, মূল রামায়ণের ঘটনা মোটামুটি অনুসরণ করলেও কাহিনীটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, রামায়ণের ঘটনার ওপরে ভিত্তি করে লেখা স্বাধীন রচনার মতো। অবশ্য রামায়ণের সঙ্গে এর ভাবের সাদৃশ্য আছে, দু'একটি বাক্যের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ আছে এবং বিষয়সন্নিবেশের রীতিটিও

রামায়ণের অনুগত। দেখা যাচ্ছে, 'সীতার বনবাসে'র তুলনায় 'রামের রাজ্যাভিষেকে'র ভাষা অনেক সরল ও সরস। বিদ্যাসাগর গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করতে পারলে, তাঁর শেষ দিকের পরিচ্ছন্ন ক্লাসিক গদ্যরীতির একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত মিলত। 'সীতার বনবাসে' মাঝে মাঝে পুরাতন ধরনের পদবিন্যাস ও শব্দযোজনা ছিল, যার ফলে সে-ভাষাকে ঈষৎ গম্ভীর ও কৃত্রিম মনে হয়। কিন্তু 'রামের রাজ্যাভিষেকে'র ভাষায় 'শকুন্তলার' অনুরূপ সরলতা দেখা যায়।

এর পর উল্লেখ করতে হয় একটি ক্ষুদ্র বিচিত্র রচনার। এটির নাম 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। এই ক্ষুদ্র শোকোচ্ছ্বাসটি এখনও গ্রন্থাকারে পৃথগ্‌ভাবে মুদ্রিত হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পর দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এটি খুঁজে বার করেন এবং 'সাহিত্য' পত্রিকায় ৩য় বর্ষের ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত করেন। সেখানে সুরেশচন্দ্র রচনাটির সামান্য একটু ভূমিকাও করেছিলেন (বি. র. ৪র্থ, পৃ. ৪২৮)।

৪.

প্রভাবতী একটি ক্ষুদ্র বালিকার নাম, বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। ১৭৮৫ শকের ৪ঠা ফাল্গুন তিন বৎসরের বালিকা প্রভাবতী সম্ভবতঃ বিসূচিকা রোগে মারা যায়। এই বালিকাটিকে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তখন বিধবাবিবাহ প্রচার ও নানা বিষয়ে বিদ্যাসাগর মনের দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই মানসিক বিপর্যয়ের সময়ে তিনি এই বালিকার শিশুসুলভ ব্যবহারে পরম প্রীত হতেন, তাকে নিজের সন্তানের মতোই দেখতেন। অকস্মাৎ তিন বৎসরের প্রভাবতী সামান্য রোগভোগের পর মারা গেল। তার অকালমৃত্যুতে বিদ্যাসাগর অসহ্য শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে মানসিক দুঃখকষ্টের সময়ে তাঁর যে একটি অবলম্বন জুটেছিল, তাও হারিয়ে গেল। বিদ্যাসাগর এই ঘটনায় এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, প্রভাবতীকে স্মরণ

করে একটি ছোট নিবন্ধ রচনা করে ফেলেন এবং সেটি নিজের কাছে রেখে দেন, কাউকে দেখান নি।[৭] নিজে বিরলে মাঝে মাঝে পড়তেন।[৮] এটি ছিল তাঁর শেষজীবনের সান্ত্বনাস্থল। রচনাটি একান্ত ব্যক্তিগত শোকোচ্ছ্বাস। তাই অনাবৃত প্রাণের আকুল কান্না এই গদ্যরচনাটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জড়িয়ে আছে। বালিকাটির মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর তার নবীন চঞ্চল বাল্যলীলা স্মরণ করে অশ্রুবিসর্জন করতেন, কখনও কৌতুক বোধ করতেন, কখনও-বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন। মরুধূসর বিদ্যাসাগরের ব্যথা জুড়াবার এই একটি মরূদ্যান ছিল, তাও বিধাতার নির্দেশে অকালে শুকিয়ে গেল। এই ক্ষুদ্র রচনায় তিনি বলেছেন, "ইদানীং তুমিই আমার জীবনযাত্রায় একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিলে।" তিন বৎসর বয়সের প্রভাবতীর গিন্নীর মতো পাকাপাকা কথা সকলেই সহাস্যে উপভোগ করত, বিদ্যাসাগরও কৌতুক বোধ করতেন। কিন্তু স্বর্গের এই পারিজাত মর্ত্যের উত্তাপ সহ্য করতে পারল না, অকালে ঝরে গেল। তাঁরই কোলে অসুস্থ প্রভাবতীর মৃত্যু হয়। জলপিপাসায় কাতর হয়ে সে জল চাইত, কিন্তু চিকিৎসকের নির্দেশে বিদ্যাসাগর তার শুষ্ক অধরে একটুও জল দিতে পারতেন না। সেই কথা স্মরণ করে তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁদে উঠেছিল, "বৎসে! তুমি উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া জলপ্রার্থনা কালে, আমার দিকে, বারংবার, যে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, তাহা আমার হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায়, চিরদিনের নিমিত্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে। যদি তোমার সকল কাণ্ড বিস্মৃত হই, ঐ মর্মভেদী কাতর দৃষ্টিপাত এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইবেক না।"

৭. সুরেশচন্দ্র মনে করেছিলেন, প্রবন্ধটি ১৭৮৬ শকাব্দের ১লা বৈশাখ (১৮৬৪) প্রভাবতীর মৃত্যুর তিন মাস পরে রচিত হয়।

৮. সুরেশচন্দ্র লিখেছেন, "মৃত্যুর তিনচারি-মাস পূর্বেও আমি তাঁহাকে একান্তে 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' পড়িতে দেখিয়াছি।" (বি. র. ৪র্থ, পৃ. ৪২৮)

কখনও বা প্রভাবতীর আর একবার দেখা পাওয়ার জন্য তিনি শিশুর মতো ব্যাকুল হয়ে লিখেছেন, "এক্ষণে, এতদিন তোমায় দেখিতে না পাইয়া, আমি অতি বিষম অসুখে কালহরণ করিতেছি। কিন্তু তুমি এতদিন আমায় না দেখিয়া, কিভাবে কালযাপন করিতেছ, তাহা জানিতে পারিতেছি না। বৎসে! যদিও তুমি, নিতান্ত নির্ম্মম হইয়া, এ জন্মের মত, অন্তর্হিত হইয়াছ, এবং আমার নিমিত্ত আকুলচিত্ত হইতেছ কিনা, জানিতে পারিতেছি না; আর হয়ত, এতদিনে আমায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছ; কিন্তু আমি তোমায় কস্মিনকালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না।" লেখাটি ব্যক্তিগত আন্তরিকতায় পূর্ণ, কাব্যের উচ্ছ্বাসের মতো আবেগব্যাকুল, কিন্তু কৃত্রিমতাবর্জিত। মনে হয়, শুধু নিজে সান্ত্বনা পাবার জন্যই এটি লিখেছিলেন, কোনও দিন এটি প্রকাশের বাসনা ছিল না।[১] গদ্যে রচিত এই ক্ষুদ্র শোকোচ্ছ্বাস অনেকের ততটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে না বটে, কিন্তু এতে বিদ্যাসাগরের হৃদয়ের এক অপূর্ব পরিচয় ধরা পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর আর দেশমান্য বিশ্রুতকীর্তি প্রকাণ্ড ব্যক্তি নন, এখানে তিনি বিয়োগব্যথাতুর বিলাপের মধ্য দিয়ে তাঁর এক অজানা পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এ রকম আন্তরিক রচনা বাংলা সাহিত্যে বড় বেশী নেই।

১. এবিষয়ে কবি-সমালোচক মোহিতলালের মন্তব্যটি অতিশয় মূল্যবান: "এ 'বিলাপ'—তিনি প্রকাশ করিবার জন্য রচনা করেন নাই, কারণ ইহার মধ্যে যে মর্মন্তুদ দুঃখের অতিকরুণ কাতরধ্বনি রহিয়াছে, তাহা অপরকে শুনাইবার উচ্চ রোদনরব নহে। এখানে আমরা যেন মানবহৃদয়ের একটি নিভৃত গোপনকক্ষে প্রবেশ করিয়াছি যেখানে প্রবেশের অধিকার আমাদের নাই—যে কাজ করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। আমার মনে হয়, ইহাতে মৃত মহাত্মার অনুমতি ছিল না, আমরা যেন সত্যই অন্যায় কাজ করিয়াছি।"—সাহিত্য বিতান, ১৩৪৯, পৃ. ৬২

৫.

বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীটি ('বিদ্যাসাগর রচিত স্বরচিত') ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়। আত্মচরিত-রচনায়-দুর্বল বাংলা সাহিত্যে এটি একটি সার্থক সৃষ্টি বলে পরিগণিত হতে পারত। কিন্তু তাঁর আত্ম-জীবনীর এটি ক্ষুদ্রতম অংশ বলে এটি পড়তে পড়তে অন্তর হায়-হায় করে ওঠে। কর্মযোগী মহাপুরুষ নিত্য নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় আত্মকথা লিখবার বিশেষ অবকাশ পান নি। মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁর ভক্তেরা তাঁর কাছে তাঁর সংগ্রামমুখর অদ্ভুত জীবনকথা শুনতে চাইতেন। অনেকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি আত্মজীবনচরিত রচনা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু মাত্র দুটি পরিচ্ছেদ লেখার পর নানা কাজের চাপে ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য আর রচনাকার্যে অগ্রসর হতে পারেন নি। অতঃপর তাঁর তিরোধানের দু'মাস পরে তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই দুটি পরিচ্ছেদকেই 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)' নাম দিয়ে পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেন (১৮৯১, সেপ্টেম্বর, সংবৎ ১৯৪৮, আশ্বিন)। পুস্তকে নারায়ণচন্দ্র ক্ষুদ্র ভূমিকাও ('বিজ্ঞাপন') যোগ করে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেন যে, তাঁরা পিতার একখানি সম্পূর্ণ জীবনচরিত লিখবেন স্থির করেছিলেন। "কিন্তু স্বর্গীয় পিতৃদেবের আত্মীয়স্বজনগণ, ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি আত্মজীবনচরিত লিখিতেছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ও অনুরোধ এই যে, তিনি যতটুকু লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আপাততঃ তাহাই প্রকাশিত হউক। তদনুরোধে, তদীয় আত্মজীবন-চরিতের এই দুই পরিচ্ছেদ এত শীঘ্র প্রকাশিত হইল।" নারায়ণচন্দ্রের এ-কথা ঠিক—"যদি তিনি, বিধবাবিবাহের আন্দোলনের সময় পর্য্যন্ত, অন্ততঃ তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও আমরা পর্য্যাপ্ত মনে করিতাম। কারণ, তাহার পর হইতে তিনি সমাজে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী

জীবনে, তিনি অনেকের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছিলেন। সুতরাং সে সময়ের ঘটনাপরম্পরা, তিনি নিজে না লিখিয়া গেলেও জানিবার সম্ভাবনা ছিল। যদি তিনি তাঁহার ছাত্রজীবনের ইতিহাস নিজে লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার জীবনচরিত সম্পূর্ণ করা সহজ হইত।" আত্মচরিতখানি সম্পূর্ণ হলে একদিকে যেমন বিদ্যাসাগরের সমকালীন বাংলাদেশের মনঃপ্রকৃতি ও চারিত্রমূর্তির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যেত, তেমনই বিদ্যাসাগরের অন্তর্জীবনের অনেক রহস্য দূর হতে পারত। যেমন—বিদ্যাসাগরের মনের একটি রহস্যগ্রন্থী, তিনি ঈশ্বরসত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন কিনা। তাঁর নিজের স্পষ্ট কোন মন্তব্য না পাওয়ার জন্য এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুরূহ। আত্মজীবনীটি সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি মূল্যবান দলিলের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। আত্মজীবনীটির মাত্র দুটি পরিচ্ছেদ লেখা হয়েছিল। তিনি এর বেশী লিখবার অবকাশ পান নি। প্রথম পরিচ্ছেদে তাঁর পিতৃ-মাতৃ বংশের পরিচয় আছে। তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের অসাধারণ চরিত্র, পিতা ঠাকুরদাসের কলকাতায় দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে কোনও প্রকারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা এবং বিদ্যাসাগরের জন্ম থেকে চার বছর পর্যন্ত জীবনকথা এই ক্ষুদ্র অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। অত্যন্ত সরল ও ঋজুভাবে লেখা এই অংশটুকু পরিচ্ছন্ন বর্ণনা হিসেবে অতিশয় জীবন্ত হয়েছে। এই স্বল্প বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি একদিকে যেমন খাপখোলা তলোয়ারের মতো পিতামহের শাণিত চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন, তেমনি সেই অসাধারণ বৃদ্ধ মানুষটির সরস পরিহাসে-উজ্জ্বল প্রসন্ন মনটিকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই বর্ণনাটুকু এখানে উল্লেখ করা গেল :

> "আমার জন্মসময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না; কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, "একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।" এই সময়ে, আমাদের

> বাটীতে একটি গাই গর্ভিণী ছিল ; তাহারও আজকাল, প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এজন্য পিতামহদেবের কথা শুনিয়া, পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব, এঁড়েবাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, 'ও দিক নয়, এদিকে এস ; আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।' এই বলিয়া, সূতিকাগৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।"

এই মন্তব্য থেকে মনে হচ্ছে মহাসত্ত্ববান পুরুষের মনে সর্বদা একটা সরস প্রসন্নতা থাকে—বিদ্যাসাগরের পিতামহের পরিহাস তারই প্রমাণ। এই ঘটনাটি উল্লেখ করার কারণ, বৃষরাশিতে বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়েছিল, এবং রাশিফলের প্রভাবে, বা যে-কোন কারণেই হোক বাল্যে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিলেন। তাই পিতা ঠাকুরদাস বালকপুত্রকে দেখিয়ে প্রায়ই বলতেন, "ইনি সেই এঁড়ে বাছুর, বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন ; তাঁহার পরিহাসবাক্যও বিফল হইবার নহে ; বাবাজি আমার, ক্রমে, এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাঁর বাল্যকালের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। পিতামহের মৃত্যুর পরে ১২৩৫ সনে কার্তিক মাসে (১৮২৮) আট বৎসর বয়সের নিতান্ত বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় আনীত হলেন। শহরে এসে তিনি এবং পিতা বড়বাজারে ভগবতী সিংহের বাড়ীতে ঠাঁই পেলেন। কিন্তু পিতামহীর ক্রোড়-বিচ্যুত বালককে ভগবতী সিংহের কন্যা রাইমণি কোলে তুলে নিলেন এবং নিজের সন্তানের মতো তাঁকে দেখতে লাগলেন। শুধু এই স্নেহময়ী নারীর জন্যই বালক বিদ্যাসাগরের কলকাতাপ্রবাস দুঃসহ মনে হয় নি। সারা জীবন তিনি এই কায়স্থ নারীর চিত্র মনোমন্দিরে মায়ের পাশেই প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর এই মাতৃরূপিণী নারীকে স্মরণ করে লিখেছেন,—

"এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্ত্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসংগত নহে। যে-ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।" (বি. র. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৩)

বাল্যকালে অনাত্মীয় পরিবেশে রাইমণির কাছে মাতৃস্নেহের স্বাদ লাভ করে তিনি চিরদিন নারীর কল্যাণী মূর্তি হৃদয়মন্দিরে স্থাপিত করে রেখেছিলেন। বিধবাবিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহ নিষেধের মূলে ছিল এই নারীজাতির প্রতি অপরিসীম করুণা, এর সমাজসংস্কারের দিকটি ছিল অপেক্ষাকৃত গৌণ।

বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্রকে যখন কলকাতায় আনা হচ্ছিল, তিনি তখনকার একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সেটি মাইল স্টোনের ঘটনা নামে পরিচিত। রাস্তায় প্রোথিত মাইলস্টোনে খোদা ইংরেজী অঙ্কপাত দেখে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পথ চলতে চলতেই ইংরেজী রাশি গণনা শেখেন। এর দ্বারা তাঁর অসাধারণ মেধাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু কাহিনীটি শুধু সেই জন্যই উল্লেখযোগ্য নয়। সিয়াখালার বাঁধা রাস্তায় উঠে তিনি প্রথম মাইলস্টোন দেখতে পান। তাতে ইংরেজীতে '১৯' খোদা ছিল। অর্থাৎ কলকাতা গভর্নমেণ্ট প্লেস থেকে সে স্থানের দূরত্ব ১৯ মাইল। বালক তৎক্ষণাৎ ইংরেজী ১ ও ৯ চিনে ফেলল; এইভাবে ক্রমান্বয়ে ১৮, ১৭, ১৬, ১৫, ১৪, ১৩, ১২, ১১, ১০—মাইলস্টোনে এই পর্যন্ত দেখে ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী রাশি অবিলম্বে শিখে নিলেন এবং পিতার প্রশ্নের উত্তরে ঠিক ঠিক সংখ্যা বলে যেতে লাগলেন। তবু তাঁর পিতা মনে করলেন, ১৮, ১৭, ১৬ ইত্যাদির ক্রমপাতের ফলে

তীক্ষ্ণবুদ্ধির বালক যন্ত্রের মতো বলে যাচ্ছে ; ঠিক ঠিক ইংরেজী রাশি শিখতে পেরেছ কি ? পুত্রকে পরীক্ষার জন্য—

> "পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পরে আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া চালাকি করিয়া নয়, আট, সাত বলিতেছে। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইলস্টোনটি দেখিতে দিলেন না। অনন্তর, পঞ্চম মাইলস্টোনটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন মাইলস্টোন বল দেখি। আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইলস্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে ; এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।" (বি. র. ৪র্থ, পৃ. ৩৭৬)

এই বর্ণনায় দেখা যাবে, বালক একবারও নিজের জ্ঞানবুদ্ধির প্রতি সংশয় বোধ করল না ; নিজের প্রতি এমনই দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেই বয়সেই এই ক্ষণজন্মা বালক বুঝতে পেরেছিল, তার ভুল হবার সম্ভাবনা নেই, বরং যারা খোদাই করেছে, তাদের ভুল হয়েছে। এই হচ্ছে যথার্থ আত্মপ্রত্যয়—বিদ্যাসাগর পরবর্তী জীবনে যার অমিত অধিকারিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাল্যকালের এ ঘটনাটি তার পূর্বসূচনা।

কলকাতায় এসে তিনি অল্প কিছুদিন স্থানীয় পাঠশালায় পড়লেন। তখন ঠাকুরদাস পুত্রকে কী শেখাবেন, তাই ভাবতে লাগলেন। শুভাকাংক্ষীরা উপদেশ দিলেন, "ইহাকে রীতিমতো ইংরেজী পড়ান উচিত।" কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে একটি অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। পরামর্শদাতারা বললেন, ঐ স্কুলে প্রাথমিক ইংরেজী জ্ঞান তো আয়ত্ত হোক। "যদি ভাল শিখিতে পারে, বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে পড়িতে পাইবেক ; হিন্দু কলেজে পড়িলে ইংরেজীর চূড়ান্ত হইবেক।" কিন্তু ঠাকুরদাস বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে নিছক অর্থকরী বিদ্যার্জনের জন্য ইংরেজী শেখাতে রাজি হলেন না। তিনি নিজে অর্থাভাবে ভালো করে সংস্কৃত শিখতে পারেন নি, তার জন্য মনে মনে ক্ষোভ

জন্মিয়েছিল। তাই বললেন, "উপার্জ্জনক্ষম হইয়া আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক।"[১০] অনেকের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে হিন্দু কলেজে না দিয়ে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন। তখন ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স ৮ বৎসর ৮ মাস (১৮২৯, জুন মাস)। এই-খানেই এই অপূর্ব আত্মকথা শেষ হয়েছে, এরপর আর লেখবার অবকাশ পান নি। ফলে বাংলা সাহিত্য একখানি অনবদ্য আত্মজীবনী থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ঠাকুরদাস যদি অর্থকরী বিদ্যার দিকে তাকিয়ে বিদ্যাসাগরকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে দিতেন, তাহলে তাঁর জীবন কোন্ দিকে বইত? হয়তো তাঁর উত্তরকালের জীবন দু' ধারার কোন একটি অবলম্বন করত। ডিরোজিও-পন্থী নিরীশ্বরবাদী, বা রামমোহনপন্থী একেশ্বর-বাদী—এই দুই পরিধির মধ্যে তাঁর জীবন আবর্তিত হতে পারত। হয়তো তিনি মাইকেল মধুসূদনের মতো হিন্দু ধর্মের নঙর ছিঁড়তেও পারতেন।[১১] হয়তো রাজনারায়ণ বসু ও বিদ্যাসাগরের জীবন একই

১০. এখানে দেখা যাচ্ছে, ঠাকুরদাস পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি না করিয়ে ইচ্ছে করেই সংস্কৃত কলেজে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'বিদ্যাসাগর জীবনী'তে অন্যকথা বলেছেন। তাঁর মতে, ঠাকুরদাস প্রথমে মেধাবী পুত্রকে নিজেই হিন্দু কলেজে দিতে চেয়েছিলেন ("ইহাকে হিন্দু কলেজে পড়িতে দিব মনে স্থির করিয়াছি"—শম্ভুচন্দ্রের প্রণীত ঐ গ্রন্থ, বুক-ল্যাণ্ড প্রকাশিত নতুন সংস্করণ, ১৯৬২, পৃঃ ১৯)। পরে দ্বিতীয়বার যখন কলকাতায় বিদ্যাসাগর এলেন, তখন ঠাকুরদাস পুত্রকে সংস্কৃত শেখাতে মনস্থ করলেন ("ঈশ্বর সংস্কৃত অধ্যয়ন করিলে, দেশে টোল করিয়া দিব"।—ঐ, পৃঃ ২২)।

১১. সে যুগের রক্ষণশীলের দল বিদ্যাসাগরকে আড়ালে ধর্মহীন খ্রীস্টান বলতেও দ্বিধা করতেন না। 'ব্রজবিলাসে' ছদ্মনামের অন্তরালে বিদ্যাসাগর নিজেই তার

ধারায় বইত। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ—একই রাজপথের এ-ধারে ও-ধারে অবস্থিত। কিন্তু দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বহু যুগের ব্যবধান। তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে, বিদ্যাসাগর যে-বিদ্যায়তনেই শিক্ষা লাভ করুন না কেন, সংস্কারান্ধ গতানুগতিকতাকে তিনি ছাড়িয়ে উঠতে পারতেন—বিধাতা তাঁর জন্মলগ্নেই সেই রাজটীকা পরিয়ে দিয়ে বিশ্বে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। একথা অতি সত্য যে, তিনি যদি কোনও দিনই কলকাতায় না আসতেন, সারাজীবন গ্রামেই অতিবাহিত করতেন, তাহলেও নিত্য নিত্য অভিনবত্বের দ্বারা গ্রামখানাকে কাঁপিয়ে তুলতে পারতেন। সে যাই হোক, তাঁর আত্মজীবনীটির রচনা সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যে জীবনী-সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পেত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিদ্যাসাগরের আত্মকথা জাতীয় আর একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এটির নাম 'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস' (১৮৮৮, এপ্রিল)। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বিদ্যাসাগর যেমন শারীরিক দিক থেকে পীড়িত হয়েছিলেন, তেমনি আত্মীয় ও বন্ধুজনবিরোধে মনের দিক থেকেও বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। প্রিয় সুহৃৎ ও ঘনিষ্ঠ অনুচর মদনমোহন তর্কালঙ্কার-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে এমন সমস্ত দুঃখজনক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যে, তাঁদের মধ্যে আর সদ্ভাব স্থাপিত হয় নি। এমনকি মদনমোহনের মৃত্যুর পরও সে বিরোধের অবসান হয় নি। যৌথভাবে গ্রন্থপ্রকাশ ও সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরী নিয়েই দুই বন্ধুর মধ্যে মনকষাকষি শুরু হয়ে যায়। মদনমোহনের মৃত্যুর পরে তাঁর জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (বন্দ্যোপাধ্যায়) সেই বিরোধকে ধূমায়িত রাখতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেন। ১৯২৮ সংবতে (১৮৭১, অক্টোবর) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লোকান্তরিত শ্বশুর মদনমোহনের একখানি ক্ষুদ্র জীবনী ও গ্রন্থসমালোচনা

ইঙ্গিত দিয়েছেন, "এমন কি, পবিত্র সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরণীয় বহুদর্শী, বিচক্ষণ টাই মহোদয়েরা তাঁহাকে খৃষ্টান পর্যন্ত বলিয়া থাকেন।" (বি. র.৪র্থ, পৃ. ৪৯৩)

('কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্‌গ্রন্থ সমালোচনা') প্রকাশ করেন। তাতে তিনি ইঙ্গিত করেন যে, কোন কোন গ্রন্থ বিদ্যাসাগরের নামে চললেও, তাতে মদনমোহনেরও পুরোপুরি গ্রন্থকর্তৃত্ব আছে। সুতরাং তার যশ ও আর্থিক লাভের অর্ধাংশ মদনমোহন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য। কিন্তু বিদ্যাসাগর তা ফিরিয়ে না দিয়ে পরস্বাপহরণ করে আসছেন।[১২] এ ছাড়াও উক্ত পুস্তিকায় তিনি এমন সমস্ত অলীক এবং অভিসন্ধি-পরায়ণ উক্তি করেছেন যে, সাধারণের কাছে বিদ্যাসাগরের সম্মান বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ল। অতঃপর বিদ্যাসাগর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র দশম সংস্করণের (১৮৭৬) বিজ্ঞাপনে বাধ্য হয়ে যোগেন্দ্রনাথের কৌশলপূর্ণ অপপ্রচারের মুখোশ খুলে দিলেন। একথা ঠিক, 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' রচনার সময়ে বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে রচিতাংশ মদনমোহন ও সংস্কৃত কলেজের আর এক অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে শোনাতেন, তাঁদের মতামত জিজ্ঞাসা করতেন। তার মানে এ নয় যে, উক্ত গ্রন্থে ঐ দু'জনের গ্রন্থকর্তৃত্ব আছে। গিরিশ বিদ্যারত্ন সরাসরি একথা অস্বীকার করে বিদ্যাসাগরকে জানিয়ে দেন যে, উক্ত গ্রন্থ রচনায় তাঁর বা মদনমোহনের কোনও প্রকার গ্রন্থকর্তৃত্ব নেই। গিরিশচন্দ্র পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন, "আপনি (বিদ্যাসাগর) বেতালপঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত

১২. উক্ত পুস্তিকায় যোগেন্দ্রনাথ সরাসরি এই অভিযোগ করেছেন, "বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতনভাব ও অনেক নূতন সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কারের দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে, বোমণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।"

হইত। বেতালপঞ্চবিংশতি বিষয়ে আমার অথবা তর্কালঙ্কারের এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।" কিন্তু এখানেই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নিরস্ত হন নি। 'শিশুশিক্ষা' তিনভাগের উপস্বত্ব মদনমোহনের উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য—বিদ্যাসাগরের নয়, তিনি অন্যায়ভাবে মদনমোহনের সম্পত্তি ভোগদখল করেছেন—এই মর্মে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে উকিলের চিঠি দেন। ইতিপূর্বে মদনমোহনের বিধবা কন্যার অনুরোধে বিদ্যাসাগর উক্ত তিনখানি পাঠ্য পুস্তকের উপস্বত্ব দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে দিতে সম্মত হন। কিন্তু যখন বিনা কারণে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে রাজদ্বারে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেন, তখন তিনি বিচলিত হলেন। পরে মদনমোহনের চিঠি ও সালিশীদের সিদ্ধান্ত বিদ্যাসাগরের অনুকূলে যায় দেখে যোগেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন যে, মামলায় তাঁদের পরাজয় অনিবার্য। মৃত শ্বশুরের চিঠি পড়ে যোগেন্দ্রনাথ প্রমাদ গণলেন এবং "বিষণ্ণ বদনে, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন, তবে আপনি দয়া করিয়া যেরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপই দেন" (বি. র. ৪র্থ, পৃ. ৩০৮)। যোগেন্দ্রনাথ পণ্ডিত ব্যক্তি, সুতরাং "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—এই মহাবাক্যের অনুসরণ করে যথালাভের চেষ্টা করলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর এতদূর আঘাত পেয়েছিলেন যে যোগেন্দ্রনাথের একথায় কর্ণপাত করলেন না। অবশ্য মদনমোহনের অসহায় মা ও অনাথা কন্যাকে তিনি বরাবর আর্থিক সাহায্য করে এসেছেন।

এই পুস্তিকাটি বিদ্যাসাগর প্রচার করেছিলেন ১৮৮৮ সালে। প্রথমে তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, এই সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার সাধারণ্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু তাঁর নীরবতাকে অপরাধের লক্ষণ মনে করে যোগেন্দ্রনাথ নানা স্থানে পরস্বাপহারী বলে বিদ্যাসাগরের কুৎসা রটাতে লাগলেন। নানা কারণে বিদ্যাসাগরের তখন অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়েছে—"আমাদের দেশের লোক নিরতিশয় কুৎসাপ্রিয়; তোমার মুখে

(অর্থাৎ যোগেন্দ্রনাথ) আমার কুৎসা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, এবং তত্ত্বানুসন্ধানে বিমুখ হইয়া, আমার কুৎসাকীর্ত্তন করিয়া, বিলক্ষণ আমোদ করিতেছেন (বি. র, ৪র্থ, পৃঃ ৩০৮)। অকারণ, অলীক, অন্যায় ও কুৎসার প্রতিবাদ করে যথার্থ ব্যাপার সাধারণ্যে প্রচার করবার জন্যই তাঁকে এই পুস্তিকা মুদ্রিত করতে হয়। যোগেন্দ্রনাথের অকারণ-বিদ্বেষের ফলে বিদ্যাসাগরের হৃদয় পীড়িত হলেও তিনি মৃত সুহৃদের পরিবারবর্গের প্রতি যথাসাধ্য দৃষ্টি রেখে-ছিলেন এবং আর্থিক সাহায্য করে এসেছেন। বস্তুতঃ মদনমোহনের কৃতী জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মদনমোহন-জননী পরিত্যক্তা অনাথা হয়ে পড়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সব বিরোধ ভুলে গিয়ে নিজ ব্যয়ে তাঁকে কাশীতে রেখে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। তার ফলে বৃদ্ধা সুস্থ শরীরে কাশীধামে অনেকদিন জীবিত ছিলেন। মদনমোহনের বিধবা কন্যা কুন্দমালাও বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতেন। যোগেন্দ্রনাথের ব্যবহারে বিদ্যাসাগর মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন। এর ফলে কলকাতার সমাজে তাঁর সুনাম কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু কর্তব্য থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নি। যোগেন্দ্রনাথ বিনাপরাধে বিদ্যাসাগরকে অপমানিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মদনমোহনের পরিবারবর্গের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে দাক্ষিণ্যের দান সংবরণ করলে কেউ তাঁকে দোষ দিতে পারত না। কিন্তু তাঁর অন্তর ততদূর সঙ্কীর্ণ ছিল না, তিনি মদনমোহনের বৃদ্ধা জননী ও বিধবা কন্যাকে নিজের আত্মীয়ের মতোই সাহায্য করেছেন। সে যাই হোক; এই পুস্তিকা থেকেই দেখা যাবে, শেষ দিকে রোগজীর্ণ শরীরে তাঁকে কতটা মানসিক পীড়ন ভোগ করতে হয়েছিল। এই সময়ে তিনি যে কিয়ৎপরিমাণে মানববিদ্বেষী হয়ে পড়েছিলেন, এই জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকই তার কারণ।[১৩]

১৩. শোনা যায় বিদ্যাসাগর বন্ধুমহলে প্রচার করবার জন্য আরও একখানি পুস্তিকা মুদ্রিত করেছিলেন। কোন কোন ভাগ্যবানের কাছে নাকি এরকম একখানি পুস্তিকা আছে। কিন্তু সে পুস্তিকা এখনও দিবালোক দেখে নি বলে এখানে তার আলোচনা সম্ভব নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেনামী রচনা

১.

বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনা বলে পরিচিত কয়েকখানি পুস্তিকার পরিচয় গ্রহণ কর্তব্য। এ-গুলি যে তাঁরই ছদ্মবেশী রচনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিছু পরেই আমরা তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ দিয়েছি। যে সমস্ত প্রতিপক্ষ তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন এবং বহুবিবাহ নিরোধ-সংক্রান্ত পুস্তকের প্রতি যুক্তিহীন আক্রমণ চালিয়েছিলেন, তাঁদের মূঢ়তাকে উদ্‌ঘাটিতে করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর নিজ নাম গোপন করে রসিকতাপূর্ণ ছদ্মনাম নিয়ে যে কয়খানি পুস্তিকা লিখেছিলেন, তার যুক্তির ধার যেমন তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গপরিহাসের তীব্রতাও তেমনি উপভোগ্য। এখানে এই জাতীয় কয়েকখানি পুস্তিকার পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

পাণ্ডিত্যের বর্মমণ্ডিত এবং বহুকাজে নিরতিশয় ব্যস্ত হলেও একটি সহজ-সরস কৌতুকতরল প্রসন্ন মনোভাব বিদ্যাসাগরের মানসসত্তাকে আরেক মূর্তিতে উপস্থাপিত করেছে। বাল্যকাল থেকে কৌতুকরসের প্রতি (যার খানিকটা নির্জলা দুষ্টুমির অন্তর্গত) তাঁর বিশেষ প্রবণতা ছিল। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি মজলিসি ধরনের মানুষ ছিলেন। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে সভা জমিয়ে রাখা (ঈষৎ তোৎলামি সত্ত্বেও), সরস আলাপে সকলকে মুগ্ধ করা—এগুলি তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। এবিষয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তের দল অনেক কৌতুকজনক ঘটনা লিখে গেছেন। কিন্তু বাংলা রচনাতেও যে তাঁর সেই কৌতুকরসের বিচিত্র চিহ্ন রয়ে গেছে, তা জানতে হলে তাঁর বেনামীতে প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তিকার পরিচয় নিতে হবে। অবশ্য বহুবিবাহনিষেধক

পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড, আত্মচরিত প্রভৃতিতেও সুযোগমতো তিনি মাঝে মাঝে কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন। কিন্তু কৌতুক, রঙ্গ ও ব্যঙ্গের অতি চমৎকার পরিচয় তাঁর বেনামী রচনাগুলির মধ্যে বেশী রয়ে গেছে। চিন্তা ও বিতর্কের বিষয়কেও যে পরিহাসের দ্বারা সরস ও স্পৃহণীয় করে তোলা যায়, এই বেনামী পুস্তিকাগুলি তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এগুলি তিনি একগুঁয়ে ও অযুক্তিবাদী প্রতিপক্ষদের হাস্যাস্পদ করবার জন্যই লিখেছিলেন, তাই ছদ্মবেশ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়েছিল। ছদ্মবেশ অর্থাৎ সাহিত্যক্ষেত্রে ছদ্মনাম গ্রহণ করলে ব্যঙ্গের কশাঘাত করতে আর সঙ্কোচ হয় না। এ বিষয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের নামে প্রচলিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' হয়তো তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করে থাকবে। 'বুঝলে কিনা' (১২৭৩), 'কিছু কিছু বুঝি' (১২৭৪) প্রভৃতি ব্যঙ্গরচনাও তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। ইতিপূর্বে বিধবাবিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহনিরোধ সম্পর্কে তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও শাস্ত্রসঙ্গত একাধিক প্রচারপুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি মনে করেছিলেন, যে-সব ভট্টাচার্যের দল এ ব্যাপার শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে আন্দোলন করছেন, শাস্ত্রে তার পূর্ণ স্বীকৃতি আছে দেখালে তাঁরা হয়তো প্রতিকূলতা ত্যাগ করবেন। তাই তিনি নানা স্মৃতি-সংহিতা মন্থন করে উক্ত দুই বিষয়ে পুস্তিকা লিখেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, দেশের পণ্ডিতসমাজ সংস্কারের দাস, কেউ কেউ নিতান্ত লোভী ও অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর ও নীচপ্রকৃতি। 'তৈলবটের' লোভে এঁরা পারেন না এমন কোন অপকর্ম নেই। আজ যে-বিষয়ে বিধান দিচ্ছেন, কাল কিছু বেশী অর্থলোভে তার বিরুদ্ধে অসঙ্কোচে প্রতিকূল বিধান দিতে পারেন এবং সত্যসত্যই তখনকার কালের অনেক স্মৃতি-ন্যায়-কবিরত্ন জনচক্ষে অনুস্বার-বিসর্গের ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে নিতান্ত প্রাকৃতজনের মতো বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মত্ত হয়েছিলেন। দেশের কৃতবিদ্য লোকেরাও এ সমস্ত শাস্ত্রান্দোলনের ভিতরে প্রবেশ করতে চাইতেন না, সংস্কৃতে অজ্ঞ

ব্যক্তিদের সেরকম সামর্থ্যও ছিল না।[১] তাঁরাও এই পণ্ডিতমহাশয়দের পক্ষ নিয়ে বিদ্যাসাগরকে অপদস্থ করবার জন্য অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করতেন না। বিদ্যাসাগর দেখলেন, এই সমস্ত 'টিকিকাটা' পণ্ডিতদের পুস্তিকার ভদ্রভাবে জবাব দিলে এঁদের এবং এঁদের স্থূলচর্ম পৃষ্ঠপোষকদের কোথাও আঘাত লাগবে না। তখন তিনি ছদ্মনামে অত্যন্ত পরিহাসতরল ও ব্যঙ্গবক্রোক্তিপূর্ণ ভাষায় কয়েকখানি পুস্তিকা প্রচার করে প্রতিপক্ষের হাস্যকর জ্ঞানবুদ্ধিকে প্রতিপদে হাস্যাস্পদ করেছেন। নিজের নাম ও স্বরূপ গোপন না করলে, যথেষ্ট

১. বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ব্যক্তিও বিদ্যাসাগরের প্রতি প্রতিকূলতা বশতঃ তাঁর শাস্ত্রপ্রমাণের যাথার্থ্য ও যৌক্তিকতার ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন নি। তিনি 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "আমরা প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইলাম যে, আমরা ধর্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; সুতরাং এ বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিবাদী দিগের মত খণ্ডন করিয়া জয়ী হইয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। এবং সে বিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম। তবে এ বিষয়ে অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা অতি সংক্ষেপে বলিব" (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পৃঃ ৩১৪)। নিরপেক্ষ হয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, বঙ্কিমের এ মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত হয় নি। প্রথমতঃ ধর্মশাস্ত্রাদি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। ইচ্ছা করলেই তিনি বিদ্যাসাগরের বক্তব্য মন্বাদি শাস্ত্রসঙ্গত কিনা বুঝতে পারতেন। দ্বিতীয়তঃ যেখানে বিচার-বিতর্ক মূলতঃ শাস্ত্রকেন্দ্রিক, এবং শাস্ত্র-সমর্থন বা অসমর্থন যেখানে বক্তব্য প্রমাণের একমাত্র মাপকাঠি, সেখানে 'অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির বক্তব্য' গ্রাহ্য নয়, একথা বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে কে বেশী জানতেন? কেউ যদি বলত, আমরা সংস্কৃত জানি না, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র', সাংখ্যদর্শন প্রভৃতি প্রবন্ধের যৌক্তিকতা সংস্কৃত গ্রন্থ বাদ দিয়ে শুধু সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বিচার করব, তাহলে তা বিচারক্ষেত্রে গৃহীত হত না। তেমনি বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য পণ্ডিতদের শাস্ত্রীয় বিরোধের মীমাংসা করতে হলে শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য। এ বিষয়ে অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কিছু বক্তব্য থাকতে পারে বটে, কিন্তু শাস্ত্রবিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার স্থান গৌণ।

তীব্র ঝাঁঝালো ভাষায় আক্রমণ করা যায় না। তাই তাঁকে তিনটি ছদ্মনামে পাঁচখানি বেনামি পুস্তিকা লিখতে হয়েছিল: ১. কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য রচিত 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩, মে), ২. 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩, সেপ্টেম্বর), ৩. 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৪, নভেম্বর), ৪. কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ রচিত 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' বা 'বিনয়পত্রিকা' (১৮৮৪, নভেম্বর), এবং ৫. কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য প্রণীত 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬, আগষ্ট)। এর মধ্যে প্রথম দু'খানি পুস্তিকায় বহুবিবাহ আন্দোলন-বিরোধী তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতের আলোচনা আছে। তৃতীয়-খানির আক্রমণের পাত্র বিধবাবিবাহবিরোধী নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, চতুর্থ এবং পঞ্চম পুস্তিকা বিধবাবিবাহের বিরোধীদের উদ্দেশ্যেই লিখিত।

ছদ্মনামে এই লেখাগুলি বিদ্যাসাগর রচিত, অথবা তাঁর কোন ভক্তের রচিত তাই নিয়ে পাঠকসমাজে কিছু মতভেদ হয়েছে। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার স্পষ্টই বলেছেন, "অনেকেই বলেন, এ ভাইপো স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ই। আমরা কিন্তু উহার তাদৃশ প্রমাণ পাই নাই। এ ভাষার ভাবভঙ্গী বিদ্যাসাগরের চরিত্রোচিত নহে।"[২] কিন্তু এই পুস্তিকা পাঁচখানি যে বিদ্যাসাগরেরই রচনা, অন্য কারও নয়, তার বিশেষ প্রমাণ আছে। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'পুরাতন প্রসঙ্গে'[৩] এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ব্রজেন্দ্রনাথ

২. বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৫০১ (১৯২২, চতুর্থ সংস্করণ)

৩. "বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত বাদানুবাদের সময়ে বিদ্যাসাগরের বয়স অনেক কম ছিল; কিন্তু তখন কুত্রাপি তিনি পরিহাসরসিকতা প্রদর্শন করেন নাই। বহু-বিবাহের সময় প্রাচীন হইয়াও তিনি সেই রসিকতা বিস্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। 'ব্রজবিলাস,' 'রত্নপরীক্ষা,' 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' এই সকল গ্রন্থে যে সকল হাসি-তামাসার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা অতীব কৌতুকাবহ।"—পুরাতন প্রসঙ্গ, বিদ্যাভারতী সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১২৩

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে' স্পষ্টই বলেছেন যে, এই পুস্তিকাগুলি বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনা, অন্য কারও নয়। উপরন্তু এই পুস্তিকাগুলিতে এমন অনেক শব্দ ও প্রসঙ্গ আছে যে, সে-সমস্ত কথা বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কারও রচনা হতে পারে না। এই পুস্তিকায় বিদ্যাসাগরকে 'জন্তু' বলা হয়েছে সরস পরিহাসের ভঙ্গিতে। কোথাও বলা হয়েছে, অসুস্থ 'বিদ্যাসাগর লেজ নাড়িতেছেন'। কোথাও তাঁর সম্বন্ধে বা তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে সপ্রশংস ও সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। এই পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হলে, কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন, এ পুস্তিকা বিদ্যাসাগরেরই লেখা। ধরা পড়ে গিয়ে বিদ্যাসাগর সুকৌশলে এইভাবে সাফাই গেয়েছেন ঃ

১. "উপযুক্ত ভাইপোর পুস্তক পড়িয়া, অনেকে বেয়াড়া খুসি হইয়াছেন, এবং উপযুক্ত ভাইপো লোকটা কে ইহা জানিবার জন্য, অনেকের অতিশয় ঔৎসুক্য ও কৌতূহল জন্মিয়াছে। কেহ কহিতেছেন, অমুক, অমুক, কেহ কেহ এতবড় সুবোধ যে, বিদ্যাসাগরকে উপযুক্ত ভাইপোর জায়গায় বসাইতেছেন।" (বি. র. ৪র্থ, পৃঃ ৪৭৪)

২. "শুনিতে পাই, আমার এই ক্ষুদ্র মহাকাব্যখানি অনেকের পছন্দসই জিনিস হইয়াছে। সেই সঙ্গে, ইহাও শুনিতে পাই, ফাজিল চালাকেরা রটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা বিদ্যাসাগরের লিখিত। যাঁহারা সেরূপ বলেন, তাঁহারা যে নিরবচ্ছিন্ন আনাড়ি, তাহা এক কথায় সাব্যস্ত করিয়া দিতেছি। ...আমার প্রথম বংশধর, "অতি অল্প হইল", ভূমিষ্ঠ হইলে, কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া কোনও মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিতেন, এই পুস্তকখানি কি আপনকার লিখিত? তিনি, কোন উত্তর না দিয়া, ঈষৎ হাসিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। তাহাতে অনেকে মনে করিতেন, তবে ইহা ইঁহারই লিখিত। বিদ্যাসাগর মহোদয় সেরূপ চালাকি খেলেন কিনা, ইহা জানিবার জন্য, এবার আমি, চতুর, চালাক, বিশ্বস্ত বন্ধুবিশেষ দ্বারা, তাঁহার নিকট ঐরূপ, জিজ্ঞাসা করাইব। দেখি, তিনি পূর্বোক্ত

মহোদয়ের মত, ঈষৎ হাসিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন ; অথবা আমার লিখিত নয় বলিয়া স্পষ্ট বাক্যে উত্তর দেন। যেরূপ শুনিতে পাই, তাহাতে তিনি "না বিইয়া কানাইর মা" হইতে চাহিবেন, সে ধরনের জন্তু নহেন।" (ঐ, ৪র্থ, পৃঃ ৪৮১)

৩. "আমি পূর্ব্বে কখনও বিদ্যাসাগরকে দেখি নাই। একদিন ইচ্ছা হইল, সকলে লোকটার এত প্রশংসা করে, অতএব, ইনি কিরূপ জানোয়ার, আজ একবার দেখিয়া আসিব।" (ঐ, পৃঃ ৪৮৯)

৪. "ইহা যথার্থ বটে, বিদ্যাসাগর তাঁহার মত (ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন) বেহুদা পণ্ডিত নহেন ; তাঁহাদের মত, বেয়াড়া ধর্মনিষ্ঠ নহেন ; তাঁহাদের মত, সাধুসমাজের অনুগত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী নহেন ; তাঁহাদের মত, সাধুসমাজের অভিমত নির্ম্মল সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা বিষয়ে তৎপর ও অগ্রসর নহেন। এমন কি, পবিত্র সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরণীয়, বহুদর্শী চাঁই মহোদয়েরা তাঁহাকে খৃষ্টান পর্যন্ত বলিয়া থাকেন।··· তাঁহাদিগকে সকলে, বাস্তবিক ভাল লোক বলিয়া, প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাদৃশ পণ্ডিতগণের মুখে শত সহস্রবার শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ বিষয়ে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে দোষারোপ করিবার পথ নাই।" (ঐ, পৃঃ ৪৯৩)

এই উক্তিগুলি থেকেই বোঝা যাচ্ছে, একাধারে বিদ্যাসাগর নিজের গ্রন্থকারত্ব গোপন করতে চেয়েছেন,[৪] আবার কৌশলে নিজের মতামতগুলিও ব্যক্ত করেছেন। সে-যুগে অবশ্য তাঁর অন্তরঙ্গেরা প্রায় সকলেই জানতেন এই সমস্ত পুস্তিকার প্রকৃত রচনাকার কে। আর তা ছাড়া এগুলি তাঁর 'সংস্কৃত যন্ত্র' থেকেই মুদ্রিত হয়েছিল এবং বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুসারে তিনি এ গ্রন্থগুলির স্বত্বাধিকারী ছিলেন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই পাঁচখানি পুস্তিকা তাঁরই

৪. যদিও তিনি মেদিনীপুরের রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, তবু নিজের identity ঢাকবার জন্য বেমালুম বলে গেছেন, "আমরা বাঙ্গাল ভট্টাচার্য ; বাঙ্গালেরা আড়া-আড়িতে বড় মজবুত ; সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও, জেদ বজায় রাখে। (বি. র. ৪র্থ পৃঃ ৩৭৫)

রচনা। মূঢ় প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করবার জন্য বিদ্যাসাগর উপযুক্ত ভাইপো এবং ভাইপোসহচরের বেশে শাণিত ভাষায় চোখা চোখা বাণ নিক্ষেপ করেছেন। ভাইপো খুড়োর চেয়ে যখন বয়ঃকনিষ্ঠ, তখন বিদ্যাসাগরকে প্রবীণ বয়সেও তরুণ তথা অর্বাচীনের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং এ ধরনের পুস্তিকায় মুখ-আল্‌গা অথচ বুদ্ধিমান ছোকরার ভাবটি আগাগোড়া বজায় রাখতে হয়েছিল। অন্ততঃ চার-খানি পুস্তিকা থেকে মনেই হয় না যে, এগুলি ষাট বৎসরের বৃদ্ধের রচনা। ভাষার মূল কাঠামো সাধুরীতির হলেও বাচনভঙ্গিমা পুরোপুরি সংলাপধর্মী, মাঝে মাঝে চলতি এবং স্ল্যাং শব্দও তিনি অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন।[৫] বস্তুতঃ চলতি, গ্রাম্য—এমনকি ইতর শব্দ ব্যবহারেও তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। এদিক থেকে শব্দ ব্যবহারে তাঁর দুঃসাহস প্রশংসনীয়। শেষ জীবনে বহু চল্‌তি শব্দ সংগ্রহ করে তিনি চল্‌তি শব্দের অভিধান সংকলনের কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখে গেছেন। পাঠক 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী'র (দেবকুমার বসু

৫. এ বিষয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুচর কৃষ্ণকমলের মন্তব্য স্মরণীয়: "বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িয়া মনে হয়, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না; কিন্তু লোকের সঙ্গে মজলিসে কথা কহিবার সময় এমন কি বাঙ্গালা Slang শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—'ক্যাপাতুড়ো খাওয়া' (to be confounded), 'দহরম-মহরম', 'বনিবনাও', 'বিধঘুটে', 'বাহবা লওয়া'—এই রকমের ভাষা প্রায়ই শুনা যাইত।' যাহাকে সাধুভাষা বলে তিনি সে দিকেই যাইতেন না" (পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃঃ ২৮)। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মদনমোহন কথাবার্তাতেও আভাঙা সংস্কৃত ব্যবহার করতেন। একবার একজন তাঁকে প্রশ্ন করেন, "ও-দেশের লোকজন কেমন? ভদ্রলোকের মতন বটে?" তদুত্তরে মদনমোহন তৎক্ষণাৎ বলেন, "মহাশয়, সেকথা বলিবেন না; অধিকাংশ লোক এরূপ যে, শাঠ্য, লাম্পট্য, কাপট্য ব্যতিরেকে পদবিন্যাসটি মাত্র নাই।" (পুঃ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩২)

সম্পাদিত) চতুর্থ খণ্ডের ৬০৯ পৃষ্ঠায় তার পরিচয় পাবেন। আলোচ্য বেনামী পুস্তিকাতেও তাঁর চল্‌তি ও রঙ্গকৌতুকপূর্ণ বাগভঙ্গী খুবই উপভোগ্য হয়েছে। এখানে তাঁর বেনামী পুস্তিকা থেকে এই ধরনের লঘু ও কৌতুকপূর্ণ বাক্‌রীতির কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে ঃ

> তারানাথের 'দফা রফা' হয়েছে; 'আড়াআড়ি' মজার জিনিস; 'বেহুদা' পণ্ডিত; সংস্কৃত লিখিতে গিয়া বিলক্ষণ 'ছরকট' করিয়াছেন; 'ফাজিল চালাক'; 'লেজ নাড়িতেছে'; 'মাকড় মারিলে ধোকড়' হয়; 'বেঢপ' বিদ্যাবাগীশ; আমি কে ও কি ধরনের 'জানোয়ার'; 'বেয়াড়া' ধর্মনিষ্ঠ; 'ভেঁদড়া ও বেদড়া'; তাঁহার মনোহর গাল গোলাপের মত টুকটুকে হউক, আর রামছাগলের মত 'চাপদাড়িতে' সুসজ্জিত ও সুশোভিত হউক; 'দুও দুও' বলিয়া হাততালি দিয়া; পালের 'গোদা'; 'বকেশ্বর বেড় বেড়' করিয়া বকেন; 'বেঅকুবের' শিরোমণি।[৬]

এই ধরনের রংতামাসাপূর্ণ বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করার ফলে তাঁর প্রতিপক্ষীয়েরা বড়ই বেকায়দায় পড়েছিলেন। অবশ্য দু'এক স্থলে, আধুনিক রুচির কাছে, বিদ্যাসাগরের পরিহাস কিছু অনুচিত তরল

৬. এই হাস্যতরল রীতির প্রশংসা করে কৃষ্ণকমল লিখেছেন, "এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে, এবং ইহার গুণগ্রাহী পাঠকও বেশী নাই। যাঁহারা বিষয়ী লোক, তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের কথা বড় একটা বুঝেন না; সুতরাং তাঁহারা বিদ্যাসাগরের এই রসিকতায় আমোদ পাইবেন না। আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বিদায়-আদায় লইয়া এত ব্যস্ত যে, শাস্ত্রীয় রসিকতায় আমোদ করিবার সময়ই তাঁহাদিগের নাই। সুতরাং এদেশে এই সকল গ্রন্থ রচনা করা বিদ্যাসাগরের একপ্রকার কচুবনে মুক্তা ছড়ান হইয়াছে; যদি য়ুরোপ হইত, তাহা হইলে এ প্রকারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা হাস্যপরিহাসের তরঙ্গ বহিয়া যাইত, এবং বিদ্যাসাগরের নাম এক্ষণে বিদ্যাবত্তার জন্য যে প্রকার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, রসিকতার জন্যও তদ্রূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিত সন্দেহ নাই।"—পুরাতন প্রসঙ্গ, নতুন সংস্করণ, পৃঃ ১২৩

বলে মনে হবে। যেমন বিদ্যাসাগর রচনাবলীর (৪র্থ খণ্ড) ৪৬০ পৃষ্ঠায় ('আবার অতি অল্প হইল') "খুড় অনেক আহার অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়াছেন...." ইত্যাদি[৭] গ্রাম্য রসিকতা কিংবা 'ব্রজবিলাসে'র অন্তর্গত (পৃঃ ৫১২) ভ্রূণহত্যার সংজ্ঞা কিছু স্থূল হয়ে পড়েছে।[৮] জনমেজয় কবিরত্নকে 'কপিরত্ন' (পৃঃ ৫১৭) বলাও নিতান্ত বালকোচিত হয়েছে[৯]। কিন্তু তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও তাঁর পুত্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের প্রতি নিক্ষিপ্ত বিদ্রূপাস্ত্রটি ভারী উপভোগ্য

৭. "খুড় অনেক আহার অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়াছেন, যথার্থ বটে; কিন্তু সংস্কৃত-বিদ্যা নিরতিশয় গুরুপাক দ্রব্য, হজম করিতে পারেন নাই; সুতরাং অপচার ও উদরাধ্মান হইয়া রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে যে নিঃসরণ হইতেছে, তাহার সৌরভে সমস্ত দেশ আমোদিত করিতেছে।" (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৬০)

৮. "ভ্রূণহত্যাকে পাপজনক, বা কোনও অংশে নিন্দনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, কই, এমন বেটা ছেলেত, এ পর্য্যন্ত, আমাদের দিব্য চক্ষে ঠেকে নাই। পেট ফাঁপিলে, ও পেটে মল জন্মিলে, ডাক্তারেরা, জোলাপ দিয়া, পেট পরিষ্কার করিয়া দেন। ভ্রূণহত্যাও, পবিত্র সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরণীয় চাঁই মহোদয়দিগের ন্যায়, স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখিলে, তাহার অতিরিক্ত কিছুই নহে। সাধুসমাজের অভিমত অভিধান গ্রন্থে, ভ্রূণহত্যা শব্দের যে বিশুদ্ধ ও বিশদ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও ইহাই প্রতিপন্ন হয়। যথা—

> "ভ্রূণহত্যা—সং, প্রীতিপ্রদ প্রয়োগবিশেষ দ্বারা, পেটে ফাঁপবিশেষ জন্মিলে, ও মলবিশেষ জন্মিলে, প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা, পেটে ঐ ফাঁপবিশেষের নিবারণ, ও পেট হইতে ঐ মলবিশেষের নিষ্কাশন।" (৪র্থ, পৃ. ৫১২)

৯. "জনমেজয় খুড় মহাশয় যখন উপাধি পান, সে সময়ে আমি অন্যমনস্ক ছিলাম। এজন্য, তিনি কি উপাধি পাইলেন, শুনিতে পাই নাই। পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে, কেহ কেহ কহিলেন, "কপিরত্ন," কেহ কেহ কহিলেন, "কবিরত্ন।" আমি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। উভয়পক্ষে লোকসংখ্যা সমান, সুতরাং, অধিকাংশের মতে কার্য্য শেষ করিবার পথ ছিল না। অবশেষে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, আপাততঃ "কপিরত্ন" বলাই সাব্যস্ত করিলাম।" (৪র্থ, পৃঃ ৫১৭)

হয়েছে, "এই পৃথিবীতে, অনেকের বুদ্ধি আছে ; কিন্তু, খুড়র মত খোশখৎ বুদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করে খুড়র আপদ বালাই লইয়া, এই দণ্ডে মরিয়া যাই ; খুড় আমার, অজর, অমর হইয়া,* চিরকাল থাকুন। কোনও কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন, এই সময়ে, খুড়র কলম করিয়া লওয়া আবশ্যক ; আঁঠিতে যে গাছটি হয়েছে, সেটি বিষম টোকো ও পোকা খেকো।" (বি. র. ৪র্থ, পৃঃ ৩৭০)

বিদ্যাসাগর 'উপযুক্ত ভাইপোস্য' এই ছদ্মনামে যে তিনখানি পুস্তিকা ('অতি অল্প হইল' ; 'আবার অতি অল্প হইল' ; 'ব্রজবিলাস') লিখেছিলেন, তার প্রথম দুই পুস্তিকার আক্রমণের পাত্র ছিলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি। তারানাথ কৌশলে বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করে লিখেছিলেন, "যে ব্যক্তি ভাইপোস্য এইমত অশুদ্ধ প্রয়োগ করে তাহার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল না।" 'ভাইপোস্য' শব্দটির রঙ্গ-পরিহাস 'বেহুদা পণ্ডিত' তারানাথ ধরতে পারেন নি। উপযুক্ত ভাইপো ব্যাকরণেও কম দড় ছিলেন না। তিনি সন্ধি ধরে প্রমাণ করেন যে, 'ভাইপোস্য' পদ সম্পূর্ণ ব্যাকরণসঙ্গত। ব্যাকরণ নিয়ে রঙ্গকৌতুক অতি চমৎকার। 'ভাইপঃ' 'অস্য' এই দুই পদে সন্ধি হয়ে 'ভাইপোস্য' প্রয়োগ সিদ্ধ হয়েছে। "ভাইপঃ, অস্য, এই দুই পদে সন্ধি হইয়া 'ভাইপোস্য' প্রয়োগটি সিদ্ধ হয়েছে। ভা শোভা, ইঃ কামঃ, অভিলাষ ইতি যাবৎ, তৌ পাতি রক্ষতি ইতি ভাইপোঃ, তস্য ভাইপ....।" এর অর্থ—"অস্য কিনা খুড়স্য, "ভাইপঃ শোভাভিলাষরক্ষিতুম্, অর্থাৎ খুড়র পাণ্ডিত্যশোভার ও প্রতিপত্তি লাভ কামনার রক্ষাকর্ত্তার। "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য" সমুদয়ের অর্থ খুড়র উপযুক্ত পাণ্ডিত্য-শোভা ও প্রতিপত্তিলাভ বাসনার রক্ষাকর্তা কোনও ব্যক্তি" (বি. র, ৪র্থ,পৃঃ ৩৭১)। এখানে ব্যাকরণকে নিয়ে বিদ্যাসাগর যেভাবে লোফালুফি করেছেন, তাতে স্বীকার করতেই হবে যে, ব্যাকরণ অবলম্বনে ভানুমতীর খেল্ দেখাবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর ছিল।

'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' নামে লেখা তিনখানি পুস্তিকার মধ্যে

'অতি অল্প হইল' এবং 'আবার অতি অল্প হইল' তারানাথ তর্ক-বাচস্পতিকে আক্রমণ করে লেখা। এর সামান্য কিছু পূর্বে ১৮৭৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (২য়) পুস্তিকায় তিনি সবিস্তারে তারানাথের সংস্কৃত গ্রন্থ 'বহুবিবাহবাদ'-এর ভুলত্রুটি ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তের মারাত্মক ভ্রান্তি দেখিয়েছিলেন। এর একমাস পরে (মে) 'অতি অল্প হইল' এবং কয়েক মাস পরে (সেপ্টেম্বর) 'আবার অতি অল্প হইল' পুস্তিকায় তারানাথের বুদ্ধির স্বরূপ ও নষ্টামি সম্বন্ধে সকৌতুকে এমন সরস মন্তব্য করলেন যে, তর্কবাচস্পতির কাছে সমস্ত ব্যাপার নিশ্চয়ই বিশেষ কৌতুকজনক মনে হয় নি। ব্যাকরণে মহাবোদ্ধা বলে দম্ভ প্রকাশ করলেও তারানাথের পুস্তিকা থেকে বিদ্যাসাগর 'অতি অল্প হইল' পুস্তিকায় মারাত্মক ব্যাকরণভুল বার করলেন। তারানাথ 'তামনবলম্ব্য' না লিখে 'তদনবলম্ব্য' লিখেছিলেন ভ্রমবশতঃ। এ ছাড়াও তাঁর ব্যবহৃত 'ঘূর্ণায়মান', 'অগ্ন্যাধনস্য নিত্যত্বাৎ'-এর সমস্তপদ, 'যৌগপদ্যবিষয়কত্বেন'-এর স্থলে 'যুগপদ্বিষয়কত্বেন', 'দ্বে ইতি পদম্' না লিখে 'দ্বিশব্দো বহুত্বস্যাপ্যুপলক্ষকঃ' লিখলেই ঠিক হত। এই ধরনের কয়েকটি অযৌক্তিক ব্যাকরণপ্রয়োগ উল্লেখ করে ভাইপো উপসংহারে বলেন, "আমার ইচ্ছা ও অনুরোধ এই, খুড় আর যেন সংস্কৃত লিখিয়া, বিদ্যা খরচ না করেন। খুড়র লজ্জা সরম কম বটে, কিন্তু, লোকের কাছে, আমাদের মাথা হেঁট হয়। দোহাই খুড়! তোমার পায়ে পড়ি; এমন করে আর চলিও না; এবং, "শতং বদ, মা লিখ" এই অমূল্য উপদেশ-বাক্য লঙ্ঘন করিয়া, আর কখনও চলিও না।" এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা তারানাথকে গালি দেবার জন্যই রচিত হয়েছিল। প্রতিপক্ষের ভুল বা জ্ঞানের দীনতা প্রকাশ পেলে তর্কের খাতিরে সেই ছিদ্রপথেই মাত করবার যে রীতি আছে, বিদ্যাসাগর সেই রীতি অনুসারে এই পুস্তিকায় বৈয়াকরণ তারানাথের সেই জাঁক অনেকটা ভেঙে দিয়ে বিদ্বজ্জনসমাজে তাঁকে হেয় করবার চেষ্টা করেছিলেন।

২.

এর মাস তিনেকের মধ্যে অধিকতর তীব্র ভাষায় ও বিস্তারিত আলোচনা করে বিদ্যাসাগরের ছদ্মনামে লেখা দ্বিতীয় পুস্তিকা 'আবার অতি অল্প হইল' প্রকাশিত হল। তারানাথ উপযুক্ত ভাইপোর প্রথম আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে বাংলায় জবাব লিখে তাঁর ব্যবহৃত ব্যাকরণের প্রয়োগ সমর্থন করেন। বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় পুস্তিকায় তারানাথের ব্যাকরণভ্রান্তি দৃঢ়তর যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেন। তিনি দেখালেন, একটা ভুল ঢাকতে গিয়ে তারানাথ একাধিক ভুল করে বসেছেন। উপরন্তু শুধু ব্যাকরণের ভুল নয়, ন্যায়শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তারানাথ সেখানেও ভুল করেছেন—"ফলকথা এই, খুড় আমার বড় সুবোধ ছেলে; এক ভুল সারিবার চেষ্টায়, সরাসরি, রকম রকমের ভুল করিয়াছেন।" তারানাথকে ভুল দেখিয়ে দিলে তা সংশোধন না করে তিনি রেগে ওঠেন। এ বিষয়ে সব্যঙ্গে বিদ্যাসাগর বলেছেন, "কিন্তু খুড়র দোষ দেখাইয়া দিলে, তিনি চটিয়া লাল হইয়া উঠেন। এই সময়ে খুড়র কাল মুখে লালের আভা মারিলে, যে শোভা হয়, অর্থাৎ বাহার হয়, তাহা বর্ণনাতীত।" যাহোক, উপসংহারে "খুড়র প্রস্ফুটিত শ্রীপদকোকনদদ্বিতয়ে" তিনি নিবেদন করেন যে, খুড়-ভাইপোর আড়াআড়ি আর ভালো দেখায় না, বরং খুড় কিছু লাঘব স্বীকার করে ভাইপোর সঙ্গে সন্ধি করুন। তা হলে, "কিছু দিনের জন্য, আড়া-আড়ি মুলতুবি রাখিব, এবং খুড়ভাইপোয় মিলিয়া, বিদ্যাসাগরের দফা রফা করিবার চেষ্টা করিব। খুড়র বেয়াড়া বিদ্যা ও আমার চাপা খেঁউড়, এ উভয়ের যোগ দুর্নিবার হইয়া উঠিবেক, এবং অব্যাজে সোনার লঙ্কা ছারখার করিবেক।"

পুস্তিকা দু'খানিতে বহুবিবাহসংক্রান্ত বিশেষ কোন নতুন প্রসঙ্গ নেই, সে-সব তথ্য ও তত্ত্বকথা তিনি বহুবিবাহনিষেধক পুস্তকে পূর্বেই আলোচনা করেছিলেন এবং তারানাথের ভ্রান্তি বেশ স্পষ্ট করেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এই দুই পুস্তিকায় ব্যাকরণে-অতিপ্রাজ্ঞ বলে

খ্যাত তারানাথের গুমোর ফাঁক করবার জন্যই ভাইপো কিঞ্চিৎ চাপা খেউড় ধরেছিলেন। রঙ্গ-কৌতুকের জন্য পুস্তিকা দু'খানি এখনও সুখপাঠ্য।

৩.

তৃতীয় পুস্তিকা 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৪, নভেম্বর) 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাই-পোস্য' নামেই প্রকাশিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই ছাপা গ্রন্থের সমস্ত কপি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং কয়েকদিনের মধ্যে এর দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রথমে যে 'বিজ্ঞাপন' সংযোজিত হয়, তাতে বিদ্যাসাগর নিজ পরিচয় গোপন করার জন্য যা লিখেছিলেন, বোধহয় তাতেও বিশেষ ফল হয় নি। কারণ কৌতূহলী ব্যক্তিরা ইতি-মধ্যেই উপযুক্ত ভাইপোর পরিচয় জানতে পেরেছিলেন। এই পুস্তিকার পটভূমিকার একটি বিশেষ কারণ আছে; সে জন্য অসুস্থ বৃদ্ধ বিদ্যা-সাগরকে পুনরায় উপযুক্ত ভাইপোর বেশ পরতে হয়। 'যশোহর-হিন্দু-ধর্ম-রক্ষিণী-সভা' হিন্দুর ধর্ম ও সমাজরক্ষার গুরু দায়িত্বভার স্বেচ্ছাপ্রণো-দিত হয়ে গ্রহণ করেছিল। এই সময়ে উক্ত সভার কর্তৃপক্ষ সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, "ধর্মসংস্থাপন করা সভার মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই ধর্ম্মের উপর কেহ আঘাত করিলে, সেই আততায়ীকে নিরস্ত করা সভার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" সেই আততায়ী হলেন বিদ্যাসাগর। কারণ বিধবাবিবাহ আইন পাস ও প্রচারের মূলে ছিলেন তিনি। অবশ্য এই আইন পাস হবার অনেক পরে উক্ত ধর্মসভার হঠাৎ টনক নড়ল। এঁদের চতুর্থ সাংবৎসরিক সভায় এ বিষয়ে একটি আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হয়। তাতে নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মার্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্র-বিরোধী, তা প্রমাণের জন্য সংস্কৃতে রচিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে সেই বক্তৃতা 'সমাচারচন্দ্রিকা' পত্রিকায় (৭৩ ভাগ, ১২১ সংখ্যা) মুদ্রিত হয়। তখন সমাজে বহুবিবাহ-সংক্রান্ত জোর আন্দোলন চলেছে

এবং তৎসম্পর্কিত বাদানুবাদ, পুস্তিকা প্রচার প্রভৃতি নানা উত্তেজক ব্যাপারে কলকাতা সরগরম হয়ে উঠেছে। বরং বিধবাবিবাহ-আন্দোলন তখন কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। সেই সময় আবার নতুন করে বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় প্রমাণের চেষ্টায় বিদ্যাসাগর ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়লেন এবং ছদ্মনামের অন্তরালে তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সাহায্যে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেন, যশোহর-হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী-সভার ওপরেও একহাত নিতে দ্বিধা করলেন না।

পুস্তিকার গোড়ার দিকে বিদ্যাসাগর ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের যে মূর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে 'নদীয়াচাঁদে'র প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা রাখা দায় হয়ে পড়ে। এই পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন যে, 'তৈলবটের' লোভে এই জাতীয় 'বিদ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা' পারেন না হেন কাজ নেই। পূর্ব দিনে এঁরা যে বিধান দিয়েছেন, কয়েকটি রৌপ্যচক্র হস্তগত হলে, তার পর দিন তার সম্পূর্ণ বিপরীত বিধান দিতে পারেন। সাতক্ষীরার জমিদার প্রাণনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর, কে শ্রাদ্ধাধিকারী হবে, এই নিয়ে মতান্তর হলে, উক্ত বিদ্যারত্ন প্রথমবার যে পক্ষের হয়ে বিধান দেন, পরে অপর পক্ষের কাছ থেকে কিঞ্চিৎ হস্তগত করে তাদের পক্ষে নতুন বিধান দেন। তিনি এমনই ধৃষ্ট ও লজ্জাদি বর্জিত ছিলেন যে, নিজের এই নীচ কাজে বিদ্যাসাগরের সমর্থন পাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন। এই অংশ পড়লে বোঝা যায়, বিদ্যাসাগর কেন তথাকথিত 'টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশ' দলের ওপর হাড়ে-হাড়ে চটে গিয়েছিলেন। এই সময় সংস্কৃত বিদ্যাসমাজের অতি দ্রুত অধোগতি হচ্ছিল। ইংরেজী বিদ্যা এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপারে অর্থোপার্জনের নতুন পথ খুলে গেলে সংস্কৃতজানা পণ্ডিতদের বৃত্তি নষ্ট হতে শুরু করল। তখন তাঁদের অনেকেই জীবনধারণ করবার জন্য কখনও ধনীর মনোরঞ্জন, কখনও দলবিশেষের সমর্থন, কখনও ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে বিধান দেওয়া ইত্যাকার কর্ম করে, কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জন করে বিপরীত কালস্রোতে বাঁচবার চেষ্টা করে-

ছিলেন। সুতরাং স্মৃতির 'বচন-ফচন'[১০] শিকেয় তুলে রেখে তাঁরা মুদ্রাদেবীর মহিমা শিরোধার্য করেছিলেন। এইজন্য বিদ্যাসাগর এই ধরনের সংস্কৃতব্যবসায়ী টুলো পণ্ডিতদের শ্রদ্ধা করতেন না। বিধবা-বিবাহের আইন পাস হয়ে যাবার বেশ কিছুদিন পরে এর বিরুদ্ধে যশোহর-হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী-সভার অহেতুক উত্তেজনা এবং তাতে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের যোগদানে বিদ্যাসাগর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এর পূর্বে বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তক দু'খানি পুস্তকে বিদ্যাসাগর এই বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য উত্থাপিত করেছিলেন্। কিন্তু বিদ্যারত্নের এই আলোচনায় বিদ্যাসাগরের সেই সব যুক্তি খণ্ডনের কোন চেষ্টা দেখা যায় না। পরাশর-বচনকে বাগ্‌দত্তা সম্পর্কিত ব্যাপারে অপব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিদ্যারত্ন যে কতদূর নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছিলেন, এই পুস্তিকায় ভাইপো অতি স্পষ্টভাবে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। মূঢ় পাণ্ডিত্যের বৃথা-আস্ফালনে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে তাঁকে কটূ মন্তব্য করতে হয়েছে, "যে আহাম্মক মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশ খুড়দের বাক্যে বিশ্বাস ও ব্যবস্থায় আস্থা করেন, তাঁর বাপ নির্ব্বংশ।"

(বি. র. ৪র্থ, পৃঃ ৫০৬)

১০. বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন যখন পূর্ববর্তী বিধানের স্থলে দ্বিতীয় বিধানের জন্য বিদ্যাসাগরের সমর্থনের আশায় তাঁর শরণাপন্ন হন, তখন বিস্মিত হয়ে বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করেন, "আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যখন পূর্ব্ব-ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করেন, তখন কি এ বচনটি আপনার মনে উপস্থিত হয় নাই ?" বিদ্যারত্ন, সহাস্যবদনে, উত্তর করিলেন, ব্যবস্থা দিবার সময় কি অত বচন-ফচন দেখা যায় ?" (বি. র. ৪র্থ, পৃঃ ৪৯২) অর্থাৎ অর্থপ্রাপ্তি অনুসারে স্মৃতির বচন ওলটাতে এই সমস্ত পণ্ডিতদের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। দীনবন্ধুর 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো'তে পেঁচোর মা চাঁড়ালনী নবদ্বীপের ভট্টাচার্যদের সম্বন্ধে কতকটা এইরকম মন্তব্যই করেছিল—"নগোদ্দিপির (নবদ্বীপ) ভস্‌চাজ্জি···ট্যাকা পালি তানারা গোরু খাতি বস্তা দিতি পারে।" অর্থাৎ নবদ্বীপের ভট্টাচার্যেরা টাকা পেলে গোরু খাবার ব্যবস্থাও দিতে পারে।

৪.

তাঁর চতুর্থ পুস্তিকা 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী-সভা' (১৮৮৪) দ্বিতীয় সংস্করণে 'বিনয়পত্রিকা' নামে প্রকাশিত হয়। উক্ত সভার উদ্যোগে বিভিন্ন পণ্ডিতদের সহযোগে অনুষ্ঠিত সাংবৎসরিকসভায় বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এবং বিদ্যাসাগরের অভিমত অনুসারে 'পালের গোদা' (বি. র. ৪র্থ. পৃঃ ৫১৩) ছিলেন নবদ্বীপের স্মার্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। এতে বিদ্যাসাগর যশোহর-হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী-সভার কর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ সম্পাদক তারানাথ মুখোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন। পুস্তিকার রচনাকার হিসেবে নাম দেন 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ।' ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক মতামত এই সভার কর্তৃপক্ষই প্রচার করেন। কিন্তু এঁরা গোঁড়ামিবশতঃ কোন কিছুই তলিয়ে দেখতে রাজি হন নি। এঁদের তাঁবেদার কয়েকজন বিদায়ার্থী টুলোপণ্ডিত বিধবাবিবাহ নিবর্তক পত্রীতে নাম স্বাক্ষর করেছিলেন। এই দিঙ্‌নাগেরা ফতোয়া দিয়েছিলেন, "বিধবায়া বিবাহো ন শাস্ত্রসিদ্ধ ইতি।" যেন এঁদের মুখের কথাই বেদবাক্য। এঁরা সিদ্ধান্ত করলেন বিধবাবিবাহ যখন শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তখন বিধবার পতি উপপতি ছাড়া আর কিছু নয়। এবং উপপতি করলে নারীর যে পাপ হয়, বিধবার পুনঃপতিগ্রহণ সেই একই পাপকর্ম বলে বিবেচিত হবে। এই মর্মে সিদ্ধান্ত করে একুশ জন পণ্ডিত যশোহর-হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী-সভা আয়োজিত সভায় উপস্থিত হয়ে বিধবাবিবাহ-বিধানবিরোধী পত্রীতে নাম স্বাক্ষর করেন। এর গূঢ় কারণ এঁরা "বিদায়ের লোভে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, এই বিচিত্র ব্যবস্থাপত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষরিত করিয়াছেন" (বি. র. ৪র্থ. পৃঃ ৫৩৭)। দুঃখের কথা, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, রামধন তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতের দল সামান্য প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনায় যুক্তিশাস্ত্রের শিরে মুষল আঘাত করেছিলেন। ভবশঙ্কর শর্মা (বিদ্যারত্ন) এবং আরও তিন জন নৈয়ায়িক, ত্রিংশ বৎসর পূর্বে নবশাখ জাতীয় এক বালবিধবার

পুনর্বার বিবাহ বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে বলেছিলেন, "মন্বাদিশাস্ত্রেষু নারীণাং পতিমরণান্তরং ব্রহ্মচর্যসহমরণপুনর্ভবণানামুত্তরোত্তরাপকর্ষেণ বিধবাধর্মতয়া বিহিত"—মনু প্রভৃতি শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের স্বামীবিয়োগের পর ব্রহ্মচর্য্য, সহমরণ ও পুনর্বিবাহ বিধবাদিগের বিহিত ধর্ম্ম (বি. র. পৃঃ ৫৪৩)।" কিন্তু যশোহর সভার ব্যবস্থাপত্রে মাত্র একজন নৈয়ায়িক স্বাক্ষর করেছিলেন। সুতরাং কোন্‌টি অধিকতর গ্রাহ্য? এই পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর অন্য কোন নতুন তথ্যপ্রমাণ উপস্থিত করেন নি; উদ্বাহতত্ত্ব, বীরমিত্রোদয়, নারদসংহিতায় উদ্ধৃত পরাশর-বচনের যে ব্যাখ্যাভাষ্য তিনি বহু পূর্বে বিধবাবিবাহবিষয়ক গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করেছিলেন, এখানে সংক্ষেপে তার পুনরুল্লেখ করেছেন। শাস্ত্রনির্দেশ মানলে বিধবাবিবাহকে কখনও অসিদ্ধ বিবাহ বলা যাবে না, এই হল তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত। এই পুস্তিকায় তিনি অনাবশ্যক কটূকাটব্য করেন নি, তত্ত্বসন্ধানই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

৫.

তাঁর পঞ্চম পুস্তিকা 'রত্নপরীক্ষা' ১৮৮৬ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক মধুসূদন স্মৃতিরত্ন বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পুস্তকের (বিশ বছর আগে লেখা) প্রতিবাদ করে 'বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ' নামে এক পুস্তিকা প্রচার করেন। তাঁর গ্রন্থটি আদ্যন্ত দেখে দিয়েছিলেন নবদ্বীপের নৈয়ায়িক পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন এবং বেলপুকুরবাসী (বিল্বপুষ্করিণী) আর এক নৈয়ায়িক প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন। এই ত্রিবিধ 'রত্নের' দ্বারা প্রস্তুত বিধবাবিবাহনিষেধক পুস্তিকার রচনাকার ও উৎসাহদাতাদের আক্রমণ করে বিদ্যাসাগর নিজ পুস্তিকার নাম দেন 'রত্নপরীক্ষা'। লেখকের নাম নিয়েছিলেন 'উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য'। এই পুস্তিকায় একটু নতুন ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। বোধ হয় তখন 'উপযুক্ত ভাইপো'র

যথার্থ পরিচয় কোন কোন মহলে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। তাই বিদ্যাসাগর 'ভাইপোসহচর' নাম দিয়ে এই পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি সরসভাবে এবং সুকৌশলে, ভাইপো-সহচর যে পৃথক ব্যক্তি, এই রকম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। 'উপযুক্ত ভাইপো' 'ব্রজবিলাস' রচনার পর আর ঐ ধরনের কোন পুস্তিকা লেখায় উৎসাহিত বোধ করেন নি। কারণ তাঁরই বিষময়ী লেখনীর আঘাতে উক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের মৃত্যু হয়েছিল। সুতরাং আর তিনি পাতকের নিমিত্ত হতে চান না। তখন ভাইপোর অনুমতি নিয়ে ভাইপোসহচর মধুসূদন স্মৃতিরত্নের পুস্তিকার তীব্র সমালোচনা করেন।

বিধবাবিবাহ কেন শাস্ত্রসিদ্ধ তা এ পুস্তিকাতেও তিনি পুনরায় ব্যাখ্যা করেন, এ সব কথা এর পূর্বে বহুবার তিনি প্রমাণ করেছেন। তৎসত্ত্বেও, তাঁর বিধবাবিবাহ প্রবর্তক পুস্তিকা রচনার বিশ বছর পরে, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন তাঁকে আক্রমণ করে পুরাতন ব্যাপারে আবার খুঁচিয়ে তুললেন। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে স্মৃতিরত্নের প্রত্যেকটি যুক্তির প্রতিযুক্তি দিলেন। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র—এই চার প্রকার শাস্ত্র থেকে বচন উদ্ধৃত করে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেন যে, বিধবাবিবাহ কখনই অশাস্ত্রীয় নয়। তা ছাড়া আরও অনেক প্রমাণ তুলে তিনি দেখালেন যে, ক্ষেত্রবিশেষে বিবাহিতা নারীর পুনর্বিবাহ বৈধ ও শাস্ত্রসঙ্গত। মধুসূদন বলেছিলেন যে, যে-নারী একবার বিবাহিতা হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই তার পুনর্বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত নয়। বিদ্যাসাগর এই পুস্তিকার ছয়টি পরিচ্ছেদে স্মার্ত মধুসূদনের মত ও মন্তব্য খণ্ড খণ্ড করে দেন। বিদ্যাসাগরের আলোচনা পড়লে দেখা যায়, শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর প্রচুর ছিল, তার সঙ্গে ছিল কাণ্ডজ্ঞান—যেটি ঐ যুগে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরই ছিল না। মধুসূদন প্যাঁচে পড়েছিলেন কন্যা ও অকন্যা শব্দ নিয়ে। তাঁর মতে বিবাহিতা নারীকে অকন্যা এবং অবিবাহিতা নারীকে কন্যা বলে।

অকন্যার পাণিগ্রহণ তাঁর মতে অশাস্ত্রীয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর দেখালেন, স্মৃতিরত্ন শব্দশাস্ত্রে তত প্রাচীন নন। অতঃপর বিদ্যাসাগর শব্দশাস্ত্র মন্থন করে প্রমাণের চেষ্টা করলেন যে, কন্যা শব্দ কখনও অবিবাহিতা, কখনও বিবাহিতাকে নির্দেশ করে। কন্যা কখন অকন্যা হয়? বিবাহের প্রাক্কালে বিবাহ ভণ্ডুল করার জন্য যদি কেউ বিয়ের কনের নামে অযথা দোষ চাপায় (উন্মাদিনী, কুষ্ঠরোগিণী, পুরুষ-সম্ভোগদূষিতা), অর্থাৎ কন্যাকে অকন্যা বলে, তাহলে সেই কুৎসাকারীর শাস্তি হবে, সংহিতায় এই রকম ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য স্মরণীয়, "মনুসংহিতা অনুসারে, উন্মাদ, কুষ্ঠরোগী, পুরুষ সংসর্গ, এই তিনের অন্যতম দোষে দূষিত হইলে, কন্যারা অকন্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপে কেবল কন্যা অকন্যা বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাদের বিবাহে বৈবাহিক মন্ত্রের প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে" (বি. র. ৪র্থ. পৃঃ ৫৮৬)। সুতরাং অকন্যা শব্দে বিবাহিতা নারী—এ মত যুক্তি-সিদ্ধ নয়। এখানে অকন্যা শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ে বিদ্যাসাগর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা স্মৃতির অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রতিবাদীদের মত সব দিক থেকে ভ্রান্ত, একথা প্রমাণের পর বিদ্যাসাগর তখন একটি তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন যা মধুসূদন স্মৃতিরত্নের রত্নহানির পক্ষে যথেষ্ট। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তখনকার সমাজে অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মধুসূদন স্মৃতিরত্ন 'বিধবাবিবাহ বিবাদ' পুস্তিকাটি মতামতের জন্য মহেশচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেন, ভেবেছিলেন মহেশচন্দ্র তাঁকে খুব তারিফ করবেন। কিন্তু মহেশচন্দ্র এই পুস্তিকায় স্মৃতিরত্নের পাণ্ডিত্যের বহর দেখে একখানি চিঠিতে তাঁর মতামতের তীব্র প্রতিবাদ করেন, নানা ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেন এবং স্মৃতিরত্নের মেধাবুদ্ধি সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করেন, তাতে মধুসূদনের সম্মান বাড়ে নি। এই পত্রটি ভাইপোসহচর কেমন করে হস্তগত করে এই পুস্তিকায় শেষে ছাপিয়ে দেন। এবং এই চিঠির দ্বারাই স্মৃতিরত্নের পাণ্ডিত্যের নখদন্ত একেবারে ভেঙে যায়।

মহেশচন্দ্র স্যায়রত্নের মতে, স্মৃতিরত্নকৃত ভাষ্য মানতে হলে, পরাশর-বচনের ('পতিরন্যো বিধীয়তে') অর্থ দাঁড়ায়—বিবাহিতা নারীরা, স্বামী বিদেশস্থ হলে, এবং অনেক দিন অনুপস্থিত থাকলে তারা অন্যের দ্বারা (দেবর) ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন করতে পারবে এবং যতদিন সন্তান না হবে ততদিন *ad infinitum* এবম্প্রকার সহবাস চালিয়ে যেতে পারবে। স্মৃতিরত্নের মতো "বেহুদা পণ্ডিতের"[১১] এই জাতীয় ভাষ্য ও বিধান যে কত হাস্যকর সে বিষয়ে মহেশচন্দ্র লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থাতে কেবলমাত্র বিধবার উপকার, আপনার ব্যবস্থাতে সধবা, বিধবা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি অনেকেরই উপকার আছে দেখিতেছি। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে, ঘরের কুলবধূকে অন্যের গৃহে পাঠাইয়া দিতে হয়, আপনার মতে তাহা নহে ; ঘরের বৌ ঘরে থাকিবে, দেবরের উপকার হইবে, অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পিণ্ডের সংস্থান হইবে" (বি. র. পৃঃ ৫৮৯)। মহেশচন্দ্রের এই মন্তব্য কিছু কটু বটে, কিন্তু মধুসূদন, সংহিতার টীকাভাষ্য করা যাঁর ব্যবসা, তিনি স্মৃতির অপব্যাখ্যা করেছেন বলে মহেশচন্দ্রও ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন নি। এতে অবশ্য বিদ্যাসাগরের লাভই হয়েছিল, মহেশচন্দ্রের শুধু চিঠিখানি উল্লেখ করাতে (৪র্থ, পৃঃ ৫৮৮) তাঁর সহজেই জয় হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে (উপসংহার) বিদ্যাসাগর সমসাময়িক দৈনিক ও

১১. মহেশচন্দ্র উক্ত স্মৃতিরত্নের উদ্দেশে লিখেছিলেন, "আপনার গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সকলেই বুঝতে পারিবেন যে, আপনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। অনেক গ্রন্থ দেখিয়াছেন, অনেক বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং "বেহুদা পণ্ডিত" গোচ অনেক শাস্ত্র তুলিয়া নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই।...কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাঁহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা করিবার ক্ষমতা আছে, যাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি আছে বা যাঁহাদের স্মৃতিশাস্ত্র কিঞ্চিৎ পরিমাণে পড়া আছে, তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে এ-পুস্তকখানি আপনার উপযুক্ত হয় নাই। ইহাতে আপনার সম্মান, গৌরব, ও পদের হানি ভিন্ন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।" (বি. র. ৪র্থ. পৃঃ ৫৮৮)

সাপ্তাহিক পত্র থেকে একটি সংবাদ উদ্ধৃত করেন। নদীয়ার মুড়াগাছা গ্রামে দ্বারকানাথ ঘোষ নামে এক সম্পন্ন গোপ অনেক স্মৃতিরত্নাদি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে রজতচক্রের লোভ দেখিয়ে নিজের পিতার শ্রাদ্ধে যোগ দিতে অনুরোধ করেছিলেন। 'বিধবাবিবাহবাদ'-এর লেখক মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, তাঁর সহায়ক নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি অশূদ্রপরিগ্রাহী শাস্ত্রযাজী পণ্ডিত মহাশয়েরা গোপ-ভবন পবিত্র করতে মুড়াগাছায় উদিত হয়েছিলেন—অবশ্য নিতান্ত নিষ্কামভাবে নয়, বা সমাজসংস্কারের প্রেরণায় নয়,—বেশ কিছু দক্ষিণা হস্তগত করার পর তাঁরা গোপভবন পদধূলি দানে ধন্য করেছিলেন। সূর্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের এই অধঃপতন দেখে এক দৈনিকপত্রে সক্ষোভে লিখেছিলেন, "কিন্তু এখন কথা হইতেছে অধ্যাপক মহাশয়েরা এরূপ অর্থলোলুপ হইলে তাঁহাদের প্রতি সাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা থাকিতে পারে কিনা? আমার বোধ হয় অর্থ পাইলে গোপকুল উদ্ধার কেন, তাঁহারা সকল কুলই উদ্ধার করিতে পারেন। পয়সার কি আশ্চর্য মোহিনী শক্তি! ন্যায়রত্ন, পদরত্ন, বিদ্যারত্ন, তর্করত্ন প্রভৃতি মহোদয়গণকে ভ্রষ্টাচার ও লঘুচেতা দেখিলে কোন হিন্দুর প্রাণে আঘাত না লাগে? ইঁহারাই আবার ধর্মরক্ষক ও শাসক; ধিক্ তাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞানে, আর ধর্ম্মার্জ্জনে" (বি. র, ৪র্থ পৃঃ ৫১১)। এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর পুস্তিকার শেষে বিদ্যাসাগরও খুব পরিহাস করেছেন। স্মৃতিরত্ন, ন্যায়রত্ন প্রভৃতি রত্নেরা যত বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিন না কেন, তাঁরা যে নিতান্ত লোভী ও স্বার্থপর এবং বিজিগীষার জন্য শাস্ত্রার্থকেও বিকৃত করতে পারেন—বিদ্যাসাগরের এই সর্বশেষ বেনামী পুস্তিকায় সেকথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। সংস্কৃত বিদ্যাব্যবসায়ী, বিশেষতঃ নৈয়ায়িকদের অদ্ভুত বুদ্ধিকে[১২] তিনি কখনও প্রশংসা করতেন না। এই পুস্তিকাতেও তিনি

১২. 'আলালের ঘরের দুলালে' প্যারীচাঁদও 'নেই-আঁকুড়ে' বামুনে বুদ্ধিকে ব্যঙ্গ

"নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের প্রকৃতিসিদ্ধ অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি ও অপ্রতিহত তর্কশক্তি"-কে (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬০৬) ব্যঙ্গই করেছেন। মাঝে মাঝে বক্তব্যকে সরস করতে গিয়ে তিনি দুটি-একটি কৌতুকরসের গল্প বলেছেন, যার ফলে স্মৃতিরত্ন-ন্যায়রত্নের অবাস্তব তর্কবুদ্ধি প্রতিপদে বিড়ম্বিত প্রমাণিত হয়েছে। এই বেনামী পুস্তিকাগুলি রচনার সময় তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়লেও তাঁর মনটি তখনও বেশ সরস, সজীব ও কৌতুকপ্রবণ ছিল, বাইরের আঘাতে তিনি বিপর্যস্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রসন্ন হৃদয়টি তখনও শুকিয়ে যায় নি। অতিপ্রাজ্ঞ, প্রবীণ, চিন্তাভারক্লিষ্ট বাঙালীর মুখে হাসি আনতে পেরেছিলেন বলে আজ একশত বৎসর পরেও তাঁর এই জাতীয় পুস্তিকাগুলি জনপ্রিয়তা হারায় নি। তাঁর কোন কোন সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে হয়তো মতানৈক্যের অবকাশ আছে, কিন্তু এর সরস পরিহাস ও ঝাঁঝালো ব্যঙ্গকৌতুক এখনও অতীব উপভোগ্য মনে হয়। অগ্নিগর্ভ শমীশাখা কখন যে ফুলঝুরি হয়ে উঠেছিল তা তিনি নিজেও টের পান নি ; আধুনিক কালে, প্রায় শতবর্ষ পরে, সেই সমস্ত উত্তাপ এবং উত্তেজনার ঢেউ কাটিয়ে এ যুগের শান্ত পরিবেশে আমরা এই পুস্তিকাগুলির রসাস্বাদনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়েছি।

করে লিখেছিলেন, "বামুনে বুদ্ধি প্রায় বড় মোটা—সকল সময় সব কথা তলিয়ে বুঝতে পারে না—ন্যায়শাস্ত্রের ফেঁকড়ি পড়িয়া কেবল ন্যায়শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হয়।"

সপ্তম অধ্যায়

বিদ্যাসাগরের বাক্‌রীতি-প্রসঙ্গ

১.

প্রারম্ভেই একথা জানিয়ে দেওয়া ভালো যে, বিদ্যাসাগরের মুখের কথার ভঙ্গী, পদ্ধতি ও রীতি এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নয়—যদিও সে আলোচনাও কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, গত শতাব্দীতে কোন কোন ক্ষেত্রে ডিক্টাফোনের ব্যবহার থাকলেও কোন যান্ত্রিক শব্দকৌশলের সাহায্যে বিদ্যাসাগরের কণ্ঠস্বর বা সংলাপের কোন অংশ ধরে রাখা সম্ভব হয় নি। তা যদি সম্ভব হত, তা হলে তাঁর মুখের কথা ও লেখনীর ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা যেত, একে অপরের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে।

অবশ্য লেখকের বাক্‌রীতি যে লেখনরীতিকে প্রভাবিত করবেই এমন কোন কথা নেই। বিশেষতঃ বাগ্‌যন্ত্রের ভাষা এবং লেখনী-নিঃসৃত ভাষার মীডিয়ম পৃথক বলে দুইয়ের রীতিপদ্ধতিও ভিন্ন। যাঁরা অবিকল মুখের ভাষাকে লেখার ভাষায় ব্যবহার করতে চান, তাঁরাও স্বীকার করবেন যে, কাজটা কিছু দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা ও মুখের ভাষা কখনও এক হতে পারে না। গত শতাব্দীতে শ্যামাচরণ সরকার কেবল মুখের ভাষাকে সাহিত্যে ব্যবহারের যৌক্তিকতা দেখিয়ে বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন। এ-যুগে প্রমথ চৌধুরী ও তৎসম্প্রদায়ের কথাও সকলের জানা আছে। দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলবিশেষের ভদ্রসমাজের কথিত ভাষা এবং সশিষ্য প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত চলিতভাষা কখনই এক নয়। তা সে যাই হোক, বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি তাঁর মুখের ভাষার দ্বারা

প্রভাবিত হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা ও অনুমান চলতে পারে।

বাল্যকালে বিদ্যাসাগর কিছু তোৎলা ছিলেন।[১] ক্রোধোদ্রেক হলে আরও তোৎলা হয়ে পড়তেন, সহপাঠীরা এ নিয়ে তাঁকে প্রায়ই ক্ষেপাত। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি কলকাতার বিদগ্ধজনের মজলিসে বাগ্‌বিদগ্ধ ব্যক্তি বলে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন। হাস্যপরিহাসে তাঁর জুড়ি ছিল না। তিনি যখন বৈঠকখানা জমিয়ে গল্প করতেন, তখন শ্রোতার দল মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। কোথা দিয়ে যে সময় চলে যেত তাঁরা বুঝতেও পারতেন না। তাঁর ছাত্র-শিষ্য ও বিশেষ অন্তরঙ্গ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এ বিষয় অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করেছেন ('পুরাতন প্রসঙ্গ')।[২] এই সমস্ত বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে,

১. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর (১৮৯৫), পৃ. ৩৯

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'পুরাতন প্রসঙ্গে' (বিশ্বভারতী প্রকাশিত নতুন সংস্করণ, পৃ. ১০৪) আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে, উত্তরকালেও বিদ্যাসাগর এ ব্যাধি থেকে পুরোপুরি মুক্তি পান নি। তাই সাধারণতঃ তিনি খুব ধীরে ধীরে কথা বলতেন। এমন কি সংস্কৃত কলেজে কোন দিন কোন বড় ক্লাস নেন নি। কৃষ্ণকমল নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, "আমার বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃই তিনি ক্লাস পড়ানর ব্যাপারে অগ্রসর হইতেন না।"

২. বিদ্যাসাগরের সংলাপ সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল বলেছেন, "মেকলে ডাঃ জন্‌সন্ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, বোধহয় তোমার মনে আছে। যিনি লিখিবার সময় গম্‌গমে Johnsonese ও Latinism ছাড়া কিছুই লিখিতে পারিতেন না, তিনি কিন্তু সাধারণ কথাবার্ত্তায় একটিও ল্যাটিন কথা ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্ত্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না; কিন্তু লোকের সঙ্গে মজ্‌লিসে কথা কহিবার সময় এমন কি বাঙ্গালার Slang শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন

মজলিসে সভা জমাবার জন্য বিদ্যাসাগর রঙ্গকৌতুকের সঙ্গে slang বাংলা শব্দের মিশাল দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। অন্তরঙ্গ কৃষ্ণকমলের সামনে তিনি একদা বৈঠকখানায়-অনুচ্চার্য শব্দ উচ্চারণেও দ্বিধা করেন নি। ঘটনাটি কৃষ্ণকমলের মুখেই শোনা যাক:

> "আজকাল একটু আধটু সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াই কেহ কেহ সংস্কৃতে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি একেবারেই তাহা পছন্দ করিতেন না। একদিন একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দীতে জবাব দিতে লাগিলেন। আমি কাছে বসিয়া ছিলাম। আগন্তুকের ভাষা অশুদ্ধ ও ব্যাকরণদুষ্ট। বিদ্যাসাগর কথা কহিতে কহিতে aside আমাকে বলিলেন, 'এদিকে কথায় কথায় কোষ্ঠশুদ্ধি হোচ্চে, তবু হিন্দী বলা হবে না'।"[৩]

এ 'কোষ্ঠশুদ্ধিমোদক'-এর উল্লেখে"অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনী ভুজঙ্গঃ"[৪] (সাহিত্য দর্পণ) কি বলবেন জানি না। কিন্তু বিদ্যাসাগর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে আলাপে দেবভাষা পরিত্যাগ করে যে খাঁটি দেশজ ভাষাতেই কথা বলতেন এটি লক্ষণীয়। অবশ্য কখনও কখনও এই ব্রাহ্মণ নানা কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়লে তাঁর ভাষার এই কৌতুকরস চলে যেত—কোথাও ব্যঙ্গ, কোথাও ভর্ৎসনা, কোথাও দার্ঢ্য ঝরে পড়ত। সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের সঙ্গে বিরোধের ফলে তিনি উক্ত বিদ্যায়তনের সহকারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ করলে সম্পাদক রসময় দত্ত বিস্মিত হয়ে কোন বন্ধুর কাছে বলেন, "ঈশ্বর তো চাকরি ছেড়ে দিলে; এখন খাবে কি করে?" বিদ্যাসাগরের কানে একথা পৌঁছালে তিনি তার

না।...যাহাকে সাধুভাষা বলে তিনি সে দিকেই যাইতেন না।" (পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ২৮)

৩. পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ২৯

৪. কৃষ্ণকমল এর অনুবাদ করেছেন—"The fancy man of eighteen courtezans of languages." (ঐ, পৃ. ৩০)

জবাব দিয়েছিলেন, "বোলো মুদির দোকান করে খাবে।"[৫] এ বাক্যে দারিদ্র্যের অহংকার ফুটে উঠেছে। কখনও বা অকৃতজ্ঞের নীচতা তাঁর কণ্ঠ থেকে তীব্র নৈরাশ্যপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তি নিঃসৃত করেছে, "রও, ভেবে দেখি, সে ব্যক্তি আমার নিন্দা করিবে কেন? আমি তো কখনও তাহার কোন উপকার করি নাই।"[৬] অবশ্য অন্য সময়ে তিনি ভক্ত-শিষ্যদের সঙ্গে ছোট ছোট বাক্যে অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনা করতেন, অনুজ সকলকেই প্রায় 'তুই' সম্বোধন করতেন। এ বিষয়ে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন নীলাম্বর বাবুকে (মুখোপাধ্যায়) উক্ত কার্যের (ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা) ভারার্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিতেছিলেন, 'তুই ত কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া আসিলি, লেখাপড়াও শিখিয়াছিস। তুই আমার সেই কাজের ভার নে দেখি।'—তখন সত্য সত্যই আমার মনে হইয়াছিল, ঐ মধুমাখা 'তুই' সম্ভাষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে একবার ডাকুন। তাঁহার সে মিছরির দান অপেক্ষা মিষ্ট ছোট ছোট 'তুই' 'তোর' ইত্যাদি উপহার যে পাইয়াছে, সে আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি অধিক সম্মান দেখান, কিম্বা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইল বলিয়া মনে করি না।.......তাঁহার সেই মমতার অনন্ত পারাবারে তাঁহার

---

৫. 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (পৃ. ৬) দ্রষ্টব্য। এই বাক্যটি জীবনচরিতকারের লেখনী মুখে জলীয় ভাষ্যে পরিণত হয়েছে। "কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "চাকুরি ছাড়িয়া দিলেন। খাবেন কি?" নির্ভীক বীরপুরুষ তীব্র-কঠোর স্বরে উত্তর দিলেন, "কেন, আলুপটল বেচিব, মুদীর দোকান করিব, তবুও যে পদে সম্মান নাই, সে পদ গ্রহণ করিতে চাই না" (চণ্ডীচরণ, পৃ. ৯৭)। বিহারীলাল সরকারও তাঁর 'বিদ্যাসাগরে' চণ্ডীচরণের এ উক্তি প্রায় অবিকল গ্রহণ করেছেন (বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, ১৯২২, পৃ. ১৮৭)। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিতে' (নতুন সং পৃ. ৭২) প্রায় একই ধরনের উক্তি করেছেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'তুই' 'তোর'গুলি কোমলতার জীবন্ত বিন্দুসদৃশ বোধ হইত" ('বিদ্যাসাগর', পৃ. ১৮৯)। পরবর্তী কালে তাঁর গদ্যরচনায় এই বাক্‌রীতির কোন প্রভাব পড়েছিল কি ? এবিষয়ে গবেষণার উপযুক্ত তথ্যের অভাব আছে। মনে হয়, প্রসন্ন উদার সাধুভাষায় লেখা তাঁর রচনায় ব্যক্তিগত বাক্‌রীতির পরিচ্ছন্ন প্রভাব থাকতে পারে। যখন তিনি বিধবাবিবাহ-বিরোধী ও বহুবিবাহের পক্ষভুক্তগণের বিরুদ্ধে যুক্তির অস্ত্র বর্ষণ করতেন, তখন তাতে, বিশেষতঃ ছদ্মনামে লেখা পুস্তিকায় ব্যঙ্গকৌতুকের যে সমারোহ দেখা যায়, সে ধরনটি তাঁর মজলিসী ব্যক্তিত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

২.

বিদ্যাসাগরের অনুবাদমূলক রচনা, বিতর্কমূলক নিবন্ধ, অল্প মৌলিক রচনা ও পাঠ্যপুস্তকশ্রেণীর কিছু কিছু লেখায় শিল্পরসসমন্বিত ভাষা-ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়েছে, এবং সে ভঙ্গিমার প্রথম প্রয়োগকর্তার গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। রবীন্দ্রনাথের এ-কথা অতি সত্য—"বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন" ('চারিত্রপূজা')। বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনায় পদক্ষেপের পূর্বে সাময়িক পত্রাদি, রামমোহন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সির দলের গদ্যরচনার ফলে ব্যবহারোপযোগী ভাষার একটা মোটামুটি কাঠামো নির্মিত হয়েছিল। তারও দু'শো বছর আগে থেকে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বৈষ্ণবদের সাধনভজন-সংক্রান্ত পুস্তিকা, আয়ুর্বেদগ্রন্থের, বঙ্গানুবাদ, ন্যায়শাস্ত্রের বাংলা ব্যাখ্যা ইত্যাদি ব্যাপারে বাংলা গদ্যই ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। কিন্তু তখন সে ভাষা ছিল নিতান্তই প্রয়োজনের ভাষা। তারও যে কতকটা

কবিতার মতো চলার ছন্দ আছে, শ্রী আছে, রূপ আছে,[৬] এ-কথার প্রমাণ দিলেন বিদ্যাসাগর। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এ সিদ্ধান্ত সর্ববাদীসম্মত, "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন"('চারিত্রপূজা')।

আমরা এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে বিদ্যাসাগরের সমকালের ব্যক্তিরা তাঁর ভাষা ও সাহিত্যপ্রতিভা সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করতেন সে-বিষয়ে সামান্য অনুসন্ধান করব। তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা ও গদ্যভাষা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ অনুবাদগ্রন্থ ও পাঠ্য-পুস্তকের লেখক বলে কেউ কেউ তাঁর কৃতিত্বকে কিঞ্চিৎ খর্ব করতে চাইতেন। এঁদের তিনটি শ্রেণীতে সন্নিবেশ করা যায়। (১) তাঁর জীবনীকারদ্বয় (চণ্ডীচরণ ও বিহারীলাল সরকার)[৭] এবং অনুকূল ভক্ত ও অন্তরঙ্গগণ তাঁর গদ্য ও প্রতিভা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। (২) দু'-একজন— যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ হয়েও তাঁর সংস্কৃত-ঘেঁষা রীতির তত অনুরাগী ছিলেন না। (৩) এই সময়ের কোন কোন সুখ্যাত ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের ভাষা ও সাহিত্যপ্রতিভার কঠোর সমালোচক ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের দু'জন জীবনীকার—বিহারীলাল সরকার ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গদ্যভাষা সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন তাতে

৬. এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রামমোহন রায় যখন গদ্য লিখতে বলেছিলেন, তখন তাঁকে নিয়ম হেঁকে হেঁকে কোদাল হাতে রাস্তা বানাতে হয়েছিল।...তারপর বিদ্যাসাগর এই কাঁচা ভাষায় চেহারার শ্রী ফুটিয়ে তুললেন। আমার মনে হয় তখন থেকে বাংলা গদ্যভাষায় রূপের আবির্ভাব হ'ল।" (বাংলাভাষা পরিচয়, ১৯৩৮, পৃ. ৫৫) এই 'রূপ', অর্থাৎ style, রীতি, চাল—যাকে এককথায় 'কান্তি' বলতে পারি।

৭. সুবলচন্দ্র মিত্র ইংরেজীতে *Iswar Chandra Vidyasagar—Story of his life and works* রচনা করেন। কিন্তু এটি বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগরের'ই প্রায় প্রতিধ্বনি।

আর বিস্ময়ের কি আছে? বিহারীলাল খানিকটা রক্ষণশীল মত পোষণ করতেন বলে, বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষার খুব প্রশংসা করেছেন।[৮] বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসকার রামগতি ন্যায়রত্ন বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুগত ছিলেন; তাঁর দ্বারা উৎসাহিত ও প্রভাবিত হয়ে বাংলা রচনায় প্রবৃত্ত হন। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর অভিমত অতিশয় যুক্তিপূর্ণ। তিনি বলেছেন, "কেহ কেহ কহেন, 'বিদ্যাসাগরের বংলা রচনানৈপুণ্যবিষয়ে অদ্বিতীয়তা জন্মিয়াছে সত্য, কিন্তু বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনীশক্তি বা মৌলিকতা (originality) নাই—অর্থাৎ অনুবাদ ভিন্ন মূল গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন না।' বিদ্যাসাগর রচিত যে সকল পুস্তকের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কোন-না-কোন পুস্তকের অনুবাদ, মূল গ্রন্থ তাহাদের মধ্যে অল্পই আছে, এ কথা অযথার্থ নহে। কিন্তু এ দ্বন্দ্বে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, বিদ্যাসাগরের রচনা-প্রণালীর প্রাদুর্ভাবের সময়ই বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে অন্ধকারাবস্থা হইতে আলোকে প্রবিষ্ট হইবার প্রথম উদ্যমকাল; ঐ রূপ কালে সকল ভাষাতেই মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক হইয়া থাকে, ইহা এক সাধারণ নিয়ম। বিদ্যাসাগর সে নিয়মের অনধীত হইতে পারেন নাই—সুতরাং তাঁহাকে মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক করিতে হইয়াছে।"[৯] পরবর্তী

৮. বিহারীলাল বিদ্যাসাগরের সংস্কারান্দোলনের পক্ষপাতী না হলেও শকুন্তলার ভাষা সম্বন্ধে স্বীকার করেছেন, "অভিজ্ঞান শকুন্তলের সংস্কৃত যেমন মধুর, এই শকুন্তলার বাঙ্গালা তেমনই মধুর। এক কথায় বলি। অভিজ্ঞান শকুন্তলা পড়িয়া যাহা বুঝি নাই, ইহাতে তাহা বুঝিয়াছি।" (বিদ্যাসাগর, পৃ. ২৭৫)

৯. রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১৩১৭, পৃ. ২৪৭-৪৮

কালেও রজনীকান্ত গুপ্ত,[১০] শিবরতন মিত্র[১১] প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যানুরাগীরা বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির প্রশংসাই করেছেন। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতানুগামিতা, ক্লাসিক বন্ধন, ছোট ছোট বাক্যবিন্যাস, অজস্র কমা-চিহ্নের দ্বারা দীর্ঘ বিলম্বিত বাক্যকে শাসিত করা, এবং সেই ভাবে ক্ষুদ্র বৃহৎ বিরতির দ্বারা ভাষার মধ্যে ছন্দের আভাস প্রভৃতি গুণ ফুটিয়ে তোলা তাঁর সমকালীনও পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যানুরাগীদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু সে যুগে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধের অল্প পরে বিদ্যাসাগরীয় বাংলার বিরুদ্ধে ইংরেজী-শিক্ষিতমহলে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হয়। ইংরেজী ভাষায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা মনে করতেন, বিদ্যাসাগরের ভাষা পুরাতন ধরনের পণ্ডিতীরীতির এক আধুনিক সংস্করণ ছাড়া কিছু নয়। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ বা ঐ ধরনের কাজে এ ভাষার কিছু যোগ্যতা থাকলেও রসসাহিত্য সৃষ্টিতে এর প্রয়োগ অচল। বোধ হয় প্যারীচাঁদ মিত্র এ-বিষয়ে প্রথম বিদ্রোহ করে বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় ১৮৫৪ সালে 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি চটি-আকারের মাসিক পত্র সম্পাদনা করেন, যাতে ধারাবাহিক ভাবে তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাখানি অত্যন্ত সরলভাষায়, প্রায় মুখের কথার ধাঁচে ছাপা হত। কারণ এর প্রচার স্বল্পশিক্ষিত স্ত্রীসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা হয়েছিল। পত্রিকাটি প্রচারিত হলে এবং 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে (১৮৫৮) কলকাতার শিক্ষিত মহলে সাড়া পড়ে যায়। পাঠকগণ এর পর যথাক্রমে 'সাগরী ভাষা' ও 'আলালী ভাষা'-পন্থীরূপে দু'দলে ভাগ হয়ে গেলেন। 'আলালী

১০. রজনীকান্ত গুপ্ত বিদ্যাসাগর বিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ('স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', ১৩০০) বলেছেন, "তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের পিতা না হইলেও স্নেহময়ী মাতার ন্যায় ইহার পুষ্টিকর্ত্তা ও সৌন্দর্য্যবিধাতা, তাঁহার যত্নে গদ্য-সাহিত্যের উন্নতি, পরিপুষ্টি ও সৌন্দর্য সাধিত হয়।"

১১. শিবরতন মিত্র সংকলিত 'অক্ষয়সুধা' (১৩১১), পৃ. ১।৶০ দ্রষ্টব্য।

ভাষা'ও মূলতঃ সাধুভাষা, কিন্তু চালচলন হালকা। কোথাও কোথাও আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ থাকাতে এর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল, সর্বোপরি টেকচাঁদের সরস পরিহাসভঙ্গীও এ ভাষার জনপ্রিয়তার এক প্রধান কারণ।

'আলালী' ভাষাকে কেউ কেউ বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ভাষা এবং বিদ্যাসাগরের ভাষাকে টুলো পণ্ডিতের অচল ভাষা বলে মন্তব্য করতেও কুণ্ঠিত হলেন না। বোধ হয় মাইকেল মধুসূদন স্বাভাবিক রস-বোধের বশে 'আলালী' ভাষার দুর্বলতা ধরে ফেলেছিলেন।[১২] একদা কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাগানবাড়ীতে সুধীজনের সমাবেশে আলালী ভাষা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সেখানে প্যারীচাঁদও উপস্থিত ছিলেন। সকলেই আলালী ভাষার উচ্চ প্রশংসা আরম্ভ করলে মাইকেল মধুসূদন সেই 'বাহবা'ধ্বনির মধ্যে বেসুরো গাইতে আরম্ভ করলেন। তিনি প্যারীচাঁদকে লক্ষ্য করে বললেন,

> "আপনি এ আবার কি লিখিতে বসিয়াছেন? লোকে ঘরে আট-পৌরে যাহা হয় পরিয়া আত্মীয়জনসকাশে বিচরণ করিতে পারে; কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে সে বেশে যাওয়া চলে না। 'পোষাকী' পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই এইখানে। আপনি দেখিতেছি, 'পোষাকী'-র পাট তুলিয়া দিয়া, ঘরে বাহিরে, সভা-সমাজে সর্বত্রই এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহাও কি কখনও সম্ভব?"[১৩]

তখন বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন অপরিচিত ব্যক্তি। সুতরাং তাঁর এ মন্তব্যের প্রতিবাদ করে প্যারীচাঁদ বললেন, "তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে? তবে জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্তিত এই রচনা-পদ্ধতিই

১২. বঙ্কিমচন্দ্র আলালী ভাষার প্রধান 'চাম্পিয়ান' হলেও এ-ভাষা সম্পর্কে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, "গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্বল এবং অপরিমার্জিত।" (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়, 'বাঙ্গালা ভাষা')

১৩. নগেন্দ্রনাথ সোম—মধুস্মৃতি (১৩৬১, ২য় সং), পৃ. ৮২-৮৩

বাঙ্গালা ভাষায় নির্ব্বিবাদে প্রচলিত ও চিরস্থায়ী হইবে!" এর প্রত্যুত্তরে মধুসূদন যা বলেছিলেন, এতদিন পরে মনে হচ্ছে, ভাষার ব্যাপারে তার চেয়ে যুক্তিপূর্ণ কথা কেউ বলতে পারেন নি। মধুসূদন বললেন,

> "It is the language of fishermen, unless you import largely from Sanskrit."[১৪]

আপনার বইয়ের ভাষা তো মেছুনীদের ভাষা। সংস্কৃত থেকে প্রচুর পরিমাণে শব্দসম্পদ গ্রহণ না করলে বাংলা ভাষা যথার্থ সাহিত্যর ভাষা হতে পারবে না।

বিদ্যাসাগর সেই চেষ্টাই করেছেন।

দ্বিতীয় স্তরের (অর্থাৎ যাঁরা বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ হয়েও তাঁর সংস্কৃত-প্রধান ভাষার ততটা অনুরাগী ছিলেন না) প্রতিভূ হিসেবে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের নাম করা যেতে পারে। বিদ্যাসাগরের অশেষ স্নেহভাজন কৃষ্ণকমল কতকটা বঙ্কিমচন্দ্রের মতানুবর্তী হয়ে মনে করতেন, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের গঠনপর্বে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে এ ভাষার স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ করেছেন।[১৫] অথচ প্রথম জীবনে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পদে থাকা কালে ছাত্রসমাজের সম্মুখে কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের ভাষার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন:

> "বিদ্যাসাগরের ভাষার মহৎ গুণ এই যে, উহা বাঙ্গালা প্রদেশের সকল অঞ্চলের লোকই বুঝিতে পারিবে। কলিকাতার চলিত কথায় লিখিলে রাঢ়ের বাহিরে লোকে বুঝিতে পারিবে না।"
> (পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ৪৬)

পরে সম্ভবতঃ তিনি এ-মত পরিত্যাগ করেছিলেন।

তৃতীয় স্তরের আলোচনায় (অর্থাৎ যাঁরা সরাসরি বিদ্যাসাগরের ভাষা

১৪. ঐ, পৃ. ৮৩

১৫. "একদিন বঙ্কিম আমাকে বলিলেন, 'বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ করে বাঙ্গালা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে গেছেন।' আমারও অনেকটা ঐ রকম মত।" (পুরাতন প্রসঙ্গ, নতুন সংস্করণ, পৃ. ৫৬)

ও সাহিত্যপ্রতিভার প্রতিকূলে ছিলেন) আমরা প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করব। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের কিছু পরিচয় আছে, তাঁরা বোধ হয় জানেন যে, নানা কারণে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি ততটা প্রসন্ন ছিলেন না। এক সাহিত্যাকাশে দুই প্রতিভাসূর্যের স্থান সংকুলান হয় না। কাজেই বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যৎকিঞ্চিৎ ঈর্ষাবিদ্বেষ ছিল, যদিও বিদ্যাসাগর এ-ব্যাপারে নিঃস্পৃহ ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে বরং তিনি প্রশংসাই করতেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কিছু বিপরীত ছিল, 'পুরাতন প্রসঙ্গে' কৃষ্ণকমল সেইরকম উল্লেখ করেছেন।[১৬] কিন্তু এ হল সাহিত্যঘটিত মতান্তর। ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন না।

বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রসন্নতার নানা কারণ আছে। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। 'বিষবৃক্ষে' (১১শ পরিঃ) কমলমণিকে লেখা সূর্যমুখীর পত্রে বিধবাবিবাহ-সম্পর্কে উগ্র মন্তব্যে যেন বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত ঝাঁঝ ফুটে উঠেছে।[১৭] বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনও বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে নিরর্থক ও হাস্যকর মনে হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (আষাঢ়, ১২৮০) অতি তীব্র বিষোদ্‌গার করেন।[১৮]

১৬. "তিনি (বিদ্যাসাগর) বঙ্কিমকেও পছন্দ করিতেন না। Matter সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করিতেন না; কিন্তু manner সম্বন্ধে, style সম্বন্ধে, তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল।" (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় সং, পৃ. ৪৫)

১৭. "আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"

১৮. মূল প্রবন্ধের কিছু উগ্রতা কমিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধে' (২য়) "বহু বিবাহ" প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এই ভাষায় অস্ত্র ধারণ করেছিলেন :

অবশ্য পরবর্তীকালে 'বিবিধ প্রবন্ধে' উক্ত 'বহুবিবাহ' শীর্ষক আক্রমণ-মূলক প্রবন্ধটি মুদ্রণের সময় তিনি বিদ্যাসাগর-বিরোধিতার উত্তাপ কিঞ্চিৎ কমিয়ে দিয়েছিলেন, তখন অবশ্য বিদ্যাসাগরের লোকান্তর হয়েছে। আরও নানা কারণে বঙ্কিম-ভক্তদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভক্তদের মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছিল—অবশ্য এ-ব্যাপারে বিদ্যাসাগর জড়িত ছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বরং বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্বেষই বেশী প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। তখন বিদ্যাসাগর বাঙালী-সমাজে শ্রদ্ধার মহনীয় আসনে আসীন, জীবিতকালেই তাঁর ছবি ছাপা হয়ে লোকের ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছিল—সেযুগে আর কোন বাঙালী-সমাজনেতার এ সৌভাগ্য হয় নি। শ্বেতাঙ্গসমাজেও এই পণ্ডিত অতিশয় মান্য ছিলেন। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা তাঁকে বিশেষ সম্মান করতেন, লাটবাহাদুরের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতি ডেপুটি বঙ্কিমের মনে কি প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা সঞ্চারিত করেছিল? যেখানে ইংরেজীনবিশ ডেপুটি-ধড়াচূড়াধারী বঙ্কিমচন্দ্রের যাতায়াত সুগম ছিল না, সেখানে চটিচাদরধারী এই সংস্কৃত পণ্ডিতের অবারিত গতিবিধি নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রকে মনে মনে বিরস করে তুলেছিল। আর তা ছাড়া ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র অনুবাদক ও পাঠ্যপুস্তকলেখক বিদ্যাসাগরকে যে কিঞ্চিৎ কৃপার দৃষ্টিতে দেখবেন তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

"এমত অবস্থায় বহুবিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডন কুইক্‌সোট্‌কে মনে পড়িবে। কিন্তু সে রাক্ষস বধ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষু হইলেও বধ্য। আমরা দেখিয়াছি, এক-একজন বীরপুরুষ, মৃত সর্প বা কুক্কুর দেখিলেই তাহার উপর দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যান; কি জানি, যদি ভাল করিয়া না মরিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় ইঁহারা বড় সাবধানী এবং পরোপকারী। যিনি এই মুমূর্ষু রাক্ষসের মৃত্যুকালে দুই একঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।"
(বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়, বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ২৮৩)

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো স্থিতধী মনীষী ব্যক্তির উক্তি সেই কথাই প্রমাণ করে। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রথম শ্রদ্ধার ভাব ছিল না—তিনি বলিতেন, 'He is only primer maker'—তিনি খানকতক ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন বই তো নয়।"[১৯] রমেশচন্দ্র দত্তের মত-(*Literature of Bengal*) কতকটা এই রকম ছিল।* 'সীতার বনবাসকে'ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ্যে[২০] এবং পরোক্ষে[২১] নিন্দা করেছেন।

---

১৯. দ্রষ্টব্য—চতুষ্কোণ, ভাদ্র, ১৩৭২ (অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য—'বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর')

*১৮৭৭ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের *Literature of Bengal* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে শুধু তাঁর নামের আদ্যক্ষর (Arcydae) ছিল। এতে তিনি অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরকে প্রশংসা করলেও খুব বেশী শ্রদ্ধার্হ স্থান দেন নি। যেমন, "Thus, next to Ram Mohan Rai, Akhai Kumar Datta and Iswar Chandra Vidyasagar are the two great writers to whom the Bengali prose owes its formation. Neither of these two writers has written any thing original or given any evidence of creative intellect or great power of mind. All that they have written are compilations and translations from English and Sanskrit, but yet Bengal will not soon forget those who have enriched the Bengali prose, striven for social reforms, and done more than any other writers for the spread of knowledge all over the country." এ প্রশংসা বাম হস্তের কৃপার দান নয় কি ?

২০. উত্তরচরিতে রামচন্দ্রের ভাবাবেগের অতিরেক বঙ্কিমের পছন্দ হয় নি, সেই প্রসঙ্গে 'সীতার বনবাস' ও বিদ্যাসাগরকে পরোক্ষে খোঁচা দিয়েছেন—"ইহার (উত্তরচরিত) অনেকগুলি কথা সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা আর্য্যবীর্য্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালি বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলেই উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও কোন মান্ধ আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে।" (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম, পৃ. ১৬-১৭)

২১. "তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'কে বলিতেন 'কান্নার জোলাপ'।" (পু. প্রসঙ্গ. পৃ. ৪৫)

১৮৭১ সালে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় (১০৪ সংখ্যক) ছ'খানি বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'Bengali Literature' নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, অবশ্য তাতে লেখক হিসেবে তাঁর নাম ছিল না। প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্যারীচাঁদ সম্বন্ধে প্রশংসামূলক দীর্ঘ আলোচনা করেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে দু-চারটি ভালো ভালো কথা বললেও[২২] স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ দংশন করতেও ছাড়েন নি। যেমন :

> 'He has great literary reputation ; so had Iswar Chandra Gupta ; but both reputations are undeserved, and that of Vidyasagar scarcely less so than that of Gupta. If successful translations from other languages constitute any claim to a high place as an author we admit them in Vidyasagar's case ; and if the compilations of very good primers for infants can in any way strengthen his claim, his claim is strong. But we deny that either translating and primer-making evinces a high order of genious ; and beyond translating and primer-making Vidyasagar has done nothing."

বঙ্কিমচন্দ্রের এ আক্রমণ অযৌক্তিক। বিদ্যাসাগরের ভাষা সম্বন্ধেও তাঁর খরশাণ লেখনী রক্তপাতে কুণ্ঠিত হয় নি :

> "Vidyasagar is not free from the tautology and bombast which always disfigure the writers of the school to which he belongs."[২৩]

২২. "There are few Bengalies now living who have a greater claim to our respect than Pandit Iswar Chandra Vidyasagar."

২৩. ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলি বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ গ্রন্থাবলীর 'English Writings' খণ্ড থেকে গৃহীত হয়েছে।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপে তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষা সম্বন্ধে এই মতই ব্যক্ত করেছেন (উদ্ধৃতি পূর্ব্বে উল্লিখিত)। এই প্রবন্ধ রচনার সাত বছর পরে তিনি 'বঙ্গদর্শনে' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫।১৮৭৮) "বাঙ্গালা ভাষা" নামে যে প্রবন্ধ রচনা করেন, তাতে সংস্কৃত-প্রভাবিত লেখকগোষ্ঠীকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে প্যারীচাঁদের এবং তাঁর অনুগামীদের ভাষাকে মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করেছিলেন। প্রবন্ধের প্রধান আক্রমণ-স্থল হলেন রামগতি ন্যায়রত্ন। তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের অনুগত ভক্ত। তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় গুরুচণ্ডালী ও নানাবিধ বৈয়াকরণ দোষ দেখিয়ে দেন। বঙ্কিমের বিদ্যাসাগর-বিদ্বেষ তখন সাহিত্যসমাজে আর চাপা ছিল না। সুতরাং বিদ্যাসাগর-ভক্ত রামগতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বঙ্কিমের ভাষার ভুল ধরে তাঁর প্রতি কিঞ্চিৎ ঝাল ঝেড়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার জবাব দিতে গিয়ে তাঁর প্রবন্ধে ('বাঙ্গালা ভাষা') রামগতি ন্যায়রত্নকে আক্রমণ করলেও, আক্রমণের আসল লক্ষ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর। যদিও তিনি প্রবন্ধের শেষাংশে বলেছেন, "যদি বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু-প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে"—তবে প্রবন্ধের গোড়ার দিকে তিনি "ফোঁটাকাটা অনুস্বারবাদীদিগের" সংস্কৃতগন্ধী কৃত্রিম বাংলার যে নিন্দা করেছেন, তার উপলক্ষ রামগতি ন্যায়রত্ন, লক্ষ্য স্বয়ং বিদ্যাসাগর ও তাঁর অনুচরবৃন্দ। বিদ্যাসাগরের তিরোধানের পর বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের এই অপ্রসন্ন মনোভাব কিছু হ্রাস পেয়েছিল। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'লুপ্তরত্নোদ্ধার' (১৮৯২) নামে যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকা লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাতে ('বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান') বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে তিনি সর্বপ্রথম প্রসন্নচিত্তে লেখেন :

> "এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও এত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" (শতবার্ষিক বঙ্কিম রচনাবলী, সা. প. সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ. ১৪২)

'তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই'—এই উক্তিতে বোঝা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে পরলোকগত বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধের কাঁটা তুলে ফেলেছিলেন। বিদ্যাসাগর-জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপের সময় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত ও গঠিত বাঙ্গালা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁহারই উপার্জ্জিত সম্পত্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি।"[২৪] এ স্বীকারোক্তির সততায় সন্দেহ করবার কারণ নেই। মতবিরোধের নানা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণের ফলে বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর মন প্রথম দিকে বিরূপ হলেও পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ বিদ্যাসাগরের তিরোধানের পর এই মহাপুরুষের কৃতিত্ব ও প্রতিভার প্রতি তাঁর মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি বোধ হয় এই মতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে, গোড়ার দিকে বাংলা গদ্যের গঠনপর্বে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখালেও এ গদ্যও আদর্শ বাংলা গদ্য নয়। কারণ এর পদবিন্যাস কিছু মন্থর, অসংখ্য উপবাক্যে এর গতি শিথিল এবং দেবভাষার অতিপ্রাধান্যের ফলে এ ধরণের গুরুগম্ভীর স্থবির ভাষা সাধারণ পাঠকের কাছে কিছু দুর্বোধ্য। বঙ্কিমের মতে, বিদ্যাসাগরের ভাষায় যে bombast বা (আলঙ্কারিকের ভাষায় 'অক্ষরডম্বর') আছে, তা বিশেষ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হলেও রস-সাহিত্যে অর্থাৎ কথাসাহিত্যে অচল। এরই প্রতিক্রিয়ার ফলে

২৪ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, পৃ. ১৮৭

'আলালী' ভাষার উদ্ভব হয়, বঙ্কিমচন্দ্র যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। অবশ্য তিনি কিন্তু উপন্যাস রচনায় আলালী-রীতির নিতান্ত লঘু রূপটি গ্রহণ করেন নি। বরং তাঁর রচনার বহু স্থলে বিদ্যাসাগরের অনুরূপ তৎসম শব্দবহুল ভারী ভারী বাক্‌রীতি লক্ষ্য করা যায়। আসল কথা, নিছক আলালী ভাষা বা হুতোমি ভাষা বিশেষ প্রয়োজনেই উদ্ভূত হয়েছিল। সে প্রয়োজনের বাইরে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা সহজ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে এবং শ্যামাচরণ সরকার তাঁর 'বাংলা ব্যাকরণে' (১২৬৭ সালে ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত) সাহিত্যে অবিকল মুখের কথা ব্যবহারের জন্য যতই যুক্তিজাল বিস্তার করুন না কেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যরীতি বিশ্লেষণ করলে তার বিশেষ সমর্থন পাওয়া যাবে না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—বাংলা গদ্যরীতির দুই দিকপাল বাংলা গদ্যের শ্রীসৌন্দর্য সম্পাদনে অজস্র তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ-সম্পর্কে হিসেব নিলে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের সবচেয়ে বড় অপরাধী বলে তাঁরাই সাব্যস্ত হবেন। বাংলা সাহিত্যের গদ্যরীতি শুধু মৌখিক শব্দের (অর্থাৎ তদ্ভব, অর্ধতৎসম ও অন্-আর্য দেশী ভাষা) দ্বারা গড়ে উঠলে এবং এর মূলে সংস্কৃত ভাষার রস সঞ্চারিত না হলে এ-ভাষা পৈশাচী প্রাকৃতের মতো অচিরে লুপ্ত হয়ে যেত, অথবা *patois*-এর পর্যায়ে নেমে যেত। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গঠনের যুগে বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-ভূদেবের[২৫] তৎসম-

২৫. অক্ষয়কুমার দত্ত অনেক সময় দুরূহ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতেন বলে তাঁর এই ধরনের মুদ্রাদোষ নিয়ে কলকাতার সমাজে বেশ হাস্য-পরিহাস প্রচলিত ছিল। "অক্ষয়বাবু যখন বাহ্যবস্তু ও তাহার সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার লিখিবার সময়ে জিগীষা, জুগোপিষা, জিজীবিষা, প্রভৃতি বিভীষিকাপূর্ণ শব্দের সৃষ্টি করিতেছিলেন, তখন শুনা যায়, যে, কলিকাতার শিক্ষিত লোকদের বাড়ীতে ঐ সব শব্দের সঙ্গে 'চিড়্‌টামিষা' প্রভৃতি শব্দ যোগ করিয়া হাসা হাসি হইত।"—অজিতকুমার চক্রবর্তী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৭২৫

ভাষাভঙ্গিমা রচনাকার্যে ব্যবহৃত হয়েছিল বলেই, কিঞ্চিৎ কৃত্রিমতা সত্ত্বেও, বাংলা গদ্যের বনিয়াদ ক্লাসিক দৃঢ়তা লাভ করেছিল। কালে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রসশিল্পীর হাতে পড়ে এ-ভাষার অনভ্যস্ততা হ্রাস পায় এবং এটি আদর্শ গদ্যরীতি হয়ে ওঠে। তার সূচনা বিদ্যাসাগর করেছিলেন বলেই বাংলা গদ্যের রূপকার হিসেবে সর্বাগ্রে তাঁর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৩.

একদা রামমোহন পুঁথিপড়া বাঙালীকে মুদ্রিত গ্রন্থ পড়তে শিখিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে এই গ্রন্থে (পৃ. ১০, পাদটীকা) আমরা দেখিয়েছি যে, কেমন করে গদ্য পড়তে হয়, রামমোহন তাঁর 'বেদান্ত' গ্রন্থের (১৮১৫) "অনুষ্ঠান" অনুচ্ছেদে তার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আলোচনার সুবিধার জন্য সমগ্র উক্তিতিটি এখানে উল্লেখ করা গেল :

> "বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষমতে করিতে উচিত হয়। যে ২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন, তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে। ইহার কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না।"

১৮১৫ সালের দিকে রামমোহনকে এইভাবে বাঙালী পাঠককে নামপদ ও ক্রিয়ার অন্বয় শেখাতে হয়েছে। কিন্তু তার তিরিশ বছরের মধ্যে এত সাময়িক পত্র, প্রচারপুস্তিকা, স্কুল-পাঠশালার পাঠ্য বই প্রকাশিত হতে লাগল যে, সাধারণ পাঠকেও গদ্যের অন্বয় সম্বন্ধে রীতিমতো অভিজ্ঞ হয়ে উঠল। কিন্তু তখনও বাংলা গদ্য শুধু ভাব-

প্রকাশের বাহনের পদ পেয়েছে। তখনও তার উচ্ছৃঙ্খল, অপরিমিত, অনভ্যস্ত পদবিন্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয় নি, পাঠকের শ্রুতি-যন্ত্রও সে বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ছিল না। প্রাগ্‌-বিদ্যাসাগরীয় বাংলা গদ্যের চলন ছিল, কিন্তু চাল ঠিক হয় নি। নৃত্যের যেমন বাঁধা মাপা ছন্দ আছে, চলার ঠিক তেমন গাণিতিক হিসাব করা ছন্দ নেই বটে, কিন্তু তারও একটা শ্রী-ছাঁদ আছে। গদ্যেরও যে-একটা সুর-তাল-যতি-প্রবহমানতা আছে, বোধ করি বিদ্যাসাগরের পূর্বে সে সম্বন্ধে বড় কেউ অবহিত হন নি। তাঁর পূর্বে অনেকগুলি সাময়িক পত্রে নানা আলোচনা নিবন্ধাদি নিয়মিত প্রকাশিত হত, কাগজে কাগজে সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে তর্কাতর্কিও চলত প্রচুর। দেবেন্দ্র-নাথের উদ্যোগে এবং অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় সেযুগের শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখনও সে ভাষার চরিত্র গড়ে উঠে নি। বিদ্যাসাগর তারও তিন-চার বছর পরে বাংলা গদ্যরচনা আরম্ভ করেন। অবশ্য অক্ষয়কুমারের গদ্যরচনার অনেকটা তিনিই সংশোধন করে দিতেন। গোড়ার দিকে অক্ষয়কুমারের গদ্যে খানিকটা ইংরেজী ধরনের কৃত্রিমতা ছিল, বিদ্যা-সাগরের হস্তক্ষেপের ফলে সেগুলি অনেকাংশে বিদূরিত হয়।[২৬] এর ফলে তাঁর ভাষাটি বিজ্ঞান ও দার্শনিক আলোচনার যথার্থ বাহন হয়ে ওঠে। অবশ্য সে ভাষায় তখনও বিদ্যাসাগরের মতো রং লাগে নি,

২৬. বিদ্যাসাগর যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধনির্বাচক কমিটীতে ছিলেন, তখন সম্পাদক অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধের ভাষা সংশোধন করে দিতেন। একথা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (পুরাতন প্রসঙ্গ, নতুন সং, পৃ. ৩১) এবং অক্ষয়কুমারের জীবনীকারেরাও (মহেন্দ্রনাথবিদ্যানিধি ও নকুড় চন্দ্র বিশ্বাস) স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে রাজনারায়ণেরও ('বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা') সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। সর্বোপরি স্বয়ং অক্ষয়কুমার তাঁর 'বাহ্যবস্তু'র ভূমিকায় বিদ্যাসাগরের কাছে সে ঋণ স্বীকার করেছেন।

লাবণ্য সঞ্চারিত হয় নি।[২৭] নিম্নে উদ্ধৃত অক্ষয়কুমারের এই রচনাটুকু লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ

> "আমরা যাহাকে স্নেহ, প্রীতি বা ভক্তি করিয়া থাকি, তাহার চরিত্রের বিষয় পর্যালোচনা করিবার সময়ে দোষ-ভাগকে লঘু ও গুণ-ভাগকে অধিক বলিয়া বোধ হয়। স্নেহপাত্র, প্রেমাস্পদ ও ভক্তি-ভাজনকে স্মরণ হইবামাত্র অন্তঃকরণ, স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া একপ্রকার পক্ষপাত উপস্থিত করে যে, তাহাদিগের দোষ-ভাগকে দোষ বলিয়াই স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহাদের দোষ সমুদায় লক্ষিত হয় না, গুণভাগ মাত্রই দৃষ্টিপথে পতিত হয়।"

তাঁর এ-রচনায় ব্যক্তিত্বের সিলমোহর নেই। এ রচনা ভূদেব বা রাজেন্দ্র-লাল--যে-কোন একজন লেখকের লেখনি-নিঃসৃত হতে পারত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই রচনায় তাঁহার ব্যক্তিত্বের অদৃশ্য স্বাক্ষর রয়েছে ঃ

> "ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণবিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্ত্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে-ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী

২৭. বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করে বিহারীলাল যথার্থই বলেছেন :"অনুবাদে এবং লিপিচাতুর্যে অক্ষয়কুমার দত্তেরও কৃতিত্ব কম নহে। ভাষার পরিশুদ্ধি ও সুপদ্ধতি সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ; তবে বিদ্যাসাগরের ন্যায় অক্ষয়কুমারের ভাষায় বৈচিত্র্য নাই। এ ভাষায় খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পা, চুট্‌কী সবই আছে। অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা একসুরে বাঁধা, কিন্তু ইহাতে রাগালাপের বৈচিত্র্য নাই। (বিদ্যাসাগর, পৃ. ১৭৯)

হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"

এই অংশ থেকে কোন-একটি বিশেষ ব্যক্তির উষ্ণ হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যাবে। অবশ্য অক্ষয়কুমারের রচনাংশটুকু নিতান্তই তত্ত্বকথা আর বিদ্যাসাগরের রচনাটি ব্যক্তিরসে আর্দ্র। কাজেই দুইয়ের স্বাদ ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এ রচনায় শব্দবিন্যাস ও উপবাক্য গঠনে যে পরিচ্ছন্নতা, পরিমাণসামঞ্জস্য ও balance লক্ষ্য করা যায়, তাকেই বলে স্টাইল—লিখবার এমন একটা বিশেষ ভঙ্গিমা যার থেকে আমরা ব্যক্তিবিশেষের চিত্তের স্পর্শ পাই। অক্ষয়কুমারের রচনায় তার বিশেষ চিহ্ন নেই। সে যাই হোক, প্রথম দিকের রচনা বিদ্যাসাগর সংশোধন করে দিতেন বলেই অক্ষয়কুমার অনুবাদে ও অন্যান্য মননশীল রচনায় অনেকটা সফল হয়েছিলেন।[২৮]

৪.

বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) থেকে শুরু করে পরবর্তী কালের প্রচারপুস্তিকা ও মৌলিক রচনাগুলি বিচার করলে দেখা যাবে, তাঁর ভাষা ক্রমে ক্রমে সরলতা, স্নিগ্ধতা ও প্রসন্নতা লাভ করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ পরের রচনাগুলিতেই যেন বেশী উপলব্ধি করা যায়। এমন কি বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন এবং বহুবিবাহ-নিরোধ সংক্রান্ত প্রচারপুস্তিকাগুলিতেও এমনি একটা ঋজু

২৮. অবশ্য কৃষ্ণকমল এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে "কিন্তু আমার মনে হয় না যে, অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। দু'জনের style, ভাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।" (পুরাতন প্রসঙ্গ, নতুন সংস্করণ, পৃ. ৩১) কৃষ্ণকমলের এ অভিমত যুক্তিসিদ্ধ নয়। কারণ স্বয়ং অক্ষয়কুমারই স্বীকার করেছিলেন যে, বিদ্যাসাগরের সংশোধনের দ্বারা তিনি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন। (দ্রঃ 'বাহ্যবস্তু'র ভূমিকা)

ব্যক্তিত্বের স্পষ্টতা লক্ষ্য করা যাবে। তাঁর গদ্যরীতির বৈচিত্র্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল প্রভাবের দিনেও সাধারণ বাঙালী পাঠককে অভিভূত করেছিল। বাল্য ও কৈশোরে বাঙালী পড়ুয়ারা বিদ্যাসাগরের পাঠ্যগ্রন্থ থেকেই ভাষা শিক্ষা করেছে, বিবিধবিষয়ক তথ্যাদিও তারা ঐ সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা থেকেই পেয়েছে। যৌবনকালে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাদি তাদের হাতে আসবার পূর্বেই শিক্ষিত বাঙালীর বাংলা গদ্যরীতি বিদ্যাসাগরের 'বেতাল', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'বোধোদয়','কথামালা','আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি পাঠে সুগঠিত হয়েছে। এই সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের পাঠশালা, বাংলা স্কুল, মধ্য-ইংরেজী স্কুল ও নর্ম্যাল স্কুলে বহুলভাবে প্রচারিত ছিল। তাই সাধারণ-শিক্ষিত বাঙালীর লিখনরীতি বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের ভাষাদর্শ অবলম্বনেই গড়ে উঠেছে। পরে পরিণত বয়সে অন্যান্য সাহিত্যকারের রচনার সঙ্গে তার পরিচয় হলেও তার লেখবার ভাষায় বিদ্যাসাগরের প্রভাবই সুমুদ্রিত হয়েছিল। রামমোহন বাঙালী পাঠককে বৈয়াকরণ রীতিতে বাংলা গদ্য পড়তে শিখিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তদতিরিক্ত করেছিলেন, শিক্ষিত সমাজকে সুচারুভাবে বাংলা গদ্য লিখতে শিখিয়েছিলেন।

তাঁর বাক্‌রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যটি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শিল্পীর রসদৃষ্টির সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৩০২ সনে প্রকাশিত 'চারিত্র-পূজা' পুস্তিকায় তিনি যে-ভাবে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন, এখনও পর্যন্ত সেই পদ্ধতিই চলে আসছে। তাঁর মন্তব্য থেকে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি-সম্পর্কে এই তথ্যগুলি নিষ্কাশিত করা যেতে পারে :

> ১. "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।...তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।"
>
> ২. "তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।"

৩. "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।" ('চারিত্রপূজা')

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ যথার্থ রসিকের রসদৃষ্টিজাত। তাঁর মতে গদ্য শুধু ভাবপ্রকাশের বাহন নয়, আটপৌরে কাজের ভাষামাত্র নয়। তার মধ্যেও শিল্পশ্রী আছে, যা কবিতার মতো রসোদ্রেকে সমর্থ। সেই ধরনের গদ্য যিনি রচনা করতে পারেন, তিনি শুধু গদ্যলেখক নন; তখন তাঁকে যথার্থ গদ্যশিল্পী বলতে হবে। বিদ্যাসাগরের গদ্যে সর্বপ্রথম বোধের অতীত একটা রসার্দ্র শিল্পশ্রী লক্ষ্য করা গেল। তাঁর পূর্বে দৈনন্দিন কাজে-কর্মে গদ্যভাষা প্রচুর ব্যবহার হত, কিন্তু তখনও তার কণ্ঠে সুর লাগে নি। সেই সমস্ত বাক্‌পুঞ্জকে অজস্র বিরতি চিহ্নের দ্বারা শাসিত ও সংযত করে বোধের ভাষাকে রসের ভাষায় পরিণত করার প্রথম গৌরব বিদ্যাসাগরের প্রাপ্য। রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত অতিশয় যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তিনি আর একটু অনুসন্ধান করলে দেখতে পেতেন, বিদ্যাসাগরের পূর্বে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এবং গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের রচনার অনেক স্থলে শৃঙ্খলা ও পরিমাণ-সামঞ্জস্য ছিল—গদ্যভাষার যেটি প্রধান লক্ষণ। কিন্তু তখনও এঁদের রচনা কোন-একটা বিশেষ রীতি অবলম্বন করে নি। এঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের সহজাত শিল্পবোধ ছিল, কিন্তু তিনিও এর স্বরূপ সম্বন্ধে ততটা অবহিত ছিলেন না।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের বিশৃঙ্খলা, পৃথুলতা ও নিয়মহীন জনতাকে কমা চিহ্নের দ্বারা সুবিভক্ত এবং উপবাক্যের দ্বারা সুবিন্যস্ত ও অন্বয়ী-ভূত করে, ভাবানুসারে বাক্যের বহর বাড়িয়ে কমিয়ে বাংলা গদ্যের অঙ্গে লাবণ্য এবং চলনে সুসমঞ্জস ছন্দের পরিমিতি নির্দেশ করেন। যে রীতিতে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের বিশৃঙ্খল জনতাকে সুসজ্জিত সেনাবাহিনীতে পরিণত করেন, রবীন্দ্রনাথ তার বৈয়াকরণ স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। কবিগুরু ব্যাকরণকে কিছু পাশ কাটিয়ে চললেও

ব্যাকরণের পুঁথিগত তত্ত্ব তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু ব্যাকরণের মূল লক্ষ্য যে ভাষার লাবণ্য আবিষ্কার, সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

১. "বাংলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া,

২. "তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া,

৩. "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে,

৪. "তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।" ('চারিত্রপূজা')

এখানে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মতে বিদ্যাসাগর পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যের সমাসের আড়ম্বর কমিয়ে দেন, উপবাক্যগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং তাকে শুধু প্রয়োজনের 'কেজো' ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সুন্দর, মার্জিত ও শোভন শ্রী দান করার দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যার পর রবীন্দ্রনাথ আর একটি বাক্যে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির নূতনত্ব নির্দেশ করেন :

১. "গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া,

২. "তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া,

৩. "সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া,

৪. "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।" ('চারিত্রপূজা')

এখানে রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট করে বিদ্যাসাগরের গদ্যের মূল বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে 'ধ্বনিসামঞ্জস্য-স্থাপন'— মূলতঃ ধ্বনিতত্ত্বের (phonology) অন্তর্ভুক্ত হলেও এর লক্ষ্য— রূপতত্ত্বের (morphology) সামঞ্জস্য। কিন্তু "সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য-সংযম" না থাকলে শব্দপরম্পরার অন্তরালবর্তী সামঞ্জস্য ধরা

পড়ে না। সর্বোপরি গদ্যের মধ্যেও একটি ছন্দঃস্রোত আছে, যা হয়তো প্রথমে ঠিক লক্ষ্য করা যায় না। যথার্থ গদ্যশিল্পীর কানে সেই স্রোতোধ্বনি ধরা পড়ে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ গদ্যের মধ্যে প্রবাহিত ছন্দ সম্পর্কে বলেছেন, "গদ্যই হোক পদ্যই হোক রসরচনা-মাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত।"[২৯] আর একস্থানে এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "গদ্য-সাহিত্যে এই যে বিচিত্রমাত্রার ছন্দ মাঝে-মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়, সংস্কৃত বিশেষতঃ প্রাকৃত আর্যা প্রভৃতি ছন্দে তার তুলনা মেলে। সে-সকল ছন্দে সমান পদক্ষেপের নৃত্য নেই, বিচিত্র-পরিমাণ ধ্বনিপুঞ্জ কানকে আঘাত করতে থাকে। যজুর্বেদের গদ্যমন্ত্রের ছন্দকে ছন্দ বলেই গণ্য করা হয়েছে। তার থেকে দেখা যায়, প্রাচীনকালেও ছন্দের মূল-তত্ত্বটি গদ্যে পদ্যে উভয়েই স্বীকৃত। অর্থাৎ যে-পদবিভাগ বাণীকে কেবল অর্থ দেবার জন্যে নয়, তাকে গতি দেবার জন্যে, তা সমমাত্রার না হলেও তাতে ছন্দের স্বভাব থেকে যায়।"[৩০]

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয়, কবিতার ছত্রে যে বিরতি ('যতি') থাকে তাকে বলে breath pause বা শ্বাসযতি। সুনিয়ন্ত্রিত শ্বাসপ্রশ্বাসের ওঠাপড়া থেকে কবিতার পদবিভাগ হয় সমমাত্রিক। গদ্যের বিরতিকে ('ছেদ') বলে sense pause বা ভাবযতি। অর্থাৎ ভাব অনুসারে (অর্থানুসারে) বিরাম—তাতে মাত্রাসমকতার প্রয়োজন নেই। তবে কবিতার মতো গদ্যে মাত্রাসমকতা (অর্থাৎ প্রতি পর্বে সমমাত্রা) না থাকলেও তার বিরতিগুলির মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্য থাকে যে তার, মধ্যে কিঞ্চিৎ cadence বা দোল উপলব্ধি করা যায়। এখানে বিরতি ভাগ করে একটি বিদ্যাসাগরের, আর একটি রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত গদ্যরচনার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে:

২৯. "গদ্যছন্দের প্রকৃতি" (শতবার্ষিক রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৮৫)
৩০. ঐ, পৃ. ২৭৩

লক্ষ্মণ বলিলেন/আর্য/এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি॥ এই গিরির শিখরদেশ/আকাশপথে সততসঞ্চরমাণ/জলধর মণ্ডলীর যোগে/নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত॥ অধিত্যকা/প্রদেশ/ঘনসন্নিবিষ্ট বিভিন্ন বনপাদপসমূহে/আবদ্ধ থাকাতে/সতত স্নিগ্ধ/শীতল ও রমণীয়॥ পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী/তরঙ্গ বিস্তার করিয়া/প্রবলবেগে গমন করিতেছে॥

আমরা প্রত্যেকে/নির্জন গিরিশৃঙ্গে/একাকী দণ্ডায়মান হইয়া/উত্তরমুখে চাহিয়া আছি॥ মাঝখানে/আকাশ এবং মেঘ/এবং সুন্দরী পৃথিবীর/রেবা সিপ্রা অবন্তী উজ্জয়িনীর/সুখ সৌন্দর্য ভোগ ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা॥ যাহাতে মনে করাইয়া দেয়/কাছে আনিয়া দেয় না/আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে/নিবৃত্তি করে না॥ দুটি মানুষের মধ্যে/এতটা দূর॥[৩১]

উল্লিখিত উদ্ধৃতি দুটির বিরতিগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, চিহ্নিত স্থানে বিরতি ঘটেছে অর্থানুসারে। কিন্তু তার মধ্যেও (বিরতিগুলি সম-মাপের না হলেও) প্রবহমান তরঙ্গধ্বনি উপলব্ধি করা যাবে। অবশ্য অদীক্ষিত শ্রুতিযন্ত্রে তা ধরা পড়বে না। বিদ্যাসাগর তাঁর সমস্ত রচনায় অতিমাত্রায় 'কমা'-চিহ্ন প্রয়োগ করে গদ্য পড়বার সেই তরঙ্গ নির্দেশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিতে সেই বৈশিষ্ট্য আরও সুরময় হয়েছে। এবার আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক :

"যে মহারাষ্ট্র সেনানী শিবাজী কর্ত্তৃক আহত এবং পরাভূত হইয়া দুর্গবহির্ভাগে অবতারিত হইয়াছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ প্রাণ-সম্বন্ধ বর্জ্জিত হয়েন নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া নিজ শিরস্ত্রাণ-বস্ত্র ছিন্ন করতঃ ক্রমে ক্রমে সমুদায় ক্ষতভাগ বন্ধন করিলেন। এবং তদ্দ্বারা শোণিতস্রবণ নিবারণ হইলে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া রহিলেন।"[৩২]

৩১. একটি দাঁড়িচিহ্নের দ্বারা স্বল্প বিরতি এবং দুই দাঁড়িচিহ্নের দ্বারা ঈষৎ দীর্ঘ বিরতি নির্দেশ করা হয়েছে।

৩২. ভূদেব মুখোপাধ্যায়—ঐতিহাসিক উপন্যাস, ৩য় অধ্যায়

ভূদেবের এই অংশে অর্থের কোন ব্যাঘাত হয় নি, উপবাক্যাদির ব্যাকরণ-গত অন্বয়ও ত্রুটিজনক নয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের গদ্যের মতো এখানে আরোহণ-অবরোহণ বড় একটা লক্ষ্য করা যায় না। বিদ্যাসাগর যখন আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন :

"তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায় ; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না ; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না ; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসার-তরুর কি বিষময় ফলভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয় ! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদবিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম ; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।"[৩৩]

তখন ছোট ছোট উপবাক্যগুলি ভাবাবেগের দীর্ঘনিশ্বাসে তাঁর করুণা-কাতর হৃদয়টিকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে ছেড়ে দিলে এই ধরনের আবেগব্যাকুল ভাষা, যা হৃদয়ের উৎসমুখ থেকে উৎসারিত হয়, সে-যুগের আর কেউ এ রকম সাত্ত্বিক ভাষা সৃষ্টি করতে পারেন নি। সাধারণতঃ ভাবব্যাকুল রচনার উপবাক্যে পরিমাণসামঞ্জস্য কিছু ক্ষুণ্ণ হয়। যেমন—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম', কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাতচিন্তা', 'নিশীথচিন্তা', চন্দ্রনাথ বসুর কয়েকটি ব্যক্তিগত রচনা। আবেগার্দ্র ও ব্যক্তিধর্মী গদ্যে সংযম রক্ষা করা সাধারণ লেখকের পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর তার ব্যতিক্রম কারণ তাঁর হৃদয় আবেগব্যাকুল হলেও কান ভাবযতির বিরামসামঞ্জস্য সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ ছিল।

---

৩৩. 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', ২য়।

'প্রভাবতী সম্ভাষণ' নামে তাঁর ক্ষুদ্র রচনাটি নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাঁর মৃত্যুর পর দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মাতামহের কাগজপত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে এটি আবিষ্কার করেন। প্রভাবতী নামে একটি ক্ষুদ্র বালিকার মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর যে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন, এ-রচনায় সেই মর্মান্তিক বেদনা ভাষা পেয়েছে। এখানে লক্ষ্য করা যাবে, যেখানে আবেগের অতি-উৎসারই রচনায় একমাত্র অভিপ্রায় এবং তার দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত বেদনার প্রশমন (*Catharsis*) লেখকের মূল উদ্দেশ্য, সেখানেও তাঁর ভাষা ভাবাবেগে এলো-মেলো হয়ে পড়ে নি।[৩৪] যথা—

> "বৎসে! কিছুদিন হইল, আমি, নানা কারণে, সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ভিন্ন, আর কোন বিষয়েই, কোন অংশে, কিঞ্চিন্মাত্র সুখবোধ বা প্রীতিলাভ হইত না। তুমি আমার সেই এক পদার্থ ছিলে। ইদানীং একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমার সর্ব্বশরীর, তৎক্ষণাৎ, যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের, এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবণের কার্য্য করিতেছিলে। অধিক আর কি বলিব, ইদানীং তুমিই আমার

৩৪. এটি তিনি নিজের জন্যই লিখেছিলেন, পাঠকসমাজে প্রকাশের জন্য নয়। এটি বিরলে পড়ে দুঃখের দিনে সান্ত্বনা পেতে চাইতেন। সুতরাং এর মধ্যে সাজ-সজ্জা ও পারিপাট্যের অভাব থাকলে বিস্ময়ের কারণ থাকত না। কিন্তু সুরে-তালে বাঁধা বিদ্যাসাগরের ভাষা আপনা-আপনি শিল্পের সংযম স্বীকার করে নিয়েছে।

জীবনযাত্রার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিলে।" (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ৪র্থ, পৃ. ৪২৫)

এভাষা গৈরিক বেদনায় উদ্বেল, রক্তাক্ত হৃদয়ক্ষত এতে উদ্‌ঘাটিত; কিন্তু ভাবাবেগের অসংযত পিচ্ছিলতা এর মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত। শিল্পীর বড় লক্ষণ—সংযম। বিদ্যাসাগর নানা ক্ষেত্রে নানা ধরনের গদ্য লিখেছিলেন, কিন্তু কোথাও শিল্পীর সংযম থেকে ভ্রষ্ট হন নি।

৫.

পরিশেষে আমরা বিদ্যাসাগরের গদ্য সম্পর্কে আর একটি কথার অবতারণা করে আলোচনায় ছেদরেখা টানব। সে-যুগে বঙ্কিমচন্দ্র এবং আরও অনেকে বিশ্বাস করতেন, যথার্থ গদ্যশিল্পীর প্রথম গৌরব বিদ্যাসাগরের নিশ্চয়ই প্রাপ্য। সংস্কৃতের বাঁধন দিয়ে তিনি বাংলা গদ্যকে তার জাতিকুলেই ফিরিয়ে এনেছেন। ইংরেজীওয়ালারাই যদি বাংলা গদ্যের একমাত্র সংস্কর্তা হতেন, তা হলে না জানি কত অনর্থ সৃষ্টি হত। হয়তো বাংলা গদ্য একপ্রকার উৎকট 'বাংলেংরেজী' ভাষা হয়ে দাঁড়াত—যার সঙ্গে জাতির কোনও প্রকার যোগ থাকত না। আমাদের পরম সৌভাগ্য, বাংলা গদ্যের লালনের ভার বিদ্যাসাগর নিয়েছিলেন।

কিন্তু এ-যুগেও (এবং সে-যুগেও) অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এ-কথাও মনে করেন যে বিদ্যাসাগরের গদ্য নিতান্তই পণ্ডিতী গদ্য—কিছু গুরুভার, কিছু মন্থরগতি। এর দ্বারা আধুনিক রসসাহিত্য, বিশেষতঃ কথাসাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না—কারণ এই পোষাকী সংস্কৃতগন্ধী কৃত্রিম ভাষার সঙ্গে আধুনিক জীবনের যোগ বড় অল্প। কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থগুলি অনুধাবন করলে দেখা যাবে, বিদ্যাসাগরের মূল অবলম্বন কিঞ্চিৎ সংস্কৃতগন্ধী সাধুভাষা হলেও তা 'কোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদী'দের অমরকোষধৃত বিস্বাদ খেচরান্ন নয়।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার উপর আপনার style গঠিত করিয়াছিলেন, তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা নহে; সেই সময়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা কথোপকথনে যে-ভাষা ব্যবহার করিতেন, সেই ভাষাই বিদ্যাসাগরের রচনার বনিয়াদ" (পু. প্র. পৃ. ২৮)। কৃষ্ণ-কমলের এ অভিমত, অন্ততঃ এর প্রথমাংশ অনেকটা সত্য। সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা-ভঙ্গিমা বরং রামমোহন তাঁর বিচারবিতর্ক-সংক্রান্ত পুস্তিকায় ব্যবহার করেছিলেন। ইতিপূর্বে (প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৪) আমরা বলেছি যে, যে-গদ্যভাষা খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী থেকে নানা কাজেকর্মে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল, পুরাতন পুঁথির মধ্যে যে-গদ্যভাষার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে তা আসলে পুরাতন পয়ার ছন্দেরই প্রকারভেদ মাত্র। পয়ারের মতো স্থিতিস্থাপক ও শোষক ছন্দকে অনেকটা বাড়ান যায়। প্রাচীন বাংলা গদ্যের মূলে পয়ারের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। বিদ্যাসাগর পূর্বপ্রচলিত গদ্যকেই (কেরীসম্প্রদায় যার বিশেষ খোঁজ-খবর রাখতেন না) মেজে ঘষে নতুন রূপ দিয়েছেন—তাঁর গদ্য অভূতপূর্ব কিছু নয়। দীর্ঘকাল ধরে বাঙালীসমাজ যে গদ্যের সঙ্গে পরিচিত, এ তারই একটি পরিশীলিত রূপ।

কৃষ্ণকমল তাঁর মন্তব্যের দ্বিতীয়াংশে বলেছেন যে, বিদ্যাসাগর তাঁর কালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের মৌখিক ভাষার ওপর তাঁর রচনাশৈলী দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁর এ মন্তব্যও বোধ হয় ধোপে টিঁকবে না। সে-যুগের ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা বিচার-বিতর্কে যে-ভাষা ব্যবহার করতেন, তার কাঠামো বাংলা, কিন্তু ভঙ্গিমা সংস্কৃতের ন্যায়শাস্ত্রের পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষের ছাঁদে বাঁধা। তাঁদের আলাপের ভাষা[৩৫] সম্পর্কে

৩৫. সে-যুগে এই ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায় বিদ্যাসাগরের গদ্যের ওপর আদৌ অনুকূল ছিলেন না, কারণ বিদ্যাসাগরের ভাষা সহজেই বোঝা যায়। এ-বিষয়ে রামগতি ন্যায়রত্ন একটি কৌতুককর গল্প বলেছেন, "আমাদের জানা আছে যে, একসময় কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন স্কুলের পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালায় লেখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপক-দিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না,—'খদির' বলিতেন ; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—শর্করা বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্যই'-ই বলিতেন, কদাচ কেহ 'ঘৃতে' নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না,— 'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না,—'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল।[৩৬] বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যায়, বিদ্যাসাগর এই ধরনের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের আভিধানিক কৃত্রিম ভাষা কখনও অনুসরণ করেন নি ; বিশেষতঃ তিনি 'টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশ'-দের ওপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণকমলের মন্তব্যের শেষাংশ তথ্যসঙ্গত নয়। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি পূর্বপ্রচলিত বাংলা গদ্যের কাঠামোর ওপর গঠিত ; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর শিল্পী মনের সংযম, সুর, তাল।

বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি কেবলমাত্র কি শাস্ত্রাদিমূলক polemic রচনার উপযুক্ত ? শুধু তাতে অনুবাদ বা পাঠ্যপুস্তক রচনাই চলতে পারে ? তাতে কি রসসাহিত্যের কলেবর গড়ে উঠতে পারত না ? তাঁর যাবতীয়

একজন অধ্যাপক অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্বক কহিয়াছিলেন—'এ কি হয়েছে !—এ-যে 'বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা' হয়েছে !—এযে অনায়াসে বোঝা যায় !" ('বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষক প্রস্তাব')

৩৬. 'লুপ্তরত্নোদ্ধার'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা (বঙ্কিম শতবার্ষিক গ্রন্থাবলী, বিবিধ, পৃ. ১৪২)

গ্রন্থ মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, সাধুরীতি তাঁর অবলম্বন হলেও সে ভাষার মধ্যে নানা বৈচিত্র্য আছে, আলোছায়ার ইঙ্গিত আছে। এখানে এই ধরনের গদ্যাংশের নমুনা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

১. বিবৃতিমূলক সাধুরীতি :

(ক) "যমুনাতীরে জয়স্থল নামে এক নগর আছে। তথায় কেশব নামে এক পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের, মধুমালতী নামে এক পরমাসুন্দরী দুহিতা ছিল। কালক্রমে মধুমালতী বিবাহ-যোগ্যা হইলে, তাহার পিতা ও ভ্রাতা উভয়ে উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণে তৎপর হইলেন।" (বেতাল)

(খ) "অতি পূর্ব্বকালে, ভারতবর্ষে, দুষ্মন্ত নামে সম্রাট ছিলেন। তিনি, একদা, বহুতর সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে, মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। একদিন, মৃগের অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, রাজা শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। হরিণশিশু, তদীয় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে, দ্রুতবেগে, পলাইতে আরম্ভ করিল।" (শকুন্তলা)

এখানে লক্ষণীয়, দুটি অংশই ছোট ছোট উপবাক্যের দ্বারা গঠিত, দুরূহ শব্দ নেই বললেই চলে (দ্বিতীয় নমুনার 'সমভিব্যাহারে' ছাড়া) পরিচ্ছন্ন, তরঙ্গায়িত বহমান ভাষার দৃষ্টান্ত হিসেবে এ দুটি নমুনা আদর্শ বলে পরিগণিত হতে পারে। বিদ্যাসাগর বিবৃতিমূলক গদ্যরচনায় আগাগোড়া এই ভঙ্গিমাই ব্যবহার করেছেন। এ-কথা স্বীকার করতে হবে, পরবর্তীকালের বাংলা সাধু গদ্যরীতি এই ভঙ্গিমাকেই অনুসরণ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তার ওপর মৃত্তিকা লেপন করে ভাষার ঐশ্বর্যবৃদ্ধি করেন, রবীন্দ্রনাথ তার 'উদ্বর্তন' ও অঙ্গরাগ করে দেন। প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর গুণগ্রাহীরা কলকাতার ভদ্রজনের মুখের ভাষাকে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র বাহন বলে (চলিতভাষা) প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পরেও দীর্ঘকাল বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষাই সমগ্র

বাংলার সাহিত্যভাষা বলে গৃহীত হয়েছে। সম্প্রতি অবশ্য তার সে অসপত্ন আসন টলে উঠেছে।

২. আবেগমূলক ভাষা :

> "হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়জীবিতে! হা অরণ্যবাস-সহচরি! পরিণামে তোমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নের অগোচর। তুমি এমন দুরাচারের, এমন নরাধমের, এমন হতভাগ্যের হস্তে পড়িয়াছিলে, যে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তেও, তোমার ভাগ্যে সুখভোগ ঘটিয়া উঠিল না। তুমি, চন্দন তরুবোধে দুর্ব্বিপাক-বিষবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্রগুণে অধম; নতুবা, বিনা অপরাধে, তোমায় বিসর্জন দিতে উদ্যত হইব কেন?" (সীতার বনবাস)

এখানে খানিকটা ভবভূতিকে অনুসরণ করতে হয়েছে বলে উক্তির গোড়ার দিকে বেদনাদীর্ণ রামের আক্ষেপোক্তি কিছু দীর্ঘবিলম্বিত হয়ে গেছে বটে, কিন্তু তার পরের অংশে ভাষাভঙ্গিমার সংযম ক্ষুণ্ণ হয় নি।

৩. বিতর্কমূলক সিদ্ধান্তের ভাষা :

> "স্ত্রী মরিলে, অথবা বন্ধ্যা প্রভৃতি স্থির হইলে, পুরুষের পক্ষে যেমন পুনরায় বিবাহ করিবার অনুজ্ঞা আছে, পুরুষ মরিলে, অথবা ক্লীব প্রভৃতি স্থির হইলে, স্ত্রীর পক্ষেও সেইরূপ পুনরায় বিবাহ করিবার অনুজ্ঞা আছে। কৃতদার ব্যক্তিকে বিবাহ করা, স্ত্রীর পক্ষেও যেমন অপ্রশস্ত কল্প হইতেছে, বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করাও, পুরুষের পক্ষে সেইরূপ অপ্রশস্ত কল্প হইতেছে। ফলতঃ শাস্ত্রকারেরা, এ সকল বিষয়ে, স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে, সমান ব্যবস্থাই করিয়াছেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, পুরুষজাতির অনবধান দোষে, স্ত্রীজাতি নিতান্ত অপদস্থ হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের ইদানীন্তন স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।"

('বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', দ্বিতীয়)

এখানে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবাক্য মান্য করেছেন, কিন্তু কেবল শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি। মানুষের কল্যাণের সঙ্গে শাস্ত্রের যতটুকু যোগ আছে, এবং শাস্ত্রবাক্য যেখানে যুক্তিবিরোধী নয়, সেখানেই শুধু তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়করূপে মেনে নিয়েছেন। এই ধরনের যুক্তিকেন্দ্রিক ঋজু সিদ্ধান্ত বিদ্যাসাগরের চরিত্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বিধবাবিবাহ-প্রবর্তক ও বহুবিবাহ-নিষেধক তাঁর চারখানি পুস্তকে তিনি শুধু প্রতিপক্ষের কুযুক্তিকেই বিদীর্ণ করেন নি, তার ত্রুটি দেখিয়ে যথার্থ সদ্‌যুক্তির সাহায্যে নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায়ও অটল থেকেছেন। বিচার-বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত স্থাপনের ব্যাপারে এ ভঙ্গী এখনও বাতিল হয় নি।

৪. লঘু-ধরনের সংলাপের ভাষা :

(ক) "বাছা! শুনিলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল; এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন, হাঁ পিসি! আজ বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি।" (শকুন্তলা)

(খ) ধীবর কহিল, আরে চৌকীদার! আমি চোর নহি, আমায় মার কেন? আমি কেমন করিয়া, এই আঙটি পাইলাম, বলিতেছি। এই বলিয়া, সে কহিল, আমি ধীবরজাতি, মাছ ধরিয়া, বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি। নগরপাল শুনিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল, মর্ বেটা, আমি তোর জাতিকুল জিজ্ঞাসিতেছি নাকি? এই অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া তোর হাতে আসিল, বল্।" (শকুন্তলা)

(গ) "বলিতে কি, আজ তুমি দিদির সঙ্গে নিতান্ত ইতরের ব্যবহার করিতেছ। যদি মনে অনুরাগ না থাকে, মৌখিক প্রণয় ও সৌজন্য দেখাইবার হানি কি? তাহা হইলেও দিদির মন অনেক তুষ্ট থাকে। যাই হউক, ভাই! আজ তুমি বড় ঢলাঢলি করিলে। স্ত্রী-পুরুষে এরূপ ঢলাঢলি করা কেবল লোকহাসান মাত্র।......বলিতে, কি ভাই! তুমি যথার্থই পাগল হয়েছ, নতুবা এমন কথা, কেমন করিয়া মুখে আনিলে। ছি ছি, কি লজ্জার কথা; আর যেন কেহ একথা শুনে না। দিদি শুনিলে আত্মঘাতিনী হইবেন। আমি দিদিকে

ডাকিয়া দিতেছি ; অতঃপর তিনি আপনার মামলা আপনি করুন।"
(ভ্রান্তিবিলাস)

এই ভাষাভঙ্গিমা যে কতটা সহজ ও স্বাভাবিক তা স্পষ্টই বোঝা যাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের সংলাপও এতটা সরল হতে পারে নি। এর পূর্বে আমরা সাধুভাষার বিভিন্ন ঢঙের উল্লেখ করেছি। গম্ভীর বিবৃতি থেকে হালকা সংলাপের ভাষা, মেয়েলি উক্তি ইত্যাদি রচনায় বিদ্যাসাগর বিলক্ষণ পটু ছিলেন। তিনি কোন গল্পকাহিনী লিখলেও সাফল্য লাভ করতে পারতেন, তাঁর আত্মজীবনীর ভগ্নাংশটি তার বড় প্রমাণ। একই সাধুভাষাকে যাদুকরের মতো তিনি বিভিন্ন প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন বেশে সাজিয়েছেন। ছদ্মনামে লেখা তাঁর পুস্তিকাগুলির ভাষাও উতরোল কৌতুকরসের চমৎকার দৃষ্টান্ত—যদিও তার কাঠামো সাধুভাষা ছাড়া কিছু নয়।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের অভিমত উদ্ধৃত করে আমরা বক্তব্য সমাপ্ত করি :

> "যে গদ্য ভাষারীতির তিনি প্রবর্তন করেছেন তার ছাঁদটি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনাকার্যের ভূমিকা নির্মাণ করে দিয়েছে। অথচ যদিও তাঁর সমসাময়িক ঈশ্বর গুপ্তের মতো রচয়িতার গদ্যভঙ্গীর অনুকরণে তখনকার অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক আপন রচনার ভিঁত গাঁথছিলেন, তবু সে আজ ইতিহাসের অনাদৃত নেপথ্যে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। তাই আজ বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার দিন এল যে সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়।" (১৩৪৬ সালে পৌষমাসে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণ)

পরিশিষ্ট

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত রচনা

১.

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, ইদানীন্তন বাংলা দেশে সাধারণ সমাজে সংস্কৃতভাষা শিক্ষাপ্রসারে যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের ভূমিকাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাল্যকাল থেকে তিনি নিজে সংস্কৃত রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁর রচিত গদ্য ও শ্লোক শিক্ষকদের দ্বারা প্রশংসিতও হয়েছে। কিন্তু তিনি নিজে এ বিষয়ে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর মতে দেশে যখন দেশভাষারই একমাত্র চলন হয়েছে, সংস্কৃত ভাষা ক্লাসিক ভাষার পর্যায়ে উঠে গেছে, তখন অনভ্যাসের জন্য কোন সংস্কৃতজ্ঞই আর প্রকৃত সংস্কৃত লিখতে পারবেন না। লিখলেও তাতে ঠিক পূর্বতন যুগের ভাষা, সাহিত্য ও রসের স্বাদগন্ধ থাকবে না—যদিও বৈয়াকরণ বিশুদ্ধি থাকবে পুরো-মাত্রায়। তাই তিনি নিজে সংস্কৃত রচনা করতে চাইতেন না।

তাঁর এ মত ভেবে দেখবার মতো। বস্তুতঃ একটি প্রাণবান, সজীব ও সচল ভাষা কালক্রমে যখন লোকব্যবহার থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে, যখন শুধু পঠন-পাঠন ভিন্ন সে ভাষার আর কোন প্রচার থাকে না, তখন সেই ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও সেই ভাষায় মৌলিক রচনাশক্তির বিশেষ পরিচয় দিতে পারেন না। ব্যাকরণ কোষগ্রন্থ অধিগত করে এখনও পণ্ডিতজনে গ্রীক, লাতিন, ও সংস্কৃতে ছোট বড় স্বাধীন রচনার পরিচয় দিচ্ছেন বটে কিন্তু ঐ সমস্ত রচনায় ক্লাসিক ভাষার ঠিক ঢংটা যেন কিছুতেই ধরা পড়ে না—ভাষার অপ্রচলনই তার একমাত্র কারণ। সুতরাং এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত নিতান্ত অযৌক্তিক নয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিবিধ শাখায় বিদ্যাসাগরের যে কত গভীরভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তাঁর কিছু কিছু সংস্কৃত রচনা থেকেই তা বোঝা যাবে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্যের জহুরী ছিলেন, এ-ভাষায় তাঁর বিলক্ষণ রচনাশক্তি ছিল। তিনি নিজে কিন্তু বিশ্বাস করতেন যে, এ-কালে সংস্কৃত লেখবার মতো রচনাক্ষমতা আমাদের চলে গেছে—চর্চার অভাবই তার কারণ। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার রচনাকার হিসেবে আমাদের গর্ব করা শোভা পায় না। সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় সংস্কৃত সাহিত্যের নানা বিভাগে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করলেও বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক রচনায় সব সময়ে আপত্তি জানিয়েছেন। ছাত্রজীবনেও তিনি বিশ্বাস করতেন,"আমরা সংস্কৃত ভাষায় রীতিমত রচনা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যদি কেহ সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেন, ঐ লিখিত সংস্কৃত প্রকৃত সংস্কৃত বলিয়া, আমার প্রতীতি হইত না। এজন্য, আমি, সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিতে, কদাচ অগ্রসর হইতাম না" (বি. র. ৪র্থ, পৃঃ ৩১৭)। পরিণত বয়সেও তিনি একই কথা বলেছেন, "এক্ষণে যিনি যতবড় পণ্ডিত হউন, কেহই প্রকৃতরূপ সংস্কৃত লিখিতে পারেন না। সংস্কৃত লিখিতে গেলে, নানা প্রকার ভুল হয়। অতএব, আমার বিবেচনায়, সংস্কৃত রচনায় কাহারও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। যিনি লিখিবেন তাঁহারই ভুল হইবেক, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। আমাকেও নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক, সময়ে সময়ে সংস্কৃত লিখিতে হয়। তৎকালে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখি, মনে করি ভুল নাই; কিন্তু কিছুদিন পরে পদে পদে ভুল দেখিতে পাই" (বি. র. ৪র্থ, পৃঃ ৪৭২)।

এ বিশ্বাস তাঁর আজীবন ছিল। তবু অনেক সময়ে অনুরুদ্ধ হয়ে বা প্রয়োজনের তাগিদে তাঁকে কিছু কিছু সংস্কৃত লিখতে হয়েছে। কিন্তু কখনই তিনি স্বেচ্ছায় বা আনন্দে সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক কিছু রচনা করতে প্রবৃত্ত হন নি। যিনি এদেশে সংস্কৃত বিদ্যার মূর্তিমান বিগ্রহ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন, এবং সংস্কৃত শিখবার সুগম বর্ত্ম নির্মাণ

করেছেন, তিনি মনে করতেন, মৌলিক সংস্কৃত রচনাশক্তি, অনভ্যাসের জন্য, একালে আমাদের হারিয়ে গেছে। যাই হোক তাঁর তিনখানি সংস্কৃত পুস্তিকা প্রচারিত হয়েছে। ১. সংস্কৃত রচনা (১৮৮৯), ২. শ্লোকমঞ্জরী (১৮৯০), ৩. ভূগোল-খগোল বর্ণনম্ (১৮৯২—মৃত্যুর পর মুদ্রিত)। প্রথম পুস্তিকায় তাঁর বাল্যকালের সংস্কৃত রচনা মুদ্রিত হয়েছে। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত রচনার প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় বসতে তিনি কিছুতেই রাজী হন নি। শেষে পূজ্যপাদ অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের সস্নেহ তাড়নায় বাধ্য হয়ে পরীক্ষায় বসে যৎসামান্য লিখে নিরুৎসুক চিত্তে উঠে যান। জানতেন, "পরীক্ষক মহাশয়েরা আমার রচনা ও রচনার মাত্রা দেখিয়া নিঃসন্দেহে, উপহাস করিবেন" (বি. র. ৪র্থ, পৃঃ ৩১৮)। কিন্তু ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল গদ্য রচনায় শুধু তিনিই পুরস্কার পেয়েছেন। অতঃপর তাঁর নিজের ওপর কিছু বিশ্বাস ফিরে এল। পরের দু'বছর তিনি সংস্কৃত শ্লোক-রচনায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেন। এরপর একদিন সাহিত্যের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাব্যের ছাত্রদের 'গোপাল নমোস্তু তে' এই সম্পর্কে শ্লোক রচনা করতে বললেন। তাঁর পীড়াপীড়িতে বিদ্যাসাগরও লিখতে বসলেন, কিন্তু ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র পূজ্যপাদ অধ্যাপক জয়গোপালকে 'গোপাল' কথা ধরে কিঞ্চিৎ পরিহাস করতে ছাড়লেন না। বললেন, "মহাশয়, আমরা কোন্ গোপালের বর্ণনা করিব। এক গোপাল আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন; আর এক গোপাল, বহুকাল পূর্ব্বে, বৃন্দাবনে লীলা করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। এ উভয়ের মধ্যে কোন্ গোপালের বর্ণনা, আপনকার অভিপ্রেত, স্পষ্ট করিয়া বলুন।"

১৮৪২ সালে রবার্ট কস্ট্ নামে এক সিভিলিয়ান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়তেন। বিদ্যাসাগর তখন সেখানে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। চাকুরীর শেষে বিদায় নেবার প্রাক্কালে কস্ট্ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন

এবং নিজের সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক লিখে দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর সানন্দে পাঁচটি শ্লোক রচনা করে তাঁকে দেন। এর পর তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাঝে মাঝে দুটি-চারটি শ্লোক রচনা করতেন, সেগুলি ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৮৯) পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়। এগুলির সাহিত্যমূল্য অবান্তর। তবে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে কিশোর বিদ্যাসাগর রচিত সরস্বতী বন্দনাটি তাঁর কৌতুকপ্রবণতার চমৎকার দৃষ্টান্ত :

> লুচী কচুরী মতিচুর শোভিতং
> জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্।
> যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
> সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্॥

২.

১৮৯০ সালে বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকসংগ্রহটি 'শ্লোকমঞ্জরী' নামে প্রকাশিত হয়। এর অনেক পূর্বে যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেনীতে পড়তেন তখন তাঁদের অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ছাত্রদের প্রত্যেক দিন একটি করে উদ্ভট শ্লোক লিখিয়ে মুখস্থ করাতেন। এই ভাবে বিদ্যাসাগর অল্প বয়সে ছ'মাস ধরে প্রতি দিন একটি করে উদ্ভট শ্লোক ব্যাখ্যা সহ মুখস্থ করতেন। পরে তিনি সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হলে উক্ত তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁকে আরও উদ্ভট শ্লোক দিয়েছিলেন। এইভাবে বিদ্যাসাগর প্রায় দু'শ শ্লোক সংগ্রহ করেন। এ ছাড়াও আরও নানা স্থান থেকে তিনি প্রায় তিন'শ শ্লোক পেয়েছিলেন। সে যুগে সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু কালক্রমে সে প্রথার বদল হতে শুরু করলে বিদ্যাসাগর বিলুপ্তির হাত থেকে ঐ সমস্ত শ্লোককে রক্ষা করার জন্য সেগুলিকে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। তা নইলে মুখে-মুখে প্রচারিত

শ্লোকগুলি কালক্রমে একেবারে হারিয়ে যেত। তাই তিনি সংগৃহীত শ্লোক থেকে বাছাই করে ১৭৩টি সাধারণ ধরনের এবং ৪০টি আদি-রসাত্মক শ্লোক 'শ্লোকমঞ্জরী' নামে মুদ্রিত করেন। যে-সমস্ত বহু-প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকের উৎস পাওয়া যায় না এবং রচনাকারের নাম জানা যায় না তাকে উদ্ভট শ্লোক বলে। বাংলায় উদ্ভট যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃতে সে-অর্থে ব্যবহৃত হয় না।[১] অবশ্য বিদ্যাসাগর স্বীকার করেছেন, অনেক শ্লোক উদ্ভট বলে পরিচিত হলেও, ভালো করে সন্ধান করলে, তার কবির নামও পাওয়া যেতে পারে। 'শ্লোকমঞ্জরী'র সাধারণ পর্যায়ে গৃহীত শ্লোকগুলির কিছু কিছু কৌতূহলপ্রদ, দু'একটি বেশ তীক্ষ্ণ। যেমন ঃ

কো ভাতি ভালে বরবর্ণিনীনাং
কা রৌতি দীনা মধুযামিনীষু।
কস্মিন্ নু ধত্তে শশিনং মহেশঃ
সিন্দূরবিন্দু বিধবাললাটে ॥

সুন্দরীর কপালে কি শোভা পায়? (সিন্দূরবিন্দু)
বসন্তরাত্রিতে কোন্ মন্দভাগিনী রোদন করে? (বিধবা)
মহাদেব চন্দ্রকে কোথায় ধারণ করেন? (ললাটে)
এক কথায় হল—সিন্দূরবিন্দু বিধবাললাটে।

কিংবা

ভোজনমফলমগব্যং শ্রুতমফলং দুর্বিনীতস্য।
কৃপণস্য ধনমফলং জীবনমফলং দরিদ্রস্য।

—কী কী নিষ্ফল? গব্যপদার্থহীন ভোজন, দুর্বিনীতের বিদ্যা, কৃপণের ধন আর দরিদ্রের জীবন।

১. তারানাথ তর্কবাচস্পতির রচিত 'বাচস্পত্যাভিধানে' উদ্ভট-এর অর্থ গ্রন্থ-বহির্ভূত লোকপ্রসিদ্ধ অজ্ঞাতকর্তৃক শ্লোক।

কায়স্থেরা সাবধান—

কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতম্।
ন তত্র করুণাহেতু স্তত্র হেতুরদন্ততা॥

গর্ভস্থ কায়স্থ শিশু মায়ের মাংস খায় না কেন? মায়ের প্রতি করুণা-বশতঃ নয়, তার দাঁত থাকে না বলেই মা রক্ষা পায়।

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্কা বৃক্ষাশ্চ মূর্খাশ্চ ন নমন্তি কদাচন॥

ফলবান বৃক্ষ নত হয়, গুণিজন নত হয়। নত হয় না শুকনো গাছ, আর মূর্খেরা।

অতঃপর এ বিষয়ে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হয়। 'শ্লোকমঞ্জরী'র পরিশিষ্টে বিদ্যাসাগর অতি উত্তপ্ত আদিরসের চল্লিশটি উদ্ভট শ্লোক মুদ্রিত করেছিলেন। এই চল্লিশ শ্লোকের যে-কোন একটি আধুনিক রুচিবাগীশকে ধরাশায়ী করবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রথমে বিদ্যাসাগর আদিরসের এই শ্লোকগুলি সংগ্রহ থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুরাগীরা বললেন যে, উদ্ভট শ্লোকগুলিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখাই যদি বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে আদিরসাত্মক শ্লোকগুলিকেও মুদ্রিত করা উচিত। তা ছাড়া, এ সংকলন তো আর পাঠ্যপুস্তক হতে যাচ্ছে না। তাঁদের যুক্তিকে বিদ্যাসাগর অবহেলা করতে পারলেন না, 'শ্লোকমঞ্জরী'র পরিশিষ্টে আদিরসাত্মক উদ্ভট শ্লোক মুদ্রিত করলেন। বলা বাহুল্য এগুলির সবই সংস্কৃত মতে শারীরপ্রেমের অন্তর্গত। দেহকে বাদ দিয়ে আদিরসের কল্পনা করা যায় না, অন্ততঃ সংস্কৃত কবিরা তাই মনে করতেন। তাই আদিরসের কিছু লিখতে হলে দেহভোগের উদ্দাম বর্ণনায় তাঁরা পিছপা হতেন না। আধুনিক কালে ইংরেজী কেতায় শিক্ষিত হয়ে, আর ব্রাহ্ম-সমাজের সুরুচি-সুনীতির আদর্শে লালিত হয়ে গত শতাব্দী থেকেই আমরা দেহরসের বর্ণনাকে 'original sin' বলে ভাবতে শিখেছি।

বিদ্যাসাগরের সে-রকম শুচিবাতিক ছিল না। এখন যাকে আমরা অশ্লীল বলি, বিদ্যাসাগর নির্দ্বিধায় তা বলতে এবং লিখতে পারতেন। তাঁর বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ এবং বেনামী পুস্তিকায় যে সমস্ত আখ্যান উল্লিখিত হয়েছে, মাঝে মাঝে তিনি তাতে এমন স্থূল রসিকতা করেছেন যে, এ যুগে হলে সাত্ত্বিক ও পুণ্যার্থী সমালোচকেরা তাঁকে সহজে ছেড়ে দিতেন না। সে যুগেও বঙ্কিমচন্দ্র 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের রুচি এবং দু-একটি গ্রাম্য কাহিনীর উল্লেখ করে তাঁকে খুব নিন্দা করেছিলেন।[২] সে যাই হোক, এই আদিরসের শ্লোকগুলিকে যিনি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে পারেন তাঁর দুঃসাহস কম ছিল না। দুঃখের বিষয় বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক কালে বাঙালী দেহে-মনে যথেষ্ট বলিষ্ঠ ছিল, এখনকার মতো ক্ষুৎক্ষামকাতর কামক্লিন্ন কঙ্কালে পরিণত হয় নি। এই সঙ্কলনের সর্বশেষের শ্লোকটি শুধু নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করা যাচ্ছে, রুচিবাগীশেরা নয়ন-শ্রবণ আবৃত করতে পারেন।

স্ফীতোঽয়ং জঠরঃ স্তনৌ গুরুতরৌ শ্যামে চ চুচুকে
কো রোগো বদ বৈদ্যরাজ বিধবে কিং ভোঃ কুপথ্যং কৃতম্।
একঃ কোঽপি যুবা কিমেব কৃতবান নাভেরধস্তান্ম্ মে
রোগোঽয়ং বিষমস্তবৈবম্ দশমে মাসি স্বয়ং যাস্যতি॥

বিধবা—আমার উদর স্ফীত হয়েছে, স্তন হয়েছে ভারী, চুচুকও শ্যামবর্ণ। হে বৈদ্যরাজ, এ আমার কী রোগ হল?
বৈদ্য—হে বিধবে, তুমি কি কোনও কুপথ্য করেছ?
বিধবা—কে-একজন যুবক আমার নাভির অধোদেশে কি-যেন করেছিল।
বৈদ্য—তোমার রোগ দেখছি বিষম। তবে দশমাস পূর্ণ হলে আপনিই চলে যাবে।[৩]

তথাকথিত শ্লীল-অশ্লীল বাতিক ছেড়ে দিলে এই ধরনের আদিরস-

২. বঙ্গদর্শন, ১২৮০, ৩য় সংখ্যা ('বহুবিবাহ')।

কৌতুকরসের শ্লোকগুলি সঙ্কলনে স্থান দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিদ্যাসাগরকে আমরা প্রশংসাই করব। এগুলির বাগভঙ্গীর তীক্ষ্ণতা, হাস্যপরিহাস এবং কৌতুকমিশ্রিত আদিরস খুবই উপভোগ্য।

৩.

অতঃপর তাঁর 'ভূগোল-খগোলবর্ণনম্'। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেণীতে পড়তেন (১৮৩৯)। সেই সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে মিয়র নামে এক সিভিলিয়ান কাজ করতেন। সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষায় তাঁর বেশ দখল ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের সংস্কৃত শ্লোকরচনার জন্য পুরস্কার দিতেন। কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি একবার প্রস্তাব পাঠালেন, "পুরাণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও য়ুরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে যে ছাত্রের রচিত শত শ্লোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তিনি তাহাকে একশত টাকা পুরস্কার দিবেন।" তদনুসারে ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাসাগর পুরাণ, সূর্য-সিদ্ধান্ত ও য়ুরোপীয় মতে ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে ৪০৮ শ্লোক রচনা করেন। বোধ হয় তিনি সবিস্তারে বলবার জন্য ১০০-র স্থলে ৪০৮টি শ্লোক রচনা করেছিলেন। ১৭৭টি শ্লোকে পুরাণমতে এবং ৫২ শ্লোকে সূর্যসিদ্ধান্ত মতে পৃথিবীর ভূগোল এবং গ্রহনক্ষত্রের কথা তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তার পর অবশিষ্ট ক্ষেত্রে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য মতে য়ুরোপ-এশিয়া-আফ্রিকা-আমেরিকার ভৌগোলিক পরিচয় এবং পাশ্চাত্ত্য মতে গ্রহনক্ষত্র সম্পর্কে শ্লোক রচনা করেন। এ রচনায় কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার উল্লেখ নেই। সংস্কৃতজানা ব্যক্তির কাছে য়ুরোপ-এশিয়া-আফ্রিকা-আমেরিকার ভৌগোলিক পরিচয়, পাশ্চাত্ত্যের নদনদী জনপদের বর্ণনা কী আকার লাভ করেছিল, এই 'ভূগোল-খগোলবর্ণনম্' থেকে তার কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় পাওয়া যাবে। সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদে তাঁর কতটা দক্ষতা ছিল, তা ইতিপূর্বে আমরা বলেছি। মধুসূদন তর্কালঙ্কার রচিত 'বামনাখ্যানম্' (১৮৭৩)

শীর্ষক সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদে বিদ্যাসাগরের সে কৃতিত্ব অব্যাহত আছে। শ্লোকগুলি তর্কালঙ্কার রচিত, বঙ্গানুবাদ বিদ্যাসাগরের।

মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর আজ সমগ্র বাংলাদেশের এক প্রবাদ-পুরুষ। অবশ্য বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তাঁর অদ্ভুত চরিতকথা সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রচার নেই। বৃহৎ ভারতবর্ষে তাঁকে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সমাজসংস্কারক রূপ দেখা হয়। কিন্তু রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্র ও মনের যে-রূপটি ফুটে উঠেছে, বাংলা ভাষা ভিন্ন অন্যত্র তার পরিচয় পাওয়া যাবে না। সুবলচন্দ্র মিত্র (*Iswar Chandra Vidyasagar—Story of his Life and Works*) ভিন্ন ইংরেজীতে তাঁর জীবন ও কর্মকথা বড় কেউ আলোচনা করেন নি। সুবলচন্দ্রের গ্রন্থটিতেও নানা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। বলতে গেলে এটি বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর'-এর প্রায় হুবহু প্রতিধ্বনি। শিক্ষাপ্রচার ও সমাজসংস্কারের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ গ্রন্থ রচিত হয়েছে, বিশুদ্ধ রসসাহিত্যের মধ্যে সেগুলি ততটা পড়ে না। ফলে অন্য প্রাদেশিক ভাষায় তাঁর গ্রন্থের বড় একটা অনুবাদও হয় নি। এই জন্য তিনি কদাচিৎ প্রাদেশিক সীমা ছাড়াতে পেরেছেন। সম্প্রদায়বিশেষ বা দলবিশেষের প্রতিনিধিত্ব করেন নি বলে (যা তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন), রামমোহনাদি যে-ধরনের সর্বভারতীয় প্রচার ও খ্যাতি লাভ করেছেন, বিদ্যাসাগর বহুস্থলে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অথচ চারিত্র, মনুষ্যত্ব, বিদ্যা ও সংস্কারমুক্ত নির্মোহ মনের কথা বিবেচনা করলে তাঁর অনুরূপ বিচিত্র মানুষ সেকালে সারা ভারতবর্ষেই দুর্লভ ছিল।

সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট